মানুষ চিত্তরঞ্জন

কন্যা অপর্ণা দেবী

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড
পাবলিশিং কোং লিমিটেড
৯৩, হেরিসন রোড
কলিকাতা-৭

প্রকাশক :—

শ্রীনবশঙ্কর রায় চৌধুরী
৩ নং সর্দ্দার শঙ্কর রোড
কলিকাতা-২৬

প্রথম সংস্করণ—৭ই শ্রাবণ ১৩৬১

মূল্য ৫৲ টাকা মাত্র।

প্রচ্ছদপট-

শিল্পী- যামিনী রায়

মুদ্রাকব :—
সিটি প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
৭, নং বসন্ত বসু রোড,
কলিকাতা-২৬।
ফোন—সাউথ ১৬২৬

উৎসর্গ

আমার স্বর্গত স্বামীর অপূর্ণ আকাঙ্খা পূর্ণ করার মানসে এই গ্রন্থ-প্রণয়নে যে আমাকে একরকম জোর করেই ঠেলে দিয়েছিল এবং গ্রন্থ-শেষ না করা পর্যন্ত যে আমাকে মুহূর্তের বিশ্রাম দেয়নি, আজ সযত্নে বইখানি আমার সেই জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ সৌভাগ্যবতী কল্যাণীয়া [illegible] কর-কমলে স্নেহাদরে তুলে দিলাম।

সূচী-পত্র

নিবেদন—

অনেক দিন যে কথা বলবার বাসনা আমার প্রাণে জেগেছে, যে সব কথা জীবনের বৈচিত্র্যময়-অভিজ্ঞতার মধ্যে ভালো করে উপলব্ধি করেছি—চিত্তরঞ্জনের কন্যা হয়ে, মানুষ হিসাবে পিতৃদেবকে দেখবার ও বোঝবার যে সুযোগ পেয়েছি—যা সত্য বলে হৃদয়ঙ্গম করেছি তা অক্ষম-হস্তে দেশবাসীকে নিবেদন করে আজ ধন্য ও কৃতার্থ হলাম। আমি মনে করি স্মৃতি আত্মস্থ হতে শেখায়, চৈতন্যের আভাষ জাগিয়ে দেয়, তাই স্মৃতি-স্মরণ পুণ্য কথা।

পিতৃদেবের জীবন একটি মহাকাব্য। এই জীবনালেখ্য অঙ্কিত করবার বাসনা প্রথম অঙ্কুরিত হয়েছিল আমার স্বর্গগত স্বামীর মনে। পিতৃদেবের মহাপ্রয়াণের দীর্ঘ আটাশ বৎসর পর তাঁর অপূর্ণ আকাঙ্খা পূর্ণ করার মানসে এই বিশাল, ঘটনা-বহুল অবিনশ্বর জীবন-চিত্র অঙ্কিত করার আমার এই প্রয়াসে, তাঁর স্বর্গগত আত্মা নিশ্চয়ই সুখী হবেন।

মানুষ হিসাবে পিতৃদেব কতবড় আদর্শবাদী, মহান, প্রেমিক ছিলেন, তাঁর অন্যান্য জীবন-চরিতে যা প্রস্ফুটিত হয়নি, সেই রূপটিই প্রকটিত করা আমার নিবেদনের উদ্দেশ্য। তাঁর সমগ্র জীবনে, ধর্ম্ম, সাহিত্য, আইন, রাজনীতি, দেশপ্রেম ও সর্ব্বোপরি যে মানব-প্রেম একে অন্যের সঙ্গে ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত ছিল এবং সবার উপরে—তাঁর যে মানুষ-রূপটি ফুটে উঠেছিল, আমার আলোচনার বিষয় তাই।

আজকের জীবনযুদ্ধে পরিশ্রান্ত, অবিচারে-লাঞ্ছিত, সুনির্দেশের অভাবে আদর্শভ্রষ্ট মানুষের দিকে তাকিয়ে যখন গভীর বেদনা অনুভব করি তখন পিতৃদেবের কথাই বার বার স্মৃতিপটে ভেসে উঠে।

হৃদিস্থিত হৃষিকেশকে যিনি কর্ম্মফল সমর্পন করেছিলেন, নিষ্কামতায় যিনি বুদ্ধত্বে নির্ব্বাণ-লাভ করেছিলেন, তৃণাদপি সুনীচ হয়েও যিনি পরম শক্তিশালী ছিলেন, বাগ্মিতায় যিনি সর্ব্বজয়ী ও তীক্ষ্ণ মেধায় যিনি চিরভাস্বর, বঙ্কিমচন্দ্রের মাতৃমন্ত্রে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশ-মাতৃকার শৃঙ্খল-মোচনের মহাযজ্ঞে যিনি নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন, শ্রীচৈতন্যের প্রদর্শিত-পথে যিনি আত্মভোলা হয়ে "দু বাহু বাড়ায়ে" ছুটে চলেছিলেন, এই মহান্ জীবন চরিতে তাই রূপায়িত করবার চেষ্টা করেছি মাত্র। ভরসা করি আমার এই অক্ষম-চেষ্টার ত্রুটি দেশবাসী মার্জ্জনা করবেন।

পিতৃদেবের জীবনবেদের প্রথম অধ্যায় সুরু হয় তাঁর মাতৃ-প্রীতি ও ভক্তি দিয়ে। নিজ জননীর প্রতি এই অসীম ভক্তি শ্রদ্ধা, ও প্রেম বিকশিত হয়ে উঠেছিল তাঁর জননী জন্মভূমির প্রতি।

"মানুষ চিত্তরঞ্জন" দেশের ভবিষ্য-সন্তানদের যদি সেই মহতী মানবীয়তার মধুর ও মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত করে, তবেই আমার লেখনী ধন্য হবে।

এই গ্রন্থ-প্রণয়ণে পিতৃদেবের প্রিয় সাহিত্য-সেবক শ্রীগিরিজা শঙ্কর রায় চৌধুরী মহাশয়কে আমার গ্রন্থের প্রারম্ভে তাঁর একান্ত পরিশ্রমের জন্য অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি,—এবং পিতৃদেবের তিরোধানের পর ১৯২৫ সনের 'বঙ্গবাণী' 'ভারতবর্ষ' 'বসুমতী' ও 'দেশবন্ধু' সংখ্যার বিভিন্ন রচনাবলী থেকে আমি যথেষ্ঠ সাহায্য পেয়েছি। এই জন্য সমগ্র লেখকবৃন্দের নিকট আমি অশেষ ঋণী।

যে সব পুস্তক থেকে আমি এই প্রণয়ণে সাহায্য পেয়েছি পরিশিষ্টে উল্লিখিত হোল। তাঁদের মধ্যে আজ যাঁরা স্বর্গগত, তাঁদের আমার অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করছি, এবং যাঁরা ইহলোকে আছেন তাঁদের আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

National Libraryর প্রধান শ্রীকেশভন্ ও তাঁর সহকর্ম্মীবৃন্দ শ্রীমুয়ের, শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসুধীরচন্দ্র ব্রহ্ম আমাকে পুস্তক-সংগ্রহে সাহায্য করে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করেছেন। স্নেহাস্পদ সত্যেন ঘোষ সংবাদপত্রের বিবৃতি সংগ্রহ করে এবং সন্তোষ কুমার দাস পাণ্ডুলিপি নকলে আমাকে অশেষ সাহায্য করেছেন। সিটি প্রিটিং ওয়ার্কসের শ্রীধীরেন্দ্র নাথ রায় মহাশয়ের আন্তরিকতা ও উক্ত প্রেসের কর্ম্মীবৃন্দের অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সর্ব্বশেষে পরম-স্নেহভাজন শ্রীমান নবশঙ্কর রায়চৌধুরী শুধু পাণ্ডুলিপি নকলেই নয় বহু মূল্যবান তথ্যাদি সংগ্রহ করে যে অক্লান্ত-পরিশ্রম করেছে তাতে তাকে আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদ জানাচ্ছি।

পশ্চিম বঙ্গের রাজ্যপাল মাননীয় ডাক্তার হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে পিতৃদেবের অসংখ্য ছবির ব্লক দেবার জন্য তাঁকে আমার অন্তরের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি—অনিবার্য্য কারণে প্রথম সংস্করণে সে ছবি দিতে না পারার জন্য অমি দুঃখিত। দ্বিতীয় সংস্করণে সে সব ছবি দিয়ে পুস্তকের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করতে পারব বলেই ভরসা করি।

পুস্তকাকারে 'মানুষ চিত্তরঞ্জন' দেশবাসীর চিত্তরঞ্জন করতে সক্ষম হলে আমি ধন্য ও কৃতার্থ হব।

১৬ই জুন ১৯৫৪ অপর্ণা দেবী

— ⁂ —

পিতৃভুমি

পুণ্যতোয়া গঙ্গা—পদ্মা—মেঘনা—ব্রহ্মপুত্রনদবারি-বিধৌত, প্রাচীন গৌড়বঙ্গের অতীত সমৃদ্ধির স্বপ্নময় বিক্রমপুরই চিত্তরঞ্জনের পিতৃভূমি।

কত স্মৃতি, গৌরবগাঁথা, কতই না সভ্যতার কাহিনী চরণ-চিহ্ন এঁকে রেখে গেছে এ পূত ভূমিতে। পুরাতন গৌড়বঙ্গের স্নায়ু-কেন্দ্র বিক্রমপুব একদিন বঙ্গ জগতের বিলাস সম্ভার যোগাত; এ কেন্দ্র থেকেই গৌড়ীয় রীতি একদিন সমগ্র ভারতে চলেছিল। এই ধন্য পুণ্য ভূমিতেই আদিশূর পুত্রেষ্ঠি যজ্ঞ করেছিলেন; সাগ্নিক পঞ্চ ব্রাহ্মণ এসে তাঁদের মন্ত্রপুরিত শান্তি বারিতে শুষ্ক গজারী বৃক্ষকে মুঞ্জরীত করেছিলেন—এখানেই। সুদূর সিংহল, বালী, সুমাত্রা আরব থেকে বাণিজ্যলক্ষ্মী তাঁর অর্ণবপোতে ধন রত্ন পূর্ণ করে এ দেশেই একদিন আসতেন। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ এখান থেকেই তাঁর জ্ঞানের জ্যোতি ছড়িয়েছিলেন তিব্বত পর্য্যন্ত। এই মহাপুরুষ তিব্বতের আদি ও শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মপাল মহাত্মা ব্রহ্মতনের দীক্ষাগুরু ছিলেন, যাঁর নাম শুনলেই প্রধান লামা ও চীনের সম্রাট সসম্ভ্রমে আসন ছেড়ে তাঁর উদ্দ্যেশ্যে প্রনাম জানাতেন। হরিশ্চন্দ্রের কথা, অচুনা পচুনার মধুর কাহিনী, চাঁদ রায়, কেদার রায়ের বীর্য্যগাথা বক্ষে ধরে' আছে এই বিক্রমপুর।

বিক্রমপুর আজ পাকিস্থানের অন্তর্গত হলেও তার পুণ্য ইতিহাস বিক্রমপুরের নয়, সে ইতিহাস সমগ্র ভারতের জ্ঞান, গরিমা, ধর্ম্ম, কাব্য ও সংস্কৃতির সহিত জড়িত।

বিক্রমপুরের অন্তর্গত তেলীরবাগ গ্রাম চিত্তরঞ্জনের পূর্ব্ব পুরুষের আদি বাসভূমি। তিনি কলিকাতায় জন্ম গ্রহণ করলেও বিক্রমপুরবাসী

বলে তাঁর অসীম গর্ব্ব ছিল। তাঁর অন্তরের অন্তস্তল থেকে যে গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা উথলে উঠেছিল তার পিতৃভূমির প্রতি, তার উজ্জ্বল চিত্র আমরা পাই ১৯১৬ সনে ডিসেম্বরে তাঁর ডোমসার অভিভাষণে। তিনি বলেছিলেন "যে দেশেই থাকিনা কেন, যত বিদেশেই ঘুরে বেড়াইনা কেন, যখনি মনে করি আমি বিক্রমপুরবাসী তখনই প্রাণে প্রাণে একটা গর্ব্ব অনুভব করি। বিক্রমপুর আমার শরীরের শিরায় শিবায়, আমার অস্থিমজ্জাগত, তার কত শত কাহিনী যে আমাদের প্রত্যেকের জীবনের মধ্যে জড়িয়ে গিয়েছে। এই যে ভাব, যা সকল ভাব, সকল ভাবনা, সকল চিন্তা, সব সাধনার মধ্যে আপনাকে জানিয়ে দেয়; এই যে স্মৃতি যা ফুলের সঙ্গে জড়ান গন্ধের মত আমাদের জীবনে ছড়িয়ে আছে; এই ভাব ও এই স্মৃতিকে সর্ব্বদা জাগ্রত দেবতার মত আমাদের হৃদয় মন্দিরে জাগিয়ে রাখতে হবে।"

. এই পিতৃভূমিতে এসে চিত্তরঞ্জন নিজে ধন্য হলেন; আর অতীত গৌরব কাহিনী ভরা তাঁর পিতৃভূমি এই সন্তানকে বক্ষে ধরে পুলকিত হোল নিশ্চয়ই।

—::—

বংশ পরিচয়

বিক্রমপুর অন্তর্গত তেলীরবাগ গ্রামে প্রসিদ্ধ যদুনন্দন বংশীয়, মৌদ্গল্য গোত্রীয় বৈদ্যবংশজাত জগদ্বন্ধু দাশ, নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি তাঁহার খুল্লতাত ভ্রাতা কাশীশ্বর দাশের কনিষ্ঠ পুত্র ভুবনমোহন দাশকে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন ১৮৫০ খৃষ্টীয় শতকে। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ৫ই নভেম্বর, কলিকাতায় পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীটে ভুবনমোহন দাশ ও মাতা নিস্তারিনী দেবীর কোলে "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপী গরীয়সী" এই বাণীকে সার্থক করবার জন্যই বুঝি এলেন চিত্তরঞ্জন।

তিন ভ্রাতা ও পাঁচ ভগিনীর মধ্যে চিত্তরঞ্জন পিতামাতার দ্বিতীয় সন্তান এবং জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী আমাদের বড় পিসিমাকে (তরলা গুপ্তা, ৺প্যারীমোহন গুপ্ত মহাশয়ের সহধর্ম্মিনী) পিতৃদেব একরকম পূজো করতেন। বড় ভালবাসতেন তিনি তাঁর এই স্বার্থহীনা উদারহৃদয়া দিদিকে। বড় পিসিমা বিবাহের ১৪ বৎসরের মধ্যেই ২৮।২৯ বৎসর বয়সে বিধবা হন। পাঁচটি সন্তানকে (চার কন্যা ও পুত্র সুধাংশুমোহন গুপ্ত) নিয়ে তিনি পিত্রালয়ে আসতে বাধ্য হলেন। তাঁর ষষ্ঠ সন্তান ও কনিষ্ঠা কন্যা তখনও মাতৃগর্ভে। যে সময়ে বড় পিসিমা এভাবে অসহায়া হলেন, তখন দাশ পরিবারেরও আর্থিক অবস্থা তেমন স্বচ্ছল ছিলনা। তাঁর পিতা তখন দেউলিয়া এবং ভ্রাতাও দেউলিয়া হবার পথে। বড় পিসিমা এসেই কিন্তু তাঁর সঞ্চিত অর্থ এবং সমস্ত অলঙ্কার নিয়ে পিতৃদেবকে বল্লেন "চিত্ত, তোর ভিখারিণী দিদির আর কোন সম্বল নেই—এই দিয়ে যদি তোদের দেনার কিছুমাত্র লাঘব হয় আমি বড় শান্তি পাব।" পিতৃদেব একথা

আমাদের কাছে কতদিন বলেছেন,—বলতেন "দিদির এই কথা কি কোনদিন ভুলতে পারব? তাঁর যথাসর্ব্বস্বই তো তিনি আমাদের সংসারে দিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, তখন তো তিনি জানতেনও না আমি কি উপার্জ্জন করব? কোন কিছুর প্রতিদানের স্বপ্নও তিনি কোনদিন দেখেননি।" বড় পিসিমার এই স্নেহময় ব্যবহার পিতৃদেব মুহূর্ত্তের জন্যও ভোলেননি। এই দিদি ছিল তাঁর কাছে দেবী। পিতৃহীন ভাগিনা ও ভাগিনেয়ীরা আমাদের পিতৃদেব ও মাতৃদেবীর স্নেহকোলেই পালিত হয়েছিল। আমরা সহোদর ও সহোদরার ন্যায় একই সঙ্গে প্রতিপালিত হয়েছি। আজ মেজদি (অমিয়া মুখোপাধ্যায়), সেজদি (নলিনা ঘোষ), দিদি (অরুণা মিত্র), ঝুনু (সাহানা দেবী, শ্রীঅরবিন্দের আশ্রমে রয়েছে)। বড় পিসিমা প্রায়ই বলতেন, "চিত্ত! তোর থেকে কতই নিলাম।" পিতৃদেব সজল চোখে বলতেন "দিদি ওকথা তুমি কখনো বোলোনা, টাকাই কি সব? তোমার যে স্নেহাদর পেয়েছি তাকি কিছুই নয়? সারা জীবনের অর্জ্জিত ধন তোমার পায়ে ঢেলে দিলেও তোমার সেই স্নেহের সমতুল্য হবেনা।"

তাঁর দ্বিতীয়া ভগিনী মেজ পিসিমা অমলা দাশ চিরকুমারী ছিলেন। তাঁর মত ভক্তিমতী, সুগায়িকা, পরদুঃখকাতরা ও সেবা-পরায়ণা রমণী খুব অল্পই দেখা যায়। তাঁর স্বর্গীয় মধুরকণ্ঠ সকলের হৃদয় দ্রবীভূত করতো। ১৪৮নং রসা রোডে (এখন যাহা চিত্তরঞ্জন সেবাসদন), পিতৃদেবের সাহিত্য ও সঙ্গীতের আসরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মেজ পিসিমার সমবেত সঙ্গীত যাঁরা শুনেছেন তাঁরা বোধকরি জীবনেও সে অপূর্ব্ব সঙ্গীতের কথা ভুলতে পারবেন না। মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে মেজ পিসিমা শ্রীধাম নবদ্বীপে এবং শ্রীবৃন্দাবনে গিয়েছিলেন। সেখানে মীরাবাঈএর মন্দিরে তিনি 'মেরে তো গিরিধারী গোপাল' এমন তন্ময়তার সঙ্গেই গেয়েছিলেন, যে তাঁর মৃত্যুর দশ বারো বৎসর

পরেও, আমার স্বামীর সঙ্গে যখন শ্রীবৃন্দাবনে গিয়েছিলাম তখন মীরাবাঈএর মন্দিরের বৃদ্ধ পূজারী আমাদের বলেছিলেন, "এই ধূলির উপর আর এক মীরাবাঈ এসে গান শুনিয়ে আমাদের ধন্য করে গিয়েছেন।" তিনি হলেন অমলা দাশ। বাবাও দার্জিলিংএ তাঁর মৃত্যুর ২।৩ দিন পূর্ব্বেও মেজ পিসিমার গ্রামোফোনের রেকর্ড শুনে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলেন। বড় ভালবাসতেন তিনি মেজ পিসিমার গান। ১৯১৭ সনে শ্রীমতী এ্যানি বেসাণ্টের নেতৃত্বে কলিকাতায় যে কংগ্রেস হয় তাতে অমলা দাশের বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

আজীবন কুমারী থেকে তাঁর জীবন তিনি জনগণের সেবায় উৎসর্গ করেছিলেন। পিতৃদেবের সহায়তায় তিনি পুরুলিয়ায় অনাথ আশ্রম, আতুর আশ্রম এবং বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত করেছিলেন।

১৯১৯ সালে আষাঢ় মাসে রথযাত্রার দিন রসা রোডের বাড়ীতে মাত্র ৪২ বৎসর বয়সে তিনি সাধনোচিত ধামে চলে গেলেন।

বাবার তৃতীয়া ভগিনী, মেজপিসিমা প্রমীলা দেবী (শরৎ চন্দ্র সেন, এডভোকেট মহাশয়ের পত্নী) অত্যন্ত শান্ত ও ধীর প্রকৃতির ছিলেন। মাত্র ৩২ বৎসর বয়সে স্বামী, পিতা, মাতা, ভ্রাতা ভগ্নীকে শোক সাগরে ভাসিয়ে তিনি পরলোকগতা হন।

চতুর্থা ভগিনী,—ন'পিসিমা উর্ম্মিলা দেবী (অনন্ত নারায়ণ সেন মহাশয়ের পত্নী) পিতৃদেব ও মাতৃদেবীর সঙ্গে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। অসীম তাঁর সাহস! অসহযোগ আন্দোলনের সময় বৃটিশ পুলিশ যখন কলিকাতার কোন এক স্থানে বিক্ষুব্ধ জনতাকে প্রতিরোধ করবার জন্য অন্যায় ভাবে তাদের মধ্যে ঘোড়া

ছুটিয়ে দেয়, তখন ন'পিসিমা দৃপ্তভঙ্গিতে তার মধ্যে প্রবেশ করে অশ্বারোহীর প্রতি গর্জ্জন করে ঘোড়ার লাগাম ধরে তাকে বিপরীত দিকে ঘুরে যেতে বাধ্য করেন। নিজের জীবন বিপন্ন করে তাঁর এই অসীম সাহসের পরিচয়ে, তখনকার সত্যাগ্রহীরা অনুপ্রেরণা পেয়েছিল। বাংলা দেশের অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে ন'পিসিমা উর্ম্মিলা দেবীর কথা ভুলে যাবার নয়, কিন্তু খুবই দুঃখের কথা যে পিতৃদেবের তিরোধানের পর বাংলার কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের দ্বারা তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়েই রইলেন।

ছোট পিসিমা (মুরলা দেবী—শ্রীবিরাজ মোহন চট্টোপাধ্যায়ের সহধর্ম্মিণী) অত্যন্ত কোমল ও মৃদুস্বভাবা। বিরাজমোহন চট্টোপাধ্যায় আমার মায়ের সাক্ষাৎ পিসতুতো ভাই। বাবা তাঁর চেয়ে অনেক ছোট এই কনিষ্ঠা বোনকে বিশেষ স্নেহ করতেন।

কাকা প্রফুল্লরঞ্জন দাশ (পি, আর, দাশ) বাবার দ্বিতীয় ভ্রাতা। ইনি পাটনাতে ব্যারিষ্টারি করে পরে ঐ হাইকোর্টের জজ হয়েছিলেন। এবং পরে তিনি আবার ব্যারিষ্টারি করেন এবং এখনো তাতেই ব্যস্ত। ভারতের সুবিখ্যাত ব্যারিষ্টার পি, আর, দাশ বলতে তাঁকেই বোঝায়। পিতৃদেবের দানশীলতা তাঁর মধ্যেও বড় কম নেই। পাটনাতে জনহিতকর এমন কোন প্রতিষ্ঠান নেই যাতে তাঁর আর্থিক অবদান না রয়েছে। অর্থ তিনি সকলকেই দেন—কিন্তু তাঁর অর্থে যদি কার্য্যকরী কোন জাতীয় প্রতিষ্ঠান তিনি করতেন তবে তাতে দেশ সমৃদ্ধ হোত সন্দেহ নেই। তিনি একাধারে সাহিত্যিক এবং সুকবিও বটে। তাঁর ইংরাজি কবিতা গ্রন্থ 'The Moth and the Star' লণ্ডনে বিখ্যাত সাহিত্যিক মহলে সুনাম অর্জ্জন করেছিল। বৈষ্ণব সাহিত্য সাধনায় তিনি পরবর্ত্তী জীবনে ডুবে আছেন। তাঁর

পাটনার বাড়ী কীর্ত্তন গানে সর্ব্বদা মুখরিত হতো। পাটনার বাড়ীতে তিনি শ্রীরাধাগোবিন্দ প্রতিষ্ঠা করেন। এইখানেই শ্রীবৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ গায়ক শ্রীপণ্ডিত বাবাজীর অপূর্ব্ব কীর্ত্তন শোনবার সৌভাগ্য হয়েছিল। প্রভুপাদ প্রাণগোপাল গোস্বামীর কাছে কাকা দীক্ষা গ্রহণ করেন। বাবার বৈষ্ণব সাহিত্য ও কীর্ত্তনের উপর যে অসীম শ্রদ্ধা ও প্রীতি ছিল কাকার মধ্যে সেটা দেখতে পাই।

১১ বৎসর আগে তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা উমা (শ্রীরণজিত গুপ্ত আই-সি-এসএর পত্নী) মাত্র ৩২ বৎসর বয়সেই ২টী পুত্র রেখে পরলোকগতা হয়। তার কিছু পরেই মাত্র ৩।৪ বৎসর আগে, ১৯৪৭ সনে আমার খুড়িমাও ইহলীলা সংবরণ করেন, এবং ১৯৪৮ সনে একমাত্র পুত্র শ্রীমান শঙ্কর মোটর দুর্ঘটনায় নিহত হয়। দাদা-মণির বংশে প্রদীপ দিতে আর কেউ রইল না। কাকার সন্তানদের মধ্যে এখন তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা গৌরী (ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী D. M. O.র পত্নী) বর্ত্তমান। কাকার পুত্রকন্যাদের মধ্যে পিকোই (গৌরী) পিতৃদেবের সবচেয়ে প্রিয় ছিল। রসা রোডের বাড়ীতে কতদিন তিনি পিকোর কান্না শুনে কাজ ফেলে উপরে ছুটে আসতেন—আর জ্যেঠামহাশয়ের স্নেহশীতল বক্ষে মাথা রেখে মেয়ে কান্নাকাটি সব ভুলে যেতো।

কাকামণি বসন্তরঞ্জন দাশ পিতৃদেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। এই ভাইটিকে ৩ বৎসর বয়সে কালীমোহন দাশএর বিধবা পত্নী চন্দ্রমণি দেবীকে দত্তক দেওয়া হয়েছিল বলেই পিতৃদেব যেন আরও গভীর স্নেহে ভাইটিকে ঢেকে রাখতেন। দত্তক নেবার ছয়মাস পরেই চন্দ্রমণি দেবী দেহরক্ষা করাতে ঠাকুরমার কোলের ছেলে আবার ঠাকুরমার কোলেই ফিরে এলো। পিতৃদেব যেমনি কাকামণিকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসতেন, কাকামণিও তেমনি ভ্রাতৃগত প্রাণ ছিলেন।

কাকামণির মৃত্যুর পর পিতৃদেব বলতেন, "আমার জামা কাপড়ের বিষয় আমি কিছুই জানতাম না—ভোলাই (কাকামণি) সব ঠিক করে দিত—এরকম করে 'টাই' বাধতে পারবে না, ওরকম চাঁদনীর কোটের মত কোট পরা হবে না—ওই বলতো। আজ আমাকে ছেড়ে সে কোথায় গেল ?—আমার ছেলেকে নিয়ে ভগবান্ তাকে রাখলেন না কেন ? ওকে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল কিনা, সে অভিমানেই ও রইল না।" এভাবে কত আক্ষেপই তিনি করতেন।

কাকামণি তাঁর সরস জীবন্ত প্রাণ আত্মীয়স্বজন ও দেশের কাজে ঢেলে দিয়ে প্রাণ চাঞ্চল্যের তরঙ্গ তুলতেন। সমস্ত বাড়ীতে তাঁর জন্য আনন্দের প্রবাহ বইত। ১৯০৫ সালে তিনি ব্যারিষ্টার হতে বিলেত যান—১৯১০ সালে তিনি দেশে বেড়াতে আসেন—সে সময়ই ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের একমাত্র কন্যা সরযুবালার সঙ্গে তার বিবাহ হয়। শীলের মেয়ে বলে প্রথম ঠাকুরমা তত খুসী হতে পারেননি—বিশেষ করে আমাদের জ্ঞাতি গোষ্ঠীরা এসে এবিষয়ে ঠাকুরমাকে নানারকম কথা শোনাতেন। এসব দেখে পিতৃদেব ঠাকুরমাকে বোঝাবার ভার নিলেন। একদিন তিনি বল্লেন "মা আমি যখন বামুনের মেয়ে বিয়ে করলাম, তখনতো তুমি আপত্তি করনি ? তবে ভোলার সময় আপত্তি করছ কেন ?" ঠাকুরমা বল্লেন "তুই বৈদ্য বিয়ে না করলেও আমাদের চেয়ে নীচু ঘরে তো বিয়ে করিসনি—এযে শীলের মেয়ে।" পিতৃদেব বল্লেন, "শীলের মেয়েতো কি হয়েছে ? ব্রজেন্দ্রনাথ শীল তো জ্ঞানে ও পাণ্ডিত্যে সত্যিকারেরই ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ কাকে বলে জান না ? যাঁরা শাস্ত্রে অভিজ্ঞ হতেন—যাঁরা বিদ্যায় পণ্ডিত হতেন—তাঁরাই ব্রাহ্মণ বলে গণ্য হতেন। যে গুণ থাকলে ব্রাহ্মণ নামধারী হতে পারতো—তার কোন্ গুণের অভাব রয়েছে ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের ? তার মত এত বড় বিদ্বান—পণ্ডিত আর

ক'জন আছে ? তিনিই তো যথার্থ ব্রাহ্মণ।" ঠাকুরমা বল্লেন, "তোর মতে তবে ব্রজেন্দ্রবাবু ব্রাহ্মণ ?" পিতৃদেব বল্লেন, "নিশ্চয়ই, এত বড় ব্রাহ্মণের মেয়ে আমাদের ঘরে আসবে, এত খুবই সৌভাগ্যের কথা।" বাবার কথা ঠাকুরমার কাছে বেদবাক্য ছিল ; তিনি খুবই উৎফুল্ল হয়ে জ্ঞাতিগোষ্ঠীদের বল্লেন, "চিত্ত যখন বলেছে ব্রজেন্দ্রশীল যথার্থ ব্রাহ্মণ—তখন আমার আর কোন আপত্তি নেই।"

কাকামণির বিয়ের নিমন্ত্রণ পত্রে যখন তাকে কালীমোহন দাশের পুত্র বলে উল্লিখিত দেখলাম তখন দাদামণিকে জিজ্ঞাসা করলাম আমরা, "তবে কি কাকামণি তোমার ছেলে নয় ?" তখন তিনি বল্লেন, "আমার বাবা কাশীশ্বর দাশ আমাকে দত্তক দিয়েছিলেন—তাই আমিও আমার ভাই কালীমোহনকে দত্তক ফিরিয়ে দিয়ে ঋণ শোধ করলাম।" আমরা তখন পর্য্যন্ত জানতাম না যে কাকামণি কালীমোহন দাশের দত্তকপুত্র। দাদামণির বড় দাদা কালীমোহন দাশের পুত্র মনোরঞ্জন দাশ যখন কন্যা কুসুমকুমারীকে রেখে লোকান্তরিত হলেন—তখন নিদারুণ পুত্রশোকে মুহ্যমান হয়ে তিনি অল্পকাল মধ্যেই পুত্রকে অনুসরণ করলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা পত্নী চন্দ্রমণি দেবী স্বামীর উইলের অনুবলে দেবর ভুবনমোহনের পুত্র বসন্তরঞ্জনকে দত্তক পুত্র রূপে গ্রহণ করলেন। কাকামণির বিয়ে সমারোহের সঙ্গেই নিষ্পন্ন হোল। বিয়ের কয়েক দিন পরেই তিনি বার্ ফাইনাল পরীক্ষা দেবার জন্য পুনরায় বিলাত যাত্রা করলেন। এক বৎসর পর তিনি পাশ করে ফিরে এসে কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টার হলেন। পিতৃদেবের সঙ্গে তিনিও ডুমরাওন কেসে ছিলেন—বেশ মনে আছে তিনি যখন সেখানে তাঁর প্রথম ফিস্ পেলেন—তখন সবটাই তিনি পিতৃদেবের হাতে দিয়ে বলেছিলেন, "দাদা, এ সবই তোমার— আমি এসব জানিনা।" ১৯১০ সালে মাত্র ২৪ বৎসর বয়সে দুরন্ত

টাইফয়েড রোগে তিনি দার্জ্জিলিং এর সল্টহিল বাড়ীতে ঠাকুরমা, দাদামণি, খুড়িমা ও ভাই বোনদেব শোকসাগরে ভাসিয়ে আমাদের বাড়ী অন্ধকার করে চলে গেলেন। পিতৃদেব তাঁর এই প্রিয়তম ভাইয়ের বিচ্ছেদবেদনা জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত ভোলেন নি। সেই দার্জ্জিলিং-এই তিনি তাঁর ভাই ভোলার ডাক অন্তিম সময়ে শুনতে পেয়েছিলেন বোধ হয়। ভোলা এসেই তাঁর আত্ম-ভোলা দাদাকে নিয়ে গেল।

বাবার পিতামহ জগদ্বন্ধু দাশ ও কাশীশ্বর দাশ দুই খুল্লতাত ভ্রাতা ছিলেন। কাশীশ্বর দাশের তিন পুত্র—জ্যেষ্ঠ কালীমোহন দাশ, মধ্যম দুর্গামোহন দাশ এবং কনিষ্ঠ ভুবনমোহন দাশ। ভ্রাতা জগদ্বন্ধু দাশের পুত্র সন্তান না থাকাতে, কাশীশ্বর দাশ তার কনিষ্ঠ পুত্র ভুবনমোহনকে দত্তক দিলেন। কালীমোহন দাশের দুই পুত্র মনোরঞ্জন এবং নিত্যরঞ্জন। নিত্যরঞ্জন অল্প বয়সেই এবং মনোরঞ্জন একমাত্র কন্যা কুসুমকুমারীকে রেখে লোকান্তরিত হন। কালীমোহনের মধ্যম ভ্রাতা দুর্গামোহন দাশের তিন পুত্র ও তিন কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্র সত্যরঞ্জন দাশ (পত্নী বিমলা দেবী), দ্বিতীয় পুত্র সতীশরঞ্জন দাশ (পত্নী বনলতা), তৃতীয় পুত্র জ্যোতিষরঞ্জন দাশ (পত্নী সুশীলা দেবী)। দুর্গামোহনের জ্যেষ্ঠা কন্যা সরলা রায় (ডাক্তার পি,কে, রায়ের পত্নী), দ্বিতীয়া কন্যা অবলা বসু (স্যার জগদীশ বসুর পত্নী) এবং কনিষ্ঠা কন্যা শৈলবালা রায় (ডাক্তার দ্বারিকানাথ রায়ের পত্নী)। দুর্গামোহনেব তিনপুত্রই ব্যারিষ্টার হয়েছিলেন। কাকাসাহেব সতীশরঞ্জন দাশ এডভোকেট জেনারেল এবং পরে ল' মেম্বর হন। কনিষ্ঠ পুত্র জ্যোতিষ কাকা রেঙ্গুনে প্র্যাকটিশ করে পরে সেখানকার হাইকোর্টের জজ হন। জ্যেঠামশাই সত্যরঞ্জন দাশ কলিকাতাতেই ব্যারিষ্টার ছিলেন। অকালেই তিনি একমাত্র কন্যা মায়াদিকে

(ডাক্তার অজিতমোহন বসুর পত্নী) রেখে পরলোকগত হন। কাকা-সাহেবের (সতীশরঞ্জন দাশ) তুই পুত্র—জ্যেষ্ঠ ধ্রুবরঞ্জন দাশ কলিকাতায় হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার এবং কনিষ্ঠ মহীরঞ্জন দাশ ম্যাকিনন্ ম্যাকেঞ্জিতে উচ্চপদে এখন প্রতিষ্ঠিত।

যৌবনেই তুর্গামোহন এবং দাদামণি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তুর্গামোহন ব্রাহ্ম সমাজের একজন প্রধান সংস্কারক ও পথপ্রদর্শক ছিলেন বল্লেও চলে।

দাদামণি দত্তক পুত্র হলেও, তাঁর ভ্রাতা কালীমোহন, তুর্গা-মোহন ও তাঁর সংসার এক সংসারের মতই ছিল।

পিতৃদেবের পিতামহ ৺জগদ্বন্ধু দাশ বিক্রমপুরের একজন খ্যাতনামা আইনবিদ্ ছিলেন। তাঁর দানশীলতা, অতিথিপরায়ণতা গল্পের মতই সবার মুখে মুখে ফিরত। তিনি সুকবিও ছিলেন। তাঁর রচিত 'নারায়ণ ও হরির লুটের পুঁথি" বিক্রমপুরের প্রতি ঘরে ঘরে আদরের সঙ্গে পঠিত হতো। ভাষা তার যেমনই সবল, ভাব তেমনি মধুর হওয়াতে সকলের অন্তর স্পর্শ করেছিল। ৺জগদ্বন্ধু দাশের পূর্ব্বেও এইবংশে অনেকেই কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন। ৺দীনবন্ধু দাশের পুঁথি পিতৃদেব বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষদে দিয়ে দিয়েছিলেন।

শিশুকালে দাশ পরিবারের অতিথিপরায়ণতার কথা আমরা দাদামণির খুল্লতাতভ্রাতা ছোড়দাতু রাখালচন্দ্র দাশের নিকট শুনতাম। ছোড়দাতু বাবার সম্পর্কে কাকা হলেও তাঁর ভ্রাতৃতুল্য ছিলেন। আমার ঠাকুরমা নিস্তারিনী দেবী সন্তানস্নেহেই তাঁকে প্রতিপালন করেছিলেন। ছোড়দাতুই আমাদের কাছে তেলিরবাগের কথা, বংশের কাহিনী সব বলতেন। এতই জীবন্ত ছিল সে বর্ণনা যে তেলীর বাগে কখনো না গিয়েও তার প্রত্যেক ছবি আমাদের মনে

রেখাপাত করেছিল। তাঁর কাছেই শুনেছি যে তেলীর বাগে দাশ পরিবারের প্রতিষ্ঠিত একটি অতিথিশালা ছিল। পূর্ব্বপুরুষদের একজন, কর্ম্মচারীদের বিশেষভাবে আদেশ দিয়েছিলেন যে কোন অতিথির যেন কখনো অসম্মান না হয় ; কেউ যেন অভুক্ত হয়ে কখনো ফিরে না যায়,—অতিথিনারায়ণ যখনি আসুন, অতিথিশালায় যেন তাঁর যোগ্য সমাদর হয়। কর্ম্মচারীরা ঠিকমত কাজ করছে কিনা দেখবার জন্য একদিন রাত্রিবেলা অতিথিরূপে তিনি সেখানে উপস্থিত হলেন, গিয়ে বল্লেন, "দ্বারে অভুক্ত অতিথি, দুটি অন্ন প্রার্থনা করি।" কর্ম্মক্লান্ত কর্ম্মচারীরা তখন বিশ্রাম করছিলেন, এই অসময়ে অতিথির আবির্ভাবে তাদের ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল, ঝঙ্কার দিয়ে তাঁরা বলে উঠলেন, "এই অসময়ে কে তোমার জন্য অন্নের থালা সাজিয়ে নিয়ে বসে আছে?" ভদ্রলোক তখনি বুঝলেন যে তাঁর অতিথিশালায় এহেন আচরণ নিশ্চয়ই এই প্রথম নয়। তিনি তাঁর পরিচয় না দিয়ে দুঃখিত অন্তরে ক্ষুব্ধ হয়ে ফিরে এলেন। দরদর অশ্রুজলে তাঁর বুক ভেসে গেল। বল্লেন "হায় হায়! দুয়ার থেকে এভাবে অভুক্ত নারায়ণ না জানি কতবার ফিরে গেছেন।" সেদিন তাকে কেউ জলস্পর্শ করাতে পারলনা। এই অন্যায়ের সুব্যবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি জলগ্রহণ করবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করলেন। কর্ম্মচারীদের পদচ্যুতি বা তিরস্কার কিছুই করলেন না, কিন্তু তাঁর প্রতিজ্ঞার কথা শুনে কর্ম্মচারীরা প্রমাদ গুনলেন, এবং শেষে তারা অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়ে এসে তাঁর পায়ের উপর পড়ে নিজেদের অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। এত বড় শাস্তি বোধহয় আর কেউ দিতে পারতেন না। পিতৃদেবের পূর্ব্বের আমাদের বংশের এক মহাপুরুষ, অতিথি যে নারায়ণ, একথা নিজ আচরণ দিয়ে সেদিন বুঝিয়ে দিলেন, "আপনি আচরি' ধর্ম্ম জীবেরে শেখায়"। এরপর অতিথিশালায় আর

অনুরূপ ঘটনা কখনো ঘটেনি। এরকম কত কাহিনী আমরা ছোড়দাদুর কাছে শুনেছি আর পুলকিত হয়েছি।

এই পুণ্যশীল পূর্ব্বপুরুষের সদ্‌গুণবিভূতিই কি পিতৃদেবের ললাটে এঁকে দিয়েছিল উজ্জ্বল টিকা?

জননী নিস্তারিণী দেবী মাত্র নয় বৎসর বয়সে স্বামী ভুবন-মোহনের হাত ধরে প্রবেশ করলেন দাশ পরিবারে। তাঁর বড় এবং মেজ জা তাঁর চেয়ে খুব বড় ছিলেন না। তখনকার দিনের প্রথা কিনা জানিনা, তবে ঠাকুরমার মুখে শুনেছি, দাশ পরিবারে একবার বধু হয়ে প্রবেশ করলে তার আর পিত্রালয়ে গিয়ে থাকা চলতো না। এই নিয়মের ব্যতিক্রম প্রথম হয়েছিল আমাদের মা, জ্যেঠিমার বেলায়। এই নয় বৎসরের বালিকাবধু যখন পিত্রালয়ের জন্য কাঁদতেন তখন সেখান থেকে তাঁর বিধবা মাকে সাদরে আনানো হোত। কিন্তু পাঠান হোত না কিছুতেই। ঠাকুরমা যখন এসব গল্প করতেন, তখন তা শুনে দাশ পরিবারের উপর খুব রাগ হোত, ভাবতাম আমরা, এত ত্যাগ, এত দানশীলতা, অতিথিপরায়ণতা যাদের, কুলবধুর প্রতি তাঁদের এ আচরণ কেন? আশ্চর্য্যের বিষয় ঠাকুরমাই আবার বলতেন, "এত বড় বংশের উপযুক্ত বৌ'তো আমাদের হতে হবে? সেই পরিবারের শিক্ষা দীক্ষা সবতো শিখতে হবে? সংসারের দায়ীত্ব নিতে হবে—বাপের বাড়ীর যাবার নিয়ম থাকলে হয়তো বছরে ছমাসই সেখানে যেতে চাইতাম! তাহ্‌লে বংশের রীতিনীতি শিখতাম কখন? প্রথম প্রথম একটু কষ্ট হোত বইকি? কিন্তু পরে বোধহয় যেতে পারলেও যেতে চাইতাম না।" দুর্গামোহনের পত্নী মেজ ঠাকুরমা ব্রহ্মময়ী দেবী যখন বিয়ের পর শ্বশুর বাড়ী এলেন, তখন তার বয়স মাত্র ছয় বৎসর। আমার ঠাকুরমা সে আন্দাজে বিয়ের সময় বেশ বড়ই ছিলেন বলতে হবে! যাহোক দাদামণি গল্প

করতেন যে তাঁর পাঁচ ছয় বৎসরের এই বৌঠানকে বলা হয়েছিল যে ভাসুরকে ছুঁতে নেই। এই ক্ষুদ্র বৌঠানটি নাকি শাড়ী পরে দৌড়াতে অসুবিধা হয় বলে, শাড়ী হাতে নিয়েই ভাসুর কালীমোহন দাশকে ছোঁবার জন্য ছুটোছুটি করে বেড়াতেন। দাদামণি·এ গল্প এমন সরস করে বলতেন যে আমরা হেসে লুটোপুটি করতাম।

দাদামণির যখন বিয়ে হয় সে সময় একান্নবর্ত্তী পরিবারের প্রথা ছিল। ভাই ভাই তখন পৃথক থাকবার কথা কল্পনাই করতে পারতেন না—জ্যেষ্ঠতাত ও খুল্লতাতের পুত্রেরা একই পরিবারে প্রতিপালিত হোতেন।

ঠাকুরমা নববধূবেশে প্রবেশ করলেন এই বৃহৎ পরিবারে। মেজ ঠাকুরমা অকালেই ইহলোক ত্যাগ করেন এবং কাকামণিকে দত্তক পুত্র নেবার অনতিকাল পরেই বড় ঠাকুরমাও তাকে অনুসরণ করেন। তখন এই বিশাল পরিবারের অসীম দায়ীত্ব মাথায় তুলে নিয়েছিলেন ঠাকুরমা। দুর্গামোহনের মাতৃহীন পুত্রকন্যার মা হলেন তিনি। 'ঠানখুড়ি' বলতে তাঁরা জ্ঞান হারাতেন। তাঁরা সকলেই তাঁদের ঠাকুর খুড়া ভুবনমোহন ও ঠান্‌খুড়ি নিস্তারিনী দেবীকে তাঁদের পিতামাতার আসনে বসিয়ে ছিলেন।

দুর্গামোহনের জ্যেষ্ঠা কন্যা সর'পিসিমা সরলা রায় বলতেন, "ঠান্‌খুড়ির জন্য কোনদিন আমরা মার অভাব বোধ করিনি।" তাঁর কাছেই শুনেছি যে বাবা যখন ছয় সাত বৎসর বয়সের তখন দাশ পরিবার অসচ্ছলতার মধ্যে দিন কাটাচ্ছিল, কাকাসাহেব সতীশ রঞ্জন তখন অল্প বয়স্ক, পিতৃদেবের চেয়ে তিনি কিছু ছোট ছিলেন। সর'পিসিমা বলতেন "সতীশটা রোজ রসগোল্লার জন্য বায়না করতো, চিত্তও রসগোল্লা খুব পছন্দ করতো, কিন্তু মুখ ফুটে কখনো বলতো না। ঠান্‌খুড়ি সতীশের আব্দার রাখতে রসগোল্লা আনতেন—

সকলকেই ভাগ করে দিতেন ঠিক—কিন্তু ভাগের বেলায় সর্ব্বদাই দেখতাম চিত্তর থেকে সতীশ বেশী পেয়েছে। এরকম প্রায়ই হোত দেখে একদিন আমি রেগেই গেলাম, বল্লাম, "ঠান্‌খুড়ি এ তোমার কেমন বিচার? সতীশ, চিত্তর বয়সে তো এমন কিছু ব্যবধান নেই। ওদের ভাগও সেরকমই হওয়া উচিত নয় কি?" তারপর একটু হেসে বল্লেন, "ঠান্‌খুড়ির সে মাতৃমূর্ত্তি আমি এখনো যেন দেখতে পাই"! সজল চোখে মৃদু ভাবে মাত্র দুটি কথায় ঠান্‌খুড়ি আমাকে চুপ করিয়ে দিলেন। ছল ছল চোখে তিনি বল্লেন, "সর', সতীশের যে মা নেই"। মুহূর্ত্তের জন্য আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম। ঠান্‌খুড়ির উচ্চারিত 'ওর যে মা নেই' বার বার আমার কানে বাজতে লাগল। তাই এখন ভাবি সত্যিই কি সতীশের মার অভাব হয়েছিল কোনদিন? কখনো নয়! ঠান্‌খুড়ি যে আমাদের কি ছিলেন, কতখানি ছিলেন—তা তোরা ছেলেপুলেরা বুঝবি কি?

বুঝতাম খুব ভাল ভাবেই। আমাদের জীবনে যা দেখেছি তার ভিতর দিয়েই বুঝতে বিশেষ কোন কষ্ট হয় নি। এখন ভাবি, নিজেকে নিঃশেষ করে পরকে দিয়ে আনন্দ পাবার এই যে উৎস, পিতৃদেব পেয়েছিলেন কি তাঁর মায়ের মধ্যে? ছোটবেলা থেকেই দেখেছি রসারোডের বাড়ীতে সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন জ্যেঠতুতো, খুড়তুতো, ভাইবোন, ভাজ, ভগ্নিপতি আরও সকলে মিলে আনন্দ করে খাওয়া দাওয়া করতেন। পিসামহাশয় আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু সবসময় অন্যমনস্ক থাকতেন—মা ঠাট্টা করে তাঁর থালার চার-পাশের বাটিতে শুধু তিতোর ডাল দিয়ে ভরে দিতেন। মা জিজ্ঞাসা করতেন, "জগদীশ বাবু, মাংসটা কেমন লাগছে?" তিনি বলতেন 'খুব ভাল, খুব ভাল'। পিতৃদেব হেসে বলতেন, "মশাই, এতক্ষণ ধরে একজিনিষ দিয়েইতো খেয়ে যাচ্ছেন?" পিসামশায় তখন "কি অন্যায়, কি

অন্যায়, শীগ্‌গীর আমাকে অন্য ভালপদ দাও" বলে অস্থির হয়ে উঠতেন। এই রকম আনন্দের মধ্যে ভ্রাতা, ভগিনী, ভ্রাতৃজায়া নন্দাইদের আহার পর্ব্ব শেষ হতো। আমরাও ঐ ঘরেরই অন্য অংশে নিজেদের পিসতুতো ভাই বোন নিয়ে দল বেধে বসে যেতাম। ছোড়দাছুর পুত্র কাকা সুধীররঞ্জন দাশ (সুপ্রীম কোর্টের জজ) আমাদের দলেই থাকতো—কারণ, সম্পর্কে কাকা হলেও সে আমার মায়ের পুত্র তুল্যই ছিল।

———

ভুবনমোহন দাশ ও ব্রাহ্মসমাজ

দাদামণি ভুবনমোহন কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্ণী ছিলেন। কবিতাও তিনি লিখতেন। তাঁর রচিত বহু সঙ্গীত আমরা ছোটবেলায় গাইতাম। সরস, সরল তাঁর গীতাবলীতে রামপ্রসাদের প্রভাব খুব বেশী ছিল। কোন কোন পদে কৃষ্ণ কমলের রাই উন্মাদিনীর প্রভাবও তিনি এড়াতে পারেননি। শুধু বাংলা পদ্যে নয়, ইংরাজী রচনাতেও যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। তিনি যখন 'ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন' ও পরে "বেঙ্গল পাব্লিক ওপিনিয়নের" সম্পাদকতা করতেন, তখন তাঁর অগ্নিবর্ষী লেখা অন্যায়ের বিরুদ্ধে উদ্যত হোত ; তা ব্রাহ্ম সমাজের অন্যায় মতের বিরুদ্ধেই হোক, বা বৃটিশ রাজনীতির বিরুদ্ধেই হোক। যা তিনি অন্যায় বলে মনে করতেন, বা মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন, তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে তিনি কখনো দ্বিধা করেননি। আদর্শ ব্রাহ্ম ছিলেন তিনি, কিন্তু তদানীন্তন ব্রাহ্ম সমাজ যেমন পশ্চিমের দিকে মুখ করে বসে থাকতো—বসনে-ব্যসনে, আহারে-বিহারে, এমন কি অঙ্গভঙ্গীতে পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের একটি বিশিষ্ট অংশ একেবারে নিমজ্জিত হয়েছিল। যা কিছু পশ্চিমের সবই সমাজের এই মনোভাবের লোকেরা গ্রহণ করেছিল। দাদামণি প্রায়ই বলতেন "যারা বর্ণ বৈষম্য ছাড়া মনে প্রাণে ইংরাজ, আমাদের জ্ঞানরত্নের সন্ধান তারা জানবে কেমন করে ?" তাই ব্রাহ্ম সমাজের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করতে তিনি বিশেষ চেষ্টিত হলেন। দুর্গামোহন দাশের জ্যেষ্ঠ জামাতা ডাক্তার পি, কে, রায়ের লিখিত পুস্তিকা ; "A Few thoughts on the Brahmo Samaj" যখন ১৯১১ সালে

প্রকাশিত হয়, তার প্রতি-উত্তরে দাদামণি "On Spiritual Education and Religion of the Brahmo Samaj", By an Old Brahmo বলে পুস্তিকায় ব্রাহ্ম সমাজের ধর্ম্ম বিশ্লেষণ করে তিনি বলেন —

"What is the Religion of the Brahmo Samaj? It is not the pure theism of the Upanishads propounded by Raja Rammohan Ray, or the primitive religion of the Aryans purged of Idolatry and crusts of the degrading customs and the usages, which subsequently found their way into it, minus its divine origin or revelation? If you mean by it not that, but a religion consisting of truths taken from all sources and established religions, Hindu, Budhistic, Christian, and Islamic, then the Brahmo Samaj has no religion peculiarly its own, and it is a misnomer to call it the religion of the Brahmo Samaj."

এই রকম ব্রাহ্ম ছিলেন তিনি। ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত হয়েছেন বলেই নিজ দেশাচার বা আমাদের শাস্ত্রসমূহ ত্যাগ তিনি করেন নি। তাঁর পরবর্ত্তী জীবনে আমরা দেখেছি তাঁকে রাশি রাশি শাস্ত্র গ্রন্থের মধ্যে বিভোর হয়ে থাকতে। তাঁর একটি একটি কথা মনে পড়ে; ঠাকুরমার মৃত্যুর পরেই তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম একদিন, "দাদামণি, ব্রাহ্ম ধর্ম্ম তো হিন্দু ধর্ম্মেরই অংশ, তবে বিশেষ করে আমাদের ব্রাহ্ম বলে কেন?" উত্তরে দাদামণি ম্লান হাসি হেসে বল্লেন,—"আমাদের সমাজ তা বলে বটে, কিন্তু সেটা আমাদের ভুল। 'ব্রাহ্ম' বল্লেই কি ব্রাহ্ম হয়? ব্রাহ্ম কাকে বলে তোকে সহজ করে বলি;—শোন! এই আমাকে, তোর ঠাকুরমাকে, মাকে, বাবাকে খুব ভালবাসিসতো? কিন্তু তোর মনের মধ্যে কি সব সময়ই শুধু আমাদের কথা মনে হয়? না তা হয় না—তোর ক্ষুধা, তৃষ্ণা, পড়াশোনা, খেলাধুলা কোনটাই তুই ভুলতে পারিস না—মনের

মধ্যে হাজার রকমের ভাবনা উঁকি ঝুঁকি মারে ; যে ব্রাহ্ম হয় সে মনের মধ্যে ভগবান ছাড়া আর কোন ভাবনাকে আসতে দেয় না— একমনে একপ্রাণে যে ভগবানকে পরমব্রহ্মরূপে ভাবতে পারে— তাঁর সঙ্গেই যে একাত্ম হয়ে যেতে পারে—সেই হোল ব্রাহ্ম নামের যোগ্য অধিকারী। ·যখন দেখবি মনেব মধ্যে তুই ভগবানকে অনুভব করছিস্, তাঁর কথা শুনছিস্, তখনি হবি তুই প্রকৃত ব্রাহ্ম। ব্রাহ্ম হওয়া কি মুখের কথা ? ব্রাহ্ম, ব্রাহ্ম বলে আমরা স্পর্দ্ধা করি, কিন্তু সত্যিকারের ব্রাহ্ম কজন হতে পেরেছি আমরা ?"

ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত হয়ে তিনি ব্রাহ্ম হয়েছিলেন কি না জানিনা, তবে তাঁকে অন্যান্য গোঁড়া ব্রাহ্মদের মত কখনো কোন অপর ধর্ম্মকে অবজ্ঞা করতে দেখিনি। হিন্দু সমাজ ভুক্ত বহু আত্মীয় ও অনাত্মীয় তাঁর বাড়ীতে প্রতিপালিত হোত, তাদের স্ব স্ব ধর্ম্মাচরণে তিনি কখনো কোন আপত্তি করেননি। রসারোডের বাড়ীতে ৺শিবের মন্দিরে কালীমোহন দাশের বিধবা পুত্রবধূ দুর্গাসুন্দরী দেবীর তত্ত্বাবধানে শিবপূজা হোত। আবার তেলীরবাগের বাড়ীতেও ৺দুর্গাপূজা এবং অন্যান্য পার্ব্বণে নিয়মিত তাঁর অংশের অর্থ তিনি পাঠাতেন।

ডাক্তার পি, কে, রায় যখন বলেছিলেন যে—"The teachers of the Brahmo Samaj should co-operate with the teachers of free Christianity and liberal religion in the West to unfold the secret of man's spiritual nature, to unfold the Laws of the spiritual world".

তার উত্তরে তিনি তীব্র প্রতিবাদ করে বল্লেন " You donot also ask them to co-operate with the spiritual teachers of your country, both of the past and present, especially

when you speak of the spiritual wealth of ancient India."

তিনি বলেছিলেন,— "I find that whenever there is a reference to moral and spiritual education, you always advise seeking help from the West, as if the East has nothing to teach you."

ডাক্তার পি, কে, রায়ের উক্তি সমূহের উল্লেখ করে যে সিদ্ধান্তে এলেন, সে সম্বন্ধে তিনি বললেন,— "This I can only ascribe to the natural bent of a westernised intellect."

তিনি দৃঢ় কণ্ঠে বলেছিলেন যে "আমাদের তথাকথিত শিক্ষিত ব্রাহ্মসমাজ তাঁদের প্রচারকদের মধ্যে হয়তো একজন ডাক্তার আরনল্ড (Arnold) বা বিশপ ওয়েল্ডন (Weldon)এর প্রতিরূপ দেখতে চান; কিন্তু আমি চাই আমাদের প্রচারকদের মধ্যে যাজ্ঞবল্ক্য ও শঙ্করাচার্য্যকে দেখতে।"

পারিবারিক বৈঠকে ও তাঁর নানা লেখায় তিনি বলতেন যে হিন্দুর ছেলে হলেই সে হিন্দু, ব্রাহ্মের ছেলে হলেই সে ব্রাহ্ম, বা ক্রীশ্চিয়ানের ছেলে হলেই সে ক্রীশ্চিয়ান, এমতের পরিপোষক তিনি নন। তিনি বলতেন, "ধর্ম্মভাব আসে মানুষের অন্তরের অন্তস্তল থেকে, ভূসম্পত্তির মত ধর্ম্ম কখনো পিতা থেকে পুত্রেতে বর্ত্তান উচিত নয়; পিতামাতার কর্ত্তব্য সন্তানদের ধর্ম্মশিক্ষায় উদারভাবে শিক্ষিত করা, প্রাপ্ত বয়সে যদি তারা তাদের স্বীয় ধর্ম্মপথ বেছে নেয় তাতে কোন পিতামাতার বাধা দেওয়া তিনি সমীচীন বলে মনে করতেন না। গণ্ডীবদ্ধ করে ধর্ম্মশিক্ষার তিনি বিশেষ বিরোধী ছিলেন; তা সে যে ধর্ম্মই হোক। আর সর্ব্বদাই বলতেন "সব ধর্ম্মকে শ্রদ্ধা করা সবচেয়ে বড় ধর্ম্ম, ধর্ম্মের পথ মনোমত না হলেও কোন ধর্ম্মই

অবজ্ঞেয় নয়।”

এই রকম আদর্শবাদী ব্রাহ্মের পুত্র পিতৃদেব ছিলেন বলেই, আমার বিবাহ যথাবিহিত হিন্দুশাস্ত্রানুসারে তিনি দিতে পেরেছিলেন। তথাকথিত ব্রাহ্মের পুত্র ব্রাহ্ম হয়ে তিনি নিজে ঐ ধর্ম্মে দীক্ষিতও হননি, বা ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে আমাদের ভাই বোনদের কারও বিয়েও তিনি দেননি।

দাদামণি যে সময়ে ব্রাহ্ম সমাজে যোগ দিয়েছিলেন, তখন এমন একটি সমাজের বিশেষ প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল। আমাদের শাস্ত্রীয় নীতি শ্লথ হয়ে, ধর্ম্মের মূলধারা হারিয়ে হিন্দুসমাজ তখন ঘোর কুসংস্কারে মগ্ন হয়েছিল। শাস্ত্রানুমোদিত ধর্ম্মে যা ছিল না, সম্প্রদায় বিশেষের সুবিধার্থে এই কুসংস্কারকে ধর্ম্মের আবরণ দিয়ে ঘিরে সমাজ অবাধে তাকে ধর্ম্ম বলে চালিয়ে যাচ্ছিল। এরই জন্যই হিন্দু সমাজ তার একটি বৃহৎ অংশ হারাতে বসল ; তাই ধর্ম্মের নামে এই অধর্ম্ম ও কুসংস্কার থেকে হিন্দুধর্ম্মের ধারা সুসংস্কৃত করার উদ্দেশ্য নিয়ে, সমাজের এই বিপন্ন সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন রাজা রাম-মোহন রায়। তিনি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠিত করলেন। এই নব সমাজে হিন্দুর শাস্ত্রপদ্ধতি, উপনিষদ, গীতা, কোনটাই বর্জ্জিত হোলনা। এই সব গ্রন্থ থেকে বহু শ্লোক গ্রহণ করে তিনি নব প্রবর্ত্তিত উপাসনা পদ্ধতিতে যোগ করলেন। জাতিবৈষম্য বর্জ্জিত হোল এসমাজে। একেশ্বরবাদ তিনি প্রচার করলেন, এবং সেই পরম পুরুষের মহান সত্ত্বা কোন বিশেষ আধারে বেঁধে রাখা যায়না—বিশ্বাস ও বিবেচনা করেই তিনি পৌত্তলিকতা বর্জ্জন করলেন। শ্রীভগবানের সত্ত্বা মিলিয়ে আছে সর্ব্বভূতে. এই চরমবাণী ও পরমব্রহ্মকে উপলব্ধি করবার জন্যই তিনি এই সমাজ স্থাপন করলেন।

রাজা রামমোহনের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারী হলেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি রামমোহনের পদ্ধতি সবই বজায় রাখলেন, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের রীতি অনুসারে "আমি হিন্দু নই" একথা বলতে অস্বীকার করলেন। তিনি ও রাজনারায়ণ বসু ব্রাহ্মসমাজের বিবাহ রেজেষ্ট্রি করার বিরোধী ছিলেন। এই সব মতানৈক্যের জন্য তিনি পৃথক করে আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করলেন। এই সমাজে বিবহ চূড়াকরণ, শ্রাদ্ধ সবই হিন্দুশাস্ত্রানুযায়ী মন্ত্রদ্বারা সম্পাদিত হোত। পৌত্তলিকতার বিরোধী তিনিও ছিলেন, কিন্তু অগ্নি স্থান পেয়েছিল তাঁর সামাজিক আনুষ্ঠানিক রীতিতে।

মহর্ষির গভীর ধর্ম্ম পিপাসার মূল উৎস ছিল আমাদের পুরাতন ধর্ম্ম ও শাস্ত্র সমূহে। এই সব গ্রন্থ থেকে মধু আহরণ করে তিনি ভাবে এতই বিভোর হয়ে থাকতেন যে ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে তাঁর অসংখ্য গুণমুগ্ধ ভক্তগণ তাঁকে মহর্ষি বলে বন্দনা করলেন। রাজা, মহারাজা, অধিরাজা, স্যার, সব খ্যাতিসূচক পদবীর বহু উর্দ্ধে স্থান পেল এই মহর্ষি আখ্যা। স্বামী বিবেকানন্দ একদিন এই মহর্ষির পদতলে বসে পরমব্রহ্মের সাধনা করেছিলেন; তাঁর সাধনার সিদ্ধি লাভ হোল দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের কৃপা লাভ করে, আর মহর্ষির কৃপায় ব্রহ্মলাভ হলো ব্রহ্মানন্দ শ্রীকেশবচন্দ্র সেনের।

এখানে ব্রাহ্ম সমাজের বিস্তৃত ইতিহাস লিখতে আমি বসিনি এবং তা লিখবার যোগ্যতাও আমার নেই। আমার শুধু এই বক্তব্য যে প্রকৃত ব্রাহ্ম যাঁরা, তাঁরা আমাদের পুরাতন শাস্ত্র বর্জ্জন তো করেননি পরন্তু সেই শাস্ত্রের ভিত্তিতেই তাঁরা ব্রাহ্ম সমাজ গড়ে তুলেছিলেন। তা রাজা রামমোহন রায়ের ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ হোক, কি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আদি সমাজই হোক বা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের নববিধান সমাজই হোক। ব্রাহ্ম সমাজের

এই ত্রিধারায় স্নাত হয়ে দেশ অনেক সমৃদ্ধ হোল সন্দেহ নেই। তাঁদেরি একান্ত চেষ্টায় দেশে স্ত্রী শিক্ষার প্রচলন প্রথম আরম্ভ হয়। ক্রীশ্চিয়ান না হয়েও অসবর্ণ বিবাহের পথ ব্রাহ্ম সমাজই প্রথম দেখান। অল্পবয়স্কা বিধবার বিবাহ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহায়তায় তাঁরা প্রচলন করবার চেষ্টা করেন। ব্রাহ্মসমাজের এই সংকল্প প্রথম রক্ষিত হোল দুর্গামোহনের গৃহে। তিনিই বরিশালে প্রথম তাঁর অল্পবয়স্কা বিধবা বিমাতার বিবাহ দেন। যা উচিত ও ন্যায় বলে বুঝেছিলেন তা সম্পন্ন করতে ব্রাহ্মসমাজের পথ পদর্শক দুর্গামোহন লোকনিন্দা গ্লানিকে গ্রাহ্য করেননি। এই কার্য্যে দেশময় তুমুল আন্দোলনের তরঙ্গ উঠল, এসব কথা নিয়ে কত ছড়া পাঁচালী লোকের মুখে মুখে ঘুড়তে লাগল—পূর্ব্ববঙ্গ গেয়ে উঠল।—

ব্রাহ্ম সমাজের কথা কি বলিব আর
দুর্গামোহন দিল বিয়া নিজ বিমাতার।

কিন্তু দুর্গামোহন টল্‌লেন না। এই রকম অসংখ্য ছড়া পাঁচালী ও আন্দোলনেও তিনি অনড় অটল রইলেন। এর পর অল্পবয়স্কা বিধবাদের বিবাহ সমর্থন করে হিন্দু সমাজের বহু খ্যাতনামা ব্যক্তিও তাঁদের সহানুভূতি জানালেন। পরবর্ত্তী কালে রাঢ়ী ব্রাহ্মণ সমাজের অগ্রণী, বাংলা তথা ভারতের গৌরব স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর বালবিধবা জ্যেষ্ঠা কন্যার হিন্দুশাস্ত্রানুসারে বিবাহ দিয়ে শুধু ব্রাহ্মণ সমাজই নয়, সমগ্র হিন্দু সমাজে সৎসাহসের পরিচয় দিয়ে আদর্শ রেখে গিয়েছেন।

দাদামণি যদিও কলিকাতায় এটর্ণী হয়ে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেছিলেন, কিন্তু সঞ্চয়ের কোঠায় তাঁর সেই অর্থ স্থান পায়নি। বিলাস, ব্যসন যাঁর একেবারেই ছিল না, সাধারণভাবে যিনি জীবন যাপন করে গিয়েছেন, তাঁর দেউলিয়া আদালতে আশ্রয়

নিতে হোল কেন? একথা হয়তো অনেকেই ভাবেন। কিন্তু আমরা এবিষয়ে শিশুকাল হতেই শুনেছি যে প্রথমতঃ তাঁর দান করার কোন হিসাব ছিল না ; দ্বিতীয়তঃ কাউকে টাকা ধার দিয়ে তা ফিরে চাইতে তিনি পারতেন না ; আর তৃতীয়তঃ এর মূল কারণ হোল তাঁর বন্ধুপ্রীতি। শুনেছি তাঁর বহু বন্ধু নিজেদের কর্ম্মোন্নতির জন্য দাদামণিকে জামীন হবার জন্য অনুরোধ করতেন। কোমল দয়ালু প্রাণ তাঁর, তাঁদের কান্নায় গলে যেত ; তিনি তাদের জামীন হতে আপত্তি করতেন না। এই জামীন হবার পরোপকার-বৃত্তিতেই তার আশ্রয় নিতে হোল দেউলিয়া আদালতে। কিন্তু যাঁদের দুঃখ লাঘব করবার জন্য তিনি এই দায়ীত্ব গ্রহণ করলেন, তারা কিন্তু তাদের কার্য্য সিদ্ধি করে এই উপকারী বন্ধুর কথা একবারও স্মরণ করলেন না। এর পরই ক্রমশঃ অর্থের অনটন দেখা দিতে লাগল দাশ পরিবারে। স্বামীর এই বিপদের সময় ঠাকুরমাত' হাসিমুখে তার অঙ্গের অলঙ্কার সব খুলে দিলেনই ; তার সঙ্গে তার খুল্লতাত দেবর ৺রাখাল চন্দ্র দাশের পত্নী বিনোদিনী দেবীও তার ভাসুরের জন্য সমস্ত অলঙ্কারই দিয়ে দিলেন। এই বিনোদিনী দেবীই ছিলেন আমাদের ছোড়দিদিমা। ছোড়দাদু রাখাল চন্দ্র দাশের কথা আগেই বলেছি। বাবা কিন্তু তার এই খুড়িমার কথা কখনো ভোলেন নি।

বন্ধুপ্রীতির ফলে দাদামণি আর্থিক কষ্টে পরলেও তার জন্য তিনি কখনো কাউকে দোষ দিতেন না। তাঁর কর্ম্মফলেই তিনি কষ্ট পাচ্ছেন, এই ছিল তার দৃঢ় বিশ্বাস। তাই তার অকৃতজ্ঞ উপকৃত বন্ধুদের নিয়ে কেউ যখন তাঁকে কথা শোনাত তিনি মৃদু হেসে বলতেন—"দোষ কারো নয়গো মা, আমি স্বখাদ সলিলে ডুবে মরি শ্যামা"।

তিনি যখন ঋণভারে জর্জ্জরিত, তখন তার ভ্রাতা দুর্গামোহন তাকে ঋণমুক্ত করার জন্য বহু সাহায্য করেছিলেন, কিন্তু দুস্তর বারিধিসম এ ঋণ সম্পূর্ণ শোধ করতে তিনিও অক্ষম হলেন। কাজেই দাদামণির দেউলিয়া আদালতে শরণ না নিয়ে উপায় কি? দেউলিয়া হয়ে তিনি আইন বলে ঋণমুক্ত হতে পারলেন সত্য কিন্তু অন্তরে ঋণমুক্ত হতে পারলেন কই? দাদামণির এই ঋণভার শোধ করবার অক্ষমতা ও সেজন্য তার অন্তরের এই গভীর দুঃখ পিতৃদেবের হৃদয়ে দৃঢ় রেখাপাত করেছিল। পিতৃদেবের জন্মের কয়েক বৎসর পরে দাদামণি তার পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীটের বাড়ী ছেড়ে দক্ষিণ কলিকাতায় এসে বাসা করেন। প্রথমে বির্জ্জীতলা ও চক্রবেড়িয়া ও পিপুলপট্টী থেকে তিনি ১৪৮নং রসারোডে (চিত্তরঞ্জন সেবাসদন) এলেন। জামীন হবার জন্য দেনার দায়ে তার বির্জ্জীতলা ও সারকুলার রোডের বাড়ী বিক্রয় করে দিতে হয়। ১৪৮নং রসারোড তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কালীমোহনের বাসভবন ছিল এবং এই ভবন তার দত্তক পুত্র কাকামণি বসন্তরঞ্জণ দাশ পান। দাদামণি এই বাড়ীতেই স্থায়ীভাবে বাস করতে এলেন। কাকামণি তার উইলে এ বাড়ী ঠাকুরমাকে দিয়ে যান, এবং ঠাকুরমার উইলের অনুবলে বাবা ও কাকা এবাড়ীর উত্তরাধিকারী হলেন—কাকা পাটনা যাবার সময় তার অংশ পিতৃদেব তার কাছ থেকে নিলেন।

এ বাড়ী সম্বন্ধে আমরা শিশুকাল থেকেই একটি প্রবাদ শুনতাম। শুনেছিলাম এবাড়ী একজন বৃদ্ধার ছিল, তার অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে তাঁর জ্ঞাতিরা এবাড়ী হস্তান্তরিত করে তাঁকে বিতাড়িত করে। মৃত্যু সময়ে এই বৃদ্ধা শাপ দিয়েছিল এবাড়ী যে নেবে সে নির্ব্বংশ হবে। পিতৃদেব একথা প্রায়ই বলতেন—কাকামণি মারা যাওয়াতে কালীমোহন দাশের বংশ সত্যই নির্ম্মূল হোল। তখন থেকেই

বাবা অন্যবাড়ী যাবার কথা ভাবতেন। আলীপুরে তিনি সন্তোষের মহারাজার বাড়ী ক্রয়ও করেছিলেন ; কিন্তু বংশের স্মৃতি চিহ্নপুরিত রসারোডের বাড়ী থেকে উঠি উঠি করেও তাঁর উঠা আর হল না। অসহযোগ আন্দোলনের পূর্ব্বেই তিনি আলীপুরের বাড়ী বিক্রয় করে দিলেন—তাঁর বংশ থাকবেনা বলেই হয়তো বিধির বিধানে তিনি এখানেই রয়ে গেলেন। অবশেষে অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি দেশের মাতৃজাতির হিতকল্পে এবাড়ী দিয়ে দিলেন। তাঁব মৃত্যুর পর মহাত্মা গান্ধীর প্রেরণায় ও সাহায্যে এবং জনগণের অর্থে রসা রোডের বাড়ী চিত্তরঞ্জন সেবাসদন রূপে প্রতিষ্ঠিত হোল। রসা রোডেব বাড়ী দানকল্পে ভূকৈলাশের সত্যমোহন ঘোযাল পিতৃদেবের ঋণের অংশ বহুল পরিমাণে স্বেচ্ছায় ছেড়ে না দিলে, হয়তো আজ সেবাসদন হোত না।

আজ দুঃখ হয় ভাবতে যে শুধুই দাশ বংশের নয়, অতীত গৌরব কাহিনী জড়িত এবাড়ীর চিহ্নমাত্র আজ নেই। যে গৃহে চিত্তরঞ্জনের যৌবন অতিবাহিত হয়েছিল, যা একদিন রবীন্দ্র সঙ্গীতে স্নাত হয়েছিল, বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের স্রষ্টা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের পদধূলি অঙ্গে মেখে ধন্য হয়েছিল, যে আবাস আলিপুরের বোমার মামলার মুক্ত শ্রীঅরবিন্দকে তাঁর সহকর্ম্মীবৃন্দসহ প্রথম বক্ষে তুলে অভিনন্দন জানাল, বাংলার নাগশিশুদের ফণীমনসার বেড়ারূপে ছিল যে আলয়, আজ তা নেই। লোকমান্য তিলক, মহাত্মা গান্ধী, মতিলাল নেহেরু, পাঞ্জাব কেশরী লালা লাজপত রায়, সরোজিনী নাইডু, বিজয়রাঘবাচারিয়া, মহম্মদ আলী জিন্না, মৌলানা মহম্মদ আলী, সৌকত আলী, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, শ্রীমতি এ্যানি বেসাণ্ট, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, ডক্টর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, আচার্য্য

জগদীশচন্দ্র বসু, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, সুভাষচন্দ্র বসু, কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি নবীনচন্দ্র সেন, কত নাম বলব; এঁদের সকলের পদধূলি এবং দেশের প্রতি-পাদবিক্ষেপের ইতিহাস বুকে নিয়ে গর্ব্বোন্নত শিরে দাঁড়িয়েছিল যে আবাস, সেই পুণ্য নিকেতনের একখানি ঘরও জাতীয় স্মৃতি-চিহ্নরূপে রাখবার ঔচিত্য বোধ করেননি চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের কর্ত্তৃপক্ষ।

আমার পরলোকগত স্বামীর সঙ্গে বহু দেশ ও বিদেশ যাবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল; আমি প্রত্যেক দেশেই দেখেছি যে জাতীয় স্মৃতির সম্মান সেখানে কি ভাবে রেখেছে! চীনের সানইয়াৎ সেনের হল, ফ্রান্সে নেপোলিয়নের স্মৃতি-সৌধ, নৃপতিদের ঐতিহাসিক বাসভবন, ইংলণ্ডে সেক্সপিয়রের কুটীর, জার্ম্মানীতে ওয়াগনারের স্মৃতি, জাপানে প্রাচীন ঐতিহাসিক আবাস, কি শ্রদ্ধা ও গর্ব্বের সঙ্গেই না রক্ষিত হয়েছে! এমন কি লণ্ডনে হফোর্ড স্কোয়ারে ভিন্ন দেশীয় হয়েও লেনিন যে গৃহে থাকতেন, সে বাড়ী পর্য্যন্ত তারা ধ্বংশ করেনি। বাড়ীর গাত্রে প্রস্তরফলকে তারা লিখে রেখেছিল 'এ গৃহে লেনিন ছিল', গত মহাযুদ্ধে এই গৃহ ধ্বংশ হয়। আর আমাদের বাংলাদেশের জাতীয় সম্পদ বলে গর্ব্ব করবার যে বস্তু, অঙ্গে অঙ্গে যার জাতীয় ইতিহাসই শুধু নয়, জাতীয় ঐতিহ্য, ধর্ম্ম, সংস্কৃতি, সাধনা ও সঙ্গীত সবার রংএ রং মিশিয়ে প্রাণের রক্তরাগে রঞ্জিত হয়েছিল যে পবিত্র নিকেতন, তাকে নির্ম্মম ভাবে নিশ্চিহ্ন করে দিতে কি বাঙ্গালীর একটুও বাঁধলনা?

সব সময়ই বাংলাদেশ ভারতের অন্যসব প্রদেশকে পথ নির্দ্দেশ করেছে—আশাকরি বাংলার এ কলঙ্ক কাহিনীর অনুসরণ ভারতের আর কোথাও হবে না।

বাল্যাবস্থা

ঠাকুরমার মুখে, পিসিমাদের কাছে, পিতৃদেবের শিশুকালের অনেক কথাই শুনেছি। তখন যদি জানতাম যে "মানুষ চিত্তরঞ্জন" লিখবার বাসনা একদিন প্রাণে জাগবে, তাহলে জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত বেঁধে রাখতাম খাতার পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে। আজ বহু অসুবিধা সত্ত্বেও 'মানুষ চিত্তরঞ্জন' লিখতে বসেছি এই মনে করে, যাতে দেশের ভবিষ্যত সন্তানের মধ্যে তাঁর আদর্শ অমর হয়ে থাকে।

শিশুকাল থেকেই চিত্তরঞ্জনের অধিনায়কত্ব তাঁর ভ্রাতা ভগিনীরা স্বীকার করে নিয়েছিল। অবু পিসিমা, লেডী অবলা বসু বলতেন, "চিত্ত আমাদের সবাইকে চারদিকে বসিয়ে নিজে দাঁড়িয়ে কি বক্তৃতাই দিত, বক্তৃতার প্রতিপাদ্য বিষয় যাই থাকুক না কেন, তার আবেগময়ী ভাষা ও অফুরন্ত কথার উৎসে আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মত ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতাম, কোথা দিয়ে সময় চলে যেত বুঝতেই পারতাম না।" তখন থেকেই কি সূচিত হয়েছিল ভবিষ্যৎ বক্তার আবির্ভাব, যা পরবর্ত্তী জীবনে আলোড়িত করেছিল পরাধীন ভারতবর্ষকে?

শিশুকাল থেকেই পিতৃদেব অত্যন্ত মাতৃগতপ্রাণ ছিলেন। কি করলে মা খুসী হবেন বা কি করলে তাঁকে আরাম দেওয়া যাবে এবিষয়ে তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। তাঁর এই মাতৃপ্রীতির একটি মধুর কাহিনী ঠাকুরমা বলেছিলেন।

যখন তাঁর সাত, আট বৎসর বয়স তখন গ্রীষ্মকালে একদিন দুপুরবেলা শুয়ে শুয়ে ঠাকুরমা একখানি বই পড়ছিলেন, এমন সময়

তাঁর পায়ের সামনে এসে দাঁড়ালেন পিতৃদেব। তাঁর গা ঠাকুরমার পায়ে লাগাতে তিনি বল্লেন "তোর গা কি চমৎকার ঠাণ্ডা রে" বলেই তিনি আরাম করে পা ভাল করে মেলে ছেলের গায়ে দিয়ে রইলেন। ঠাকুরমার খেয়াল ছিলনা—ঠাণ্ডা গায় পা লাগিয়ে তিনি আরাম করে বই পড়াতে তন্ময় হয়ে রইলেন। হঠাৎ তাঁর খেয়াল হলো "তাই তো, চিত্ত তো সেই থেকে দাঁড়িয়েই আছে চুপ করে!" তাড়াতাড়ি চেয়ে দেখলেন মাতৃপদ অঙ্গে ধরে তার আদরের ছেলে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েই আছে। মা একটু আরাম করছেন, তাই ছেলে একটুও নড়েনি, পাছে নড়াচড়া করলে মা'র অসুবিধা হয়। এইখানেই কি বেঁধেছিলেন তিনি প্রথম ধৈর্য্যের বাঁধ? নিজ মাতৃপ্রীতিই কি বিকশিত হয়ে উঠেছিল তার দেশমাতৃকা-প্রীতিতে?

ঠাকুরমা বলতেন "তোদের বাবা যখন যে কাজ করতো তা সমস্ত প্রাণ দিয়েই করতো—লোক দেখানোর জন্য সে কিছু করতো না। সকলের জন্য তার বিবেচনা ছিল—শুধু ছিলনা সেটা নিজের বেলায়। পড়াশোনায় তার মনোযোগের অভাব কখনো দেখিনি কিন্তু নিজের খাওয়ার কথা তার মনে থাকতো না।" তিনি বলতেন, "একদিন সকালে চিত্ত বসে পড়া করছে, আমি সামনে দুধের বাটি রেখে চলে গেছি—অনেকক্ষণ পরে এসে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, দুধ খেয়েছিস চিত্ত? তোর বাবার যেন ধ্যান ভঙ্গ হলো, বল্ল 'দুধ'? খেয়েছি বোধহয়—"বাটিটা দেখতো মা খেয়েছি কিনা?" সে দুধ খেয়েছে কিনা বাটি দেখে সেটা আমায় বলতে হবে, এমন আত্মভোলা ছেলে আমি কখনো দেখিনি।" আত্মভোলা পিতৃদেবের আর একটি কাহিনী ন পিসিমার কাছে আমরা শুনেছি। তখন তিনি ম্যাট্রিক ক্লাশে পড়েন। বাবার সঙ্গে তাঁর ঘরে আরো দু' চারটি আত্মীয়ের ছেলে থাকতো—এরা দৈহিক গঠনে সবাই বাবার চেয়ে অনেক ক্ষুদ্র ছিলেন।

একদিন ইস্কুলে যাবার সময় তাড়াতাড়ি স্নান করে কাপড় জামা পরে খেতে বসেছেন—তাঁকে দেখে একটা হাসির রোল পড়ে গেল,—দেখা গেল তিনি তাঁর সার্টের বদলে প্রায় দু-সাইজ ছোট তাও আবার ডোরাকাটা একটি সার্ট পরে অম্লান বদনে খেতে বসেছেন—কোন অসুবিধাই যেন তাঁর হয়নি! পিসিমারা বল্লেন "দাদা এটা কি পরেছ?" তখন তাঁর খেয়াল হলো, বল্লেন "ও তাইতো এটা যে ইন্দুর সার্ট, আমার গায়ে তো এটা হয় না—ভারি ভুল হয়ে গিয়েছে" বলেই উঠে পড়লেন। পিতৃদেবের সে ডোরাকাটা সার্টপরা মূর্ত্তি কল্পনা করে আমরাও তখন খুব হেসেছিলাম।

তের চৌদ্দ বৎসর বয়স থেকেই তাঁর কাব্যানুরাগ দেখা যায়। ১৮৮৪-৮৫ সালে লেখা তাঁর অনেক কবিতা আমরা দেখেছি। বলতে গেলে আশৈশব তিনি সাহিত্য সাধনা করেছিলেন। তাঁর ইস্কুলের বন্ধু শরৎচন্দ্র রায়চৌধুরী এডভোকেট পিতৃদেবের মৃত্যুর পর আমায় বলেছিলেন "চিত্ত ছোটবেলা থেকেই কবিতা লিখতো—পকেট ভর্ত্তি করে ছোট ছোট কাগজে সে কবিতা লিখে আনতো। অঙ্কের ক্লাশ সে মোটেই পছন্দ করতো না—বসে বসে কিসব লিখতো; টিফিনের ছুটির পর বাইরে এসে আমাদের সে লেখা দেখাতো—কি সুন্দর কবিতাই সে লিখতো তখন থেকেই! আজ ভাবতে আনন্দ হয় যে আমরা এক ইস্কুলেরই ছাত্র ছিলাম।"

পিতৃদেবের কাছে তাঁর ছোটবেলার পয়সাজোড়া রসগোল্লার কথা শুনে আমাদের রসনাও সিক্ত হয়ে উঠতো। বলতেন 'তোরা তো ভারি রসোগোল্লা খাস—আমরা পয়সা জোড়া রসগোল্লা কিনতাম, টপ্‌টপাটপ্‌ মুখে দিতাম।' মাকে বলতেন 'কোথায় যে গেল সেই রসগোল্লা। এইসব রসগোল্লায় পালিশ আছে কিন্তু রস নেই।"

মা বলতেন, "রসগোল্লা ঠিক রসগোল্লাই আছে—কিন্তু ছোটবেলার সেই মুখ এখন তোমার আর নেই।"

ঠাকুরমা বলতেন, "চিত্তর ছোটবেলার একটা দুষ্টামী ছিল, সেটা হলো ছুটীর দিনে দুপুর বেলা আমবাগানে লুকিয়ে থাকা। সকলে খেতে বসেছে—চিত্ত নেই—কোথায় গেল সে? খোঁজ খোঁজ পড়ে গেল—শেষকালে আমবাগানে তাকে পাওয়া গেল। এক কোঁচড় আম, পেনসিল কাটা ছুরী নিয়ে গাছের নীচে অঘোর ঘুমাচ্ছে।" আমরা কিন্তু বিশ্বাসই করতে পারতাম না যে তিনি আমাদেরি মত কাঁচা আমের সন্ধানে বের হতেন। পিতৃদেব তাঁর ঠাকুরমাকে ভয়ানক ভালবাসতেন—কিন্তু আমরা কিছুতেই বুঝতে পারতাম না তাঁর ঠাকুমা-প্রীতির সঙ্গে তিনি কুলের অম্বলকে কেন জড়িত করেছিলেন। কুলের অম্বল কখনো তিনি খেতেন না—বলতেন, "ওটা আমি খেতে পারব না—ও দেখলেই আমি ঠাকুরমার গন্ধ পাই"। বাবার বেচারী ঠাকুরমা পৃথিবীতে এত জিনিষ থাকতে শেষকালে স্মরণীয় হয়ে রইলেন কি না কুলের অম্বলে! হাসতাম আমরা।

ইংলণ্ড যাত্রা

১৮৮৬ সালে লণ্ডন মিশনারী স্কুল থেকে বাবা ১৬ বৎসর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হলেন। সে সময় তিনি ছাত্রদের সাহিত্য সভায় বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করতেন। এই সভা উপলক্ষ করেই তাঁর প্রথম স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের ছাত্র, মুন্নিকাকা শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত আই-সি-এস মহাশয়ের সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রপাত হয় এবং পরে তা প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হয়। পরবর্ত্তী জীবনে রাজনৈতিক মতানৈক্য থাকা সত্ত্বেও তাঁদের বন্ধুত্বের বন্ধন কখনো শিথিল হয়নি। জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত তা অটুট ছিল। ছাত্রজীবনের এই সাহিত্য সভাতেই পিতৃদেবের বাগ্মিতার অঙ্কুর বিকশিত হোল।

১৮৯০ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি মুন্নিকাকার সঙ্গে 'রাভেনা' জাহাজে উচ্চ শিক্ষার্থে লণ্ডন যাত্রা করেন। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিয়ে আই-সি-এস হয়ে ফিরে আসবেন এ আশাই করেছিলেন ঠাকুরমা, দাদামণি। অদৃষ্ট দেবতা অলক্ষ্যে বসে তখন ভারতমাতার এই সুসন্তানের জীবন নদ অন্যদিকে প্রবাহিত করে দেবেন, সে কথা তখন কেউ কল্পনাও করেননি।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্তের সঙ্গে ১৮৯২ সালে পিতৃদেব সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য বসলেন, কিন্তু ২।১টি প্রশ্ন পত্রের উত্তর দিয়ে তা তাঁর মনোমত না হওয়াতে বাকি পরীক্ষা তিনি আর দেননি। মুন্নিকাকা যথাসময়ে উত্তীর্ণ হয়ে গেলেন; কিন্তু বাবা ১৮৯৩ সালে আবার ঐ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন।

লণ্ডনে এই সময় সুপ্রসিদ্ধ দাদাভাই নৌরজী পার্লামেণ্টে সভ্য নির্ব্বাচিত হবার জন্য চেষ্টা করছিলেন; এসময় পিতৃদেবের অখণ্ড অবসর, কারণ পরীক্ষা অন্তে তিনি তখন তাঁর ফলের জন্য অপেক্ষা করছিলেন; তাঁর এই প্রচুর অবসরের সদ্ব্যবহার করলেন তিনি দাদাভাই নৌরজীর নির্ব্বাচন সমর্থন কল্পে বিভিন্ন কেন্দ্রে বক্তৃতা দিয়ে। তাঁর সে আবেগময়ী বক্তৃতা সমূহ নিয়ে তখন লণ্ডনে প্রচণ্ড আন্দোলন হয়েছিল। সেই সব বক্তৃতায় তিনি ভারতবাসীর পার্লামেণ্টের সভ্য হওয়া ভারত ও ইংলণ্ডের পক্ষে কত কল্যাণকর তা বিশদভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর বাগ্মিতার, তাঁর স্বদেশ প্রেমিকতার ভূয়সী প্রশংসায় সে দেশের সংবাদপত্র উচ্ছসিত হয়ে উঠেছিল। দাদাভাই নৌরজী নির্ব্বাচনে জয়লাভ করলেন।

দাদাভাই নৌরজী জয়ী হলেন, কিন্তু আই-সি-এস পরীক্ষার ফল বের হলে দেখা গেল, পিতৃদেব পাশ করতে পারেননি। তাঁর এই অকৃতকার্য্যতার জন্য দাদাভাই নৌবজীর নির্ব্বাচন বক্তৃতাই কারণ, না গণিত শাস্ত্র তাঁকে ডুবিয়েছিল, তা আমরা জানিনা। এ বিষয়ে তিনি আমাদের কখনো কিছু বলেন নি। শুধু মনে আছে, আমার যখন ৯।১০ বৎসর বয়স তখন ইস্কুলের বাৎসরিক পরীক্ষায়, অঙ্কে খুব খারাপ করেছিলাম; সে জন্য আমি কাঁদছিলাম। পিতৃদেব সে ঘরে এলেন, বল্লেন, 'কিরে! তুই কাঁদছিস কেন? আমি কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বললাম্ "আমার মাথায় গোবর ভরা, অঙ্কে আমি কিছু পারিনা, এবার কখনো আমি পাশ করবনা।" বাবা স্নেহাদরে আমাকে জড়িয়ে ধরে বল্লেন "আরে বোকা মেয়ে! এর জন্য এত কান্না? আরে আমিও তো আই, সি, এস এ অঙ্কে রসগোল্লা খেয়েছি—তাতে হয়েছে কি"? তিনি রসগোল্লা সত্যই খেয়েছিলেন কিনা জানিনা, তবে তাঁর এই কথায় আমার কান্না কিন্তু

থেমে গেল, ভাবলাম "তাইতো তাঁর মত লোকই যখন অঙ্কে পারেননি, আমিতো কোন ছাড়! বয়ে গেছে অঙ্ক যদি না পেরে থাকি"। এই কথা তিনি আমার কান্না থামাতেই বলেছিলেন কিনা, আজও তা জানিনা। আই, সি, এস পাশ না করাতে ঠাকুরমা, দাদামণি ও আত্মীয় পরিজন সকলেই ক্ষুণ্ন হয়েছিলেন, সন্দেহ নেই, কিন্তু পরবর্ত্তী জীবনে নিশ্চয়ই তাঁরা ভগবানকে কোটি কোটি প্রণাম জানিয়েছিলেন পুত্রের এই অকৃতকার্য্যতার জন্য। আমরা ভাই বোনেরা পিতৃদেবকে বলতাম "ভাগ্যিস্ তুমি আই, সি, এস হওনি, তাহলে কি দুর্দ্দশাই না হোত আমাদের"! তিনি হেসে বল্লেন, "কেন? তখন তোদের,

"বলতে হবে কইতে হবে ইংরাজী ভাষায়
পিয়ানো বাজাতে হবে ফিরিঙ্গি প্রথায়।

এই নীতি অনুসরণ করতে হোত"—মনে মনে নিজেদের তখনকার আই, সি, এস, ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের পুত্রকন্যারূপে কল্পনা করে কত হাসির তরঙ্গই না তুলতাম আমরা। যাক্, বাবা ফেল করে আমাদের কিন্তু খুবই বাঁচিয়ে দিলেন।

আই, সি, এস পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হয়ে পিতৃদেব ব্যারিষ্টার হতে মনস্থির করলেন। তখন কিন্তু 'হারিয়ে তাড়িয়ে কাশ্যপ গোত্রের' মত ছিল ব্যারিষ্টারী পরীক্ষা। যে যে পথই স্থির করে লণ্ডন যাক না কেন, তাতে অকৃতকার্য্য হলেই তারা ব্যারিষ্টারী পড়তো। বাবাও তাই করলেন, হয়তো তাঁর এই সংকল্পের সহায়ক ছিলেন শ্রীঅরবিন্দের ভাগ্যদেবতা, তাঁর স্নেহাশীর্ব্বাদই হয়তো এপথে চালনা করেছিল।

১৮৯২ সালে লণ্ডনে আইন অধ্যয়ন কালে জেমস ম্যাকলীন নামে বৃটিশ পার্লামেণ্টের একজন সভ্য ভারতের হিন্দু মুসলমানদের

দাসজাতি বলে অভিহিত করেন। ভারতের এই অপমানে মনেপ্রাণে পূর্ণ ভারতীয় পিতৃদেবের সহ্যের সীমা অতিক্রম করে গেল। বিদেশী পোষাক পরলে বা ঐ ভাষায় দখল থাকলেই তো অন্তর বিদেশী হয়ে যায় না। অন্ততঃ পিতৃদেবের অন্তরে বিদেশীকতার ছোঁয়াচ কখনো লাগেনি—তাই ভারতবাসীর প্রতি অপমানজনক উক্তিতে তাঁর অন্তর ব্যথিত হয়ে উঠল। তাঁর স্বদেশপ্রীতি অনলবর্ষী ভাষায় গর্জ্জন করে উঠল জেমস ম্যাকনীলের এই অশিষ্ট অভদ্রোচিত উক্তির প্রতিবাদে। এই নিয়ে লণ্ডনে তুমুল আন্দোলন পরে গেল। তারই প্রতিক্রিয়াতে এর কিছুদিন পরেই উদারনৈতিক দল, গ্ল্যাডষ্টোনের সভাপতিত্বে ওল্ডহ্যামে এক বিপুল সভা আহ্বান করলেন। সেই সভায় নিমন্ত্রিত হয়ে পিতৃদেব জেমস ম্যাকলীনের এই অসঙ্গত উক্তির প্রত্যাহার দাবী করলেন। সেই তুমুল প্রতিবাদের ফলেই ম্যাকলীনকে সাধারণের সামনে তাঁর অন্যায় উক্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয়েছিল, এবং তা করা সত্ত্বেও তাঁর এই অশিষ্ট উক্তির জন্য পার্লামেণ্টের সভ্যপদও তিনি হারালেন। এই ঘটনাতে আমরা মানুষ চিত্তরঞ্জনের স্বদেশ প্রেমিকতা ও তেজস্বিতার পূর্ব্বাভাষ পাই।

পিতৃদেব মিডল্ টেম্পল্ থেকে ব্যারিষ্টার হয়ে ১৮৯৪ সালে দেশে ফিরে আসেন এবং কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করেন।

স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন ও বিবাহ

১৮৯৪ সালে ব্যারিষ্টার হয়ে এসে তিনি তাঁর পিতৃঋণের কথা ভোলেননি। কবে পিতার ঋণ শোধ করতে পারবেন, এই ছিল তাঁর অন্তরেব কামনা। একমনা হয়েই তিনি ব্যবহারজীবীর পথে অগ্রসর হলেন। দাদামণির ঋণজর্জ্জরিত সংসারে তখন অসচ্ছলতার সীমা ছিলনা। এই দুরূহ বোঝার অংশীদার হয়ে বাবা আইনজীবন আরম্ভ করলেন। সাংসারিক অসচ্ছলতার জন্য স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসুর সহায়তায় পিতৃদেব সিটি কলেজে ল-লেকচারারের পদ গ্রহণ করেছিলেন। ঠাকুরমার কাছে শুনেছি সংসারের দুঃখকষ্ট অনুভব করে, দুটি পয়সাও বাঁচাবার জন্য পিতৃদেব কতদিন হাইকোর্ট থেকে হেঁটে বাড়ী আসতেন। এমনকি দুপুরে জলযোগ পর্য্যন্ত করতেন না। কিন্তু এত কষ্টেও তাঁর সদাপ্রসন্ন আনন কথনো ম্লান হোতনা। পিতার ঋণভারপীড়িত মুখ দেখে তিনি নিজের দৈহিক কষ্টকেও গ্রাহ্য করতেন না। হাইকোর্টে তাঁকে তখন প্রবল প্রতিযোগীতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। রায়পুরের ভূতপূর্ব্ব লর্ড এস, পি, সিংহ, স্যার বি, সি, মিত্র, ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী ও অন্যান্য বহু স্বদেশী ও বিদেশী লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিষ্টারের সঙ্গে পিতৃ-ঋণভারজর্জ্জরিত, অর্থহীন পিতৃদেবের কম প্রতিযোগীতা করতে হয়নি। অর্থাগমের দিকেই তখন তাঁর পূর্ণ লক্ষ্য। কতদিনে তিনি তাঁর পিতাকে এ ঋণভার থেকে মুক্ত করতে পারবেন এই ছিল তাঁর ধ্যান ও ধারণা। এই অর্থের জন্যই তিনি স্থায়ীভাবে হাইকোর্টে প্র্যাক্‌টিশ্‌ করতে পারেননি। সামান্য টাকার জন্যও তাঁকে মফঃস্বলে ছুটতে হোত। আমার বিয়ের পর আমার দাদাশ্বশুরের (শ্বশ্রূমাতার খুল্লতাত, ঢাকার প্রসিদ্ধ উকিল প্যারীমোহন ঘোষ) কাছে পিতৃদেবের

মফঃস্বলে যাবার কাহিনী শুনেছি। সে সময়ে তিনিও নবীন উকিল ছিলেন। তিনি একদিন ঢাকাতে হাস্‌তে হাস্‌তে আমাকে বল্লেন ;— "জান, তোমার বাবা ও আমি একবার একই মোকর্দ্দমায় ছিলাম, একান্ন টাকার ব্যারিষ্টার আর পনের টাকার উকিল! কিন্তু তাহলে কি হয়? আমরা ছুজনে মিলে প্রতিপক্ষের মহারথী আইনবিদদেরও হারিয়ে দিলাম" এই বলে' তিনি জয়ের গর্ব্বে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। আমার কিন্তু বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হচ্ছিল না, যে পিতা মফঃস্বল থেকে ট্রাঙ্ক ভর্ত্তি টাকা এনে আমাদের যার মুঠিতে যত ধরে তুলে নিতে বলতেন! তিনিই নাকি মাত্র একান্ন টাকার জন্য মফঃস্বল যেতেন?

আর্থিক অসচ্ছলতা তদুপরি দাদামণির ঋণ, এসবের জন্য কি ছুঃখ ও অশান্তিকর পরিবেশের মধ্যে দিন যাপন করতে হয়েছিল পিতৃদেবকে, কি তীব্র প্রতিযোগীতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, সে সব কথা গল্পের মতই শুনতাম। সম্পদের কোলে বসে সে কথা ভাবতেও পারতাম না। এই রকমে ছুই হাতে দিন ঠেলে আইন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করবার জন্য তিনি সমস্ত প্রাণ ঢেলে দিলেন। "মন্ত্রের সাধন, কিম্বা শরীর পতন" বোধহয় একেই বলে। যখনি যে কাজ তিনি করতেন 'ষোল আনা' করবার লক্ষ্য ছিল তাঁর। আইন ব্যবসায়েও যেমন 'ষোল আনা'ই করেছিলেন, তেমনি দেশ মাতৃকার সেবায় তাঁর তনু, মন, ধন 'ষোল আনা'ই দিলেন। মানুষ চিত্তরঞ্জনের এই ছিল বৈশিষ্ট্য।

রবীন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকোর খামখেয়ালী ক্লাবের সভ্য তিনি এসময়ই হয়েছিলেন এবং সেখানেই ক্লাবের সাহিত্য-বাসরে নাটোরের স্বর্গীয় মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ রায়কে আজীবন প্রকৃত বন্ধুরূপে তিনি পান। এমন অকৃত্রিম বন্ধুপ্রীতি সংসারে সত্যই বিরল। সাহিত্যের

মধ্যদিয়েই তাঁদের পরিচয়ের সূত্রপাত। নাটোরের বর্ত্তমান কর্ত্তৃ-মহারাণী আমাদের রাণী পিসিমা ঠাকুরমাকে মাতৃসম্বোধন করে' সে প্রীতির বন্ধন আরও দৃঢ় করেন। সেই থেকে পিতৃদেব হলেন তাঁর 'দাদা'। তাঁর পুত্র মুনুদা মহারাজ যোগীন্দ্র নাথ রায় ও কন্যা বিতাদি' কে (এডভোকেট যতীন্দ্রনাথ লাহিড়ীর পত্নী) আমরা নিজের পিসতুতো ভাই ও বোন জ্ঞানেই দেখতাম। আজ পর্য্যন্তও এই দুই পরিবার স্নেহপ্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ রয়েছে যার গোড়াপত্তন করেছিলেন স্বর্গীয় মহারাজা ও পিতৃদেব।

১৮৯৭ সালে বিক্রমপুরের নওগাঁ নিবাসী বিজনী এষ্টেটের দেওয়ান ৺বরদানাথ হালদার (মুখোপাধ্যায়) তাঁর স্নেহের জ্যেষ্ঠাকন্যা বাসন্তীর জন্য ঋণভারজর্জ্জরিত, অসচ্ছল সংসারের নবীন ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জনকেই কন্যাদান করবার বাসনা নিয়ে এলেন পিতা ভুবনমোহনের নিকট। দুজনেই ব্রাহ্মসমাজের অগ্রণী ছিলেন; সেই সূত্রেই দাদামশাই বরদানাথ ও দাদামণি ভুবনমোহন এই দুই পরিবারের মধ্যে যথেষ্ট প্রীতির সম্পর্ক আগে থেকেই ছিল; তাই বরদানাথের কন্যার সঙ্গে নিজপুত্রের বিবাহের উল্লেখে দাদামণি অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। দাদামশাই শুধু ব্রাহ্মসমাজের অগ্রণী ছিলেন বল্লেই যথেষ্ট বলা হবে না, ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

এই বরদানাথ তাঁদের গ্রামের এবং দূর সম্পর্কের আত্মীয়া কুলীনকন্যা বিধুমুখী দেবীকে কি ভাবে ৫০।৬০টি পত্নী-পরিবৃত এক গঙ্গাপথযাত্রী বৃদ্ধ কুলীন পাত্রের কবল থেকে উদ্ধার করেছিলেন, তা শুধু ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসেই নয়, আইনের পুস্তকেও তা বিধুমুখী হরণ মামলা বলে লিপিবদ্ধ হয়ে রয়েছে।

বাইশ বৎসরের যুবকের পক্ষে একজন সপ্তদশী কন্যার এইরূপ

বিবাহ-বলিদানে প্রতিবন্ধক হওয়া তখনকার হিন্দুসমাজে একরকম অসম্ভবই ছিল। এতে তাঁর তেজস্বিতা ও দৃঢ় চরিত্রবল আমরা দেখতে পাই। আজকালকার দিনে প্রেমে পড়ে অনেকে এরকম দুঃসাহস হয়তো দেখাতে সমর্থ হবেন, কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে জড়িত না থেকেও নিঃস্বার্থ হয়ে সমাজের যূপকাষ্ঠ থেকে একজন অসহায়া কুমারীকে রক্ষা করবার জন্য নিজের জীবন বিপন্ন করে' বিপদের সম্মুখীন হতে ক'জনকে দেখা যায়?

বিধুমুখীকে তাঁর আত্মীয়-পরিজন-বেষ্টিত পুরী থেকে বিবাহের আগের দিন উদ্ধার করতে বরদানাথ তাঁর খুল্লতাত ভগিনী সৌদামিনী দেবীর সাহায্য বিশেষ ভাবে পেয়েছিলেন, একথা আমি শুনেছি তাঁরই পুত্র আমাদের কালুমামা, আলীপুরের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের নিকট।

একদিকে দাদামশাই যেমন তাঁর এই কার্য্যের সহায়ক রূপে পেলেন তাঁর খুল্লতাত ভগিনীকে, অন্যদিকে আবার রক্ষণশীল ব্রাহ্ম সমাজের মুখপাত্র তাঁরই খুল্লতাত, এবং সৌদামিনী দেবীরই পিতা শ্রীনাথ হালদার বিধুমুখীকে নিয়ে আসবার জন্য বরদানাথকে ধরা থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার সংকল্প গ্রহণ করলেন। তাঁর সেই সংকল্পের উজ্জ্বল প্রতীক, চিরদিনের জন্য দাদামশাইয়ের মাথায় অঙ্কিত হয়ে রইল। ঢাকা রমনার মাঠে এমন ভাবেই তাঁর মাথায় লাঠি পরেছিল, জীবনে আর দাদামশাইকে চিরুণী দিয়ে সিঁথী কাটবার হাঙ্গামা পোহাতে হয় নি।

বিধুমুখীকে নিয়ে তিনি বরিশালে দুর্গামোহনের বাড়ীতে রেখে এলেন। ব্রাহ্মসমাজের সহায়তায় ব্রাহ্মযুবক রজনীনাথ রায়ের (ইনি পরবর্ত্তীকালে ভারতের একাউন্টেণ্ট জেনারেল হয়েছিলেন) সঙ্গে

কুলীন কন্যা বিধুমুখী দেবী পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হলেন। তাঁদেরই তৃতীয়া কন্যা বেলা দেবীর সঙ্গে দাদামশাই তাঁর একমাত্র পুত্র মামা সুরেন্দ্রনাথের বিবাহ দেন।

দাদামশাইয়ের কন্যাদানের সংকল্প যখন ব্রাহ্ম সমাজ জানতে পারল, তখন তুমুল কলরব পরে গেল। "বরদানাথ কি পাগল?" বল্লেন তাঁরা। "যাদের ঘরে খাবার সংস্থান নেই, যে ছেলে 'ঈশ্বরের বিদ্রোহী', 'নাস্তিক', 'মাতাল', তার হাতে কিনা পরবে ধনীকন্যা সোনার পুতলি বাসন্তী? এ কিছুতেই হবে না, হতে পারে না, অসম্ভব।" এই রায় দিলেন ব্রাহ্মসমাজ। বাবা 'ঈশ্বর বিদ্রোহী ও মাতাল' আখ্যা এই সমাজ থেকে পেয়েছিলেন, তাঁর 'মালঞ্চে' প্রকাশিত 'ঈশ্বর' ও 'বারবিলাসিনী' কবিতার জন্য। হয়তো দাদামণির পূর্ব্ব আর্থিক সচ্ছলতা থাকলে তাঁদের এ রায় উল্টে গিয়ে, 'মালঞ্চের' ঐ কবিতা দুটো সত্তেও 'সোনার ছেলে' আখ্যা পাওয়া পিতৃদেবের পক্ষে বিচিত্র হতো না।

মা বলতেন, "যখন তোদের বাবার সঙ্গে বিয়ে ঠিক হোল, তখন সত্যি প্রথমে আমার খুব ভয় হয়েছিল। ভেবেছিলাম কি জানি এই 'নাস্তিক' 'মাতালের' হাতে পরে না জানি আমার কি দুর্দ্দশাই হবে। কিন্তু মনে এ বিশ্বাসও ছিল যে আমার বাবা মানুষ চিনবার ক্ষমতা রাখেন এবং সে পূর্ণ বিশ্বাস তাঁর প্রতি ছিল বলেই আমি আপত্তি করিনি"। তিনি আরো বলতেন যে বিয়ের কথাবার্ত্তা ঠিক হয়ে গেলে দাদমশাই মাকে বলেছিলেন,—"বাসন্তী, তোকে যার হাতে দিচ্ছি, একদিন দেখবি ভারতের একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত তার নাম ধ্বনিত হবে, হয়তো আমি তখন থাকবো না, কিন্তু তুই এটা নিশ্চয়ই দেখবি।" ভবিষ্যতদ্রষ্টা ছিলেন কি তিনি?

অশ্রুসজল নয়নে মা বলতেন "দেবতুল্য আমার বাবার সে ভবিষ্যত বাণী তো মিথ্যে হয়নি।"

ব্রাহ্মসমাজ যখন দেখলেন দাদামশাই তাঁর সংকল্পে অটল তখন তাঁরা বল্লেন "বেশ, চিত্তরঞ্জনকে শুধু একটি কথা লিখে দিতে বল যে সে ঈশ্বর বিশ্বাস করে।" পিতৃদেব এ গল্প যে আমাদের কাছে কত ব্যঙ্গভরে বলতেন, শুনেত আমরাও হেসে লুটোপুটি হতাম। তিনি বলতেন 'কি করব ? তোদের মার জন্যই তো আমাকে বোকা সেজে ঐসব অর্থহীন কথা লিখতে হোল।" মা বলতেন "কেন ? না লিখলেই তো পারতে।" প্রতি-উত্তরে তিনি বলতেন, "আহা ! তাতে তোমার কত কষ্ট হোত, আই, সি, এস এর স্ত্রী হয়ে ডিয়ার, ডারলিং— বলতে বলতে দম বন্ধ হয়ে যেত। বাবার সঙ্গে বিয়ে হবার ঠিক আগেই নাকি কোন্ অশুভক্ষণে একজন আই, সি, এস মাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। মাকে রাগাবার জন্য পিতৃদেব প্রায়ই এই আই, সি, এস এর উল্লেখ করে' কৌতুক করতেন। মা এসব শুনে' ভয়ানক রেগে যেতেন, আর আমরা পুত্রকন্যা জামাতা এই কলহ প্রাণভরে উপভোগ করতাম।

ব্রাহ্ম সমাজের রীতি অনুসারে বিয়ের আগে পিতৃদেব মাকে পনর টাকা দিয়ে একটি চূণী ও পান্নার আংটি দিয়েছিলেন। মা কতবার সে আংটি নিয়ে আমাদের রাগাবার জন্য বাবাকে খোঁচা দিতেন। বলতেন "থাক্ থাক্ তোদের বাবা হাতী দিয়েছে, ঘোড়া দিয়েছে আর বলতে হবেনা, পনর টাকার এক আংটি দিয়ে তোদের বাপ মাথা কিনেছে আর কি ? কিন্তু আমরা দেখেছি যে স্বামীর প্রথম দেওয়া ঐ পনর টাকার আংটি তিনি কত সমাদর করে যত্নে রাখতেন, পরে স্বামীর দেওয়া পাঁচ হাজার টাকার আংটিরও তত সমাদর তিনি করেননি।

১৮৯৭ সালে ৩রা ডিসেম্বর, শুক্রবার পিতৃদেবের সঙ্গে ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে মার বিবাহ হয়।

পিতৃদেবকে বিয়ের সময় বিবাহ আইন অনুসারে "আমি হিন্দু নই" একথা লিখতে হয়েছিল বলে মর্ম্মে তিনি অত্যন্ত আঘাত পেয়েছিলেন। হয়তো দাদামশাইকে কন্যা সম্প্রদানের সূচনা থেকেই সংগ্রাম করতে হয়েছিল বলে তিনি আর নিজ মতদ্বারা তাঁকে বিব্রত করতে চাননি, হয়তো তখনি দৃঢ়পণ করেছিলেন যে নিজ জীবনেই এপাপের প্রায়শ্চিত্ত তিনি করবেন; কিন্তু যা ভেবেই তিনি একাজ করে থাকুন না কেন, চরিত্রের এ দুর্ব্বলতাটুকু তাঁর সমগ্র জীবনের রূপের সঙ্গে একেবারেই খাপ খায়নি। কারণ তার জীবনে যা জেনেছি তাতে বরাবরই লক্ষ্য করেছি যে তিনি যা সত্য বলে উপলব্ধি করতেন, তা সম্পন্ন করতে কখনো পশ্চাৎপদ হননি। তবে তিনি তাঁর বিবেকের বিরুদ্ধে 'আমি হিন্দু নই' একথা কেন লিখলেন? 'ঈশ্বর বিশ্বাস করি' একথা লেখা তার মতের প্রতিকূল হয়নি। একাজ করতে তাঁর প্রাণ দুঃখে শতধা বিদীর্ণ হয়েছিল—চিরদিন এর জন্য তিনি অনুতাপ করে গিয়েছেন। "আমি হিন্দু নই" বা "ঈশ্বর বিশ্বাস করি" লিখে তিনি গুরুজনের প্রাণে যতই শান্তি দিয়ে থাকুন না কেন, আমার বিশ্বাস এখানেই তাঁর জীবনের 'ষোল আনা' থেকে এক আনা তিনি বিসর্জ্জন দিয়েছিলেন।

ব্রাহ্মসমাজের সব সর্ত্তে রাজী হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু খ্যাতনামা ব্রাহ্মগণ এবিবাহে অনুপস্থিত ছিলেন। আমার বিয়ের সময় ব্রাহ্ম-সমাজের ৺শ্রীনিশীথচন্দ্র সেন মহাশয় (ব্যারিষ্টার) হাসতে হাসতে আমাদের বলেছিলেন;—"তোমার মার বিয়ের সময়ও ব্রাহ্মসমাজের অমতে গিয়েছিলাম, তোমার বিয়েতেও তাদের অমতে এলাম।"

খ্যাতনামা ব্রাহ্মগণ তাঁদের প্রিয় বরদানাথের কন্যার এমন অপাত্রে সমর্পণ কিছুতেই দেখতে পারবেন না বলেই এলেন না। উদারনৈতিক ব্রাহ্মসমাজের একটি অংশ এই ভাবেই তাঁদের সমাজের ও মনের উদারতার পরিচয় দিলেন। অথচ পরে আমরাই দেখেছি, এঁদেরি মধ্যে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্রাহ্মকে সমাজের চাঁদার খাতা নিয়ে পিতৃদেবের শরণাপন্ন হতে। তখন কিন্তু তাঁরা বলতেন "চিত্ত, তুমি আমাদের সমাজের স্তম্ভ"। সাধে কি বাবা অর্থের প্রতি এত বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন? নিজের জীবন দিয়েই তো তিনি দেখেছিলেন যে সংসারে বেশীর ভাগ লোকের কাছে অর্থ ই ছিল মনুষ্যত্বের মাপকাঠি। চাঁদার খাতা পুষ্ট করে এই সব ব্রাহ্মেরা কিন্তু "ঈশ্বর বিদ্রোহী" "নাস্তিক" 'মাতাল' চিত্তরঞ্জনের জয়গানে দশদিক মুখরিত করে চলে যেতেন।

পুত্রকন্যা ও পুরুলিয়া

১৮৯৮ সালে আমার, ১৮৯৯ সালে ভ্রাতা চিররঞ্জন (ভোম্বল) ও ১৯০১ সালে ভগিনী কল্যাণী মুখোপাধ্যায়ের (বেবী) জন্ম হয়।

আমার জন্মের পনর দিনের মধ্যেই বড় পিসিমা বিধবা হন। দুইমাস পরেই তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা লীনা জন্মগ্রহণ করে। সে আমার চেয়ে মাত্র দুমাসের ছোট ছিল। বড় পিসিমার ছেলেমেয়েদের ও আমাদের বাল্যাবস্থা একসঙ্গেই কেটেছে। মা কখনো নিজ পুত্রকন্যার চেয়ে তাদের ভিন্ন দেখতেন না; বড় পিসিমাও তেমনি তাঁর পুত্রকন্যার সঙ্গে আমাদের কোন পার্থক্য করতেন না। রসারোডের বাড়ীতে আমরা তিন ভাইবোন, বড় পিসিমার ছেলেমেয়েরা ও পিতৃদেবের খুল্লতাত রাখাল চন্দ্র দাশ ছোরদাদুর পুত্র কাকা সুধীর রঞ্জন দাশ ও তার ভগ্নীরা মিলে কি আনন্দেই না কাটিয়েছি।

আমার যখন ৬।৭ বৎসর বয়স, সে সময় মা অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পরেছিলেন। বেবীর ও তখন খুবই শরীর খারাপ। সে সময় পিতৃবন্ধু ডাক্তার নীলরতন সরকারের (পরে স্যার) নির্দ্দেশে মাকে বায়ু পরিবর্ত্তনে পাঠাবার ব্যবস্থা হোল। এখানে ডাক্তার নীলরতন সরকারের কথা না লিখে পারছি না। তিনি আমাদের পরিবারে শুধু বিচক্ষণ চিকিৎসক রূপেই গণ্য হতেন না, পরন্তু তিনি ও তার পত্নী আমাদের পরিবারের সুখদুঃখের বন্ধুও ছিলেন। তিনি ব্রাহ্ম সমাজের একজন যথার্থ ব্রাহ্ম ছিলেন; কোন সংকীর্ণতা তার মধ্যে ছিল না। সমগ্র জীবনময় তিনি পরের মঙ্গল সাধনা করে গিয়েছেন। তিনি বলেছিলেন "জীবনযুদ্ধে নিপীড়িত মানুষকে

আরাম দেওয়াই আমাদের কাজ—মানুষকে নিয়ে ব্যবসায় করা আমাদের নীতি বিরুদ্ধ।" এই কথাতেই বুঝতে পারি কত মহান আদর্শের লোক ছিলেন তিনি।

ডাক্তার নীলরতন সরকারের আদেশানুযায়ী আমাদের পুরুলিয়া যাওয়া স্থির হোল। সেখানে আমরা প্রথম ভাড়াটে বাড়ী 'এমলাস' বাঙ্গলোতে গিয়ে উঠলাম। পরে পিতৃদেব সেখানকার একজন প্লান্টার সুবল সাহেবের ক্লার্কস বাঙ্গলো বাড়ীটি ক্রয় করেন। দাদামণি বাড়ীটির সংস্কার করে' নূতন নামাকরণ করলেন "রিট্রিট"। এখানে মার স্বাস্থ্যের জন্য আমাদের অনেক দিন থাকতে হয়েছিল। রসারোড থেকে সমগ্র পরিবারটিই উঠে পুরুলিয়া গেল। পিতৃদেব তাঁর কাজ কর্ম্মের জন্য কলিকাতায় রইলেন। কাজের মধ্যে তিনি যখনই অবসর পেতেন তখনই পুরুলিয়া চলে আসতেন।

পুরুলিয়ার বাড়ী এ সময় জম্‌জম্ করতো। আমরা দশ-বারো জন তো ছোটর সংখ্যাই ছিলাম। এছাড়া আত্মীয় অনাত্মীয় পরিচিত বা অপরিচিত সকলেরই ছুটির অবসরে বা বিনা ছুটিতেও দিন যাপনের জায়গা হয়ে উঠলো এই পুরুলিয়া।

পুরুলিয়ার বাড়ীতে প্রায় ২০।২১ বিঘা জমি। দাদামণি তাতে কি চমৎকার বাগানই না করেছিলেন। ইউক্যালিপটাস, কর্পূর, লবঙ্গ, এলাচি, আবার ওক, মেহাগিনি, শাল, কোন গাছ লাগাতেই তিনি বাকি রাখেননি। সুদূর মিশর থেকে তিনি পান্থপাদপ গাছ আনিয়েছিলেন। মরুভূমির দেশের এ গাছ একটু খোঁচালেই পরিষ্কার জল বের হোত। এই বাগান করতে, চিঠিপত্র দিতে এবং ক্যাটালগ্ আনতে দাদামণি পৃথিবীর কোন জায়গা বোধহয় বাকি রাখেননি। বাবা তাঁর পিতার এ খেয়াল চরিতার্থ করতে খুবই তৃপ্ত হতেন। সুন্দর ছিল দাদমণির রুচি। পিতৃদেব তাঁর শিল্পীমন পেয়েছিলেন

হয়তো দাদামণির থেকেই। যখন বাড়ীর সামনে গোল চত্বর ঘিরে চারদিকে নানা বর্ণের গোলাপ ফুটে উঠতো, তখন দাদামণির শিল্পীমন ডুবে যেত এ অপূর্ব্ব শোভায়। শুধু গোলাপই নয়, কত রকমের ফুল তাদের, বর্ণে, রূপে ও গন্ধে সমস্ত বাড়ী আমোদিত করে' যেন দাদামণির অক্লান্ত শ্রমেরই পুরস্কার দিত। ফুলের সঙ্গে যদি কেউ কথা বলে' থাকে তবে তাদের মধ্যে দাদামণি নিশ্চয়ই একজন—প্রতিটি গাছ তাঁর স্পর্শ পেয়ে সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছিল। শুধুই কি ফুলের বাগান? তাঁর ফল ও তরকারির বাগানও দেখবার মতই ছিল। পিতৃদেব যখনই পুরুলিয়া আসতেন এ বাগানে ঘুরে বেড়াতে তাঁর আনন্দের সীমা থাকতো না।

পুরুলিয়ার ফল ও ফুলের বাগান নিয়ে ঠাকুরমা ও দাদামণির কলহ লেগেই থাকতো। তরকারি বাগান দাদামণি সব করে দিলেও সেটা ছিল ঠাকুরমার সম্পত্তি, আর ঠাকুরমার নির্দ্দেশে ফুলের বাগান হোল দাদামণির এলাকা। এই বাগান নিয়ে দুজনের বচসা হলেই, ঠাকুরমা দাদামণিকে এইবলে' শাসাতেন; "আসুক চিত্ত, এর একটা বিহিত করতে হবে"। দাদামণির অপরাধ তিনি তুলবার উপযোগী তরকারি হলেই তা তুলতেন। এরকম একদিন তিনি ঠাকুরমার বেগুন ক্ষেত থেকে একটি কাশীর বেগুন তুলেছিলেন। এই অনধিকার প্রবেশে ঠাকুরমা ভয়ানক রেগে গেলেন! সেখানেই ক্ষান্ত হলেন না, দাদামণির বড় বড় গোলাপ তুলে নিয়েও শাসালেন, 'আসুক চিত্ত'। ভাল করেই হয়তো তিনি জানতেন যে তাঁর চিত্ত মাকে অপ্রস্তুত করবেন না। হোলও তাই! দিন দুই পর পিতৃদেব যখন এলেন, ঠাকুরমা সমস্ত ঘটনা জানিয়ে বল্লেন "তুই-ই বল চিত্ত, এটা অন্যায় কিনা?" সব শুনে, বাবা ঠাকুরমাকে মিষ্টি করে বল্লেন, "বেগুন তুলাই হয়তো বাবার উদ্দেশ্য ছিলনা, কিন্তু যে বেগুনটি তিনি তুলেছিলেন সেটা

না তুললে নিশ্চয় পোকা কি ইঁদুর নষ্ট করে ফেলত, আমাদের কারও খাওয়া হোতনা, তখন তোমার কিরকম কষ্ট হোত মা? এই প্রকাণ্ড বেগুন কি আর তোমার গাছে থাকতে পেতো?" তারপর বল্লেন, "তুমি আজ ঐ বেগুন ভাজা কর মা, লুচি দিয়ে খেতে খুব ভাল লাগবে।" ছেলে বেগুন ভাজা খেতে চাইবার সঙ্গে সঙ্গেই ঠাকুরমার রাগ জল হয়ে গেল। ঠাকুরমার রাগের চোটে দুদিন পর্য্যন্ত যে বেগুন ভাঁড়ার ঘরে গড়াগড়ি যাচ্ছিল, পিতৃদেবের কথায় সেই বেগুন নিয়েই তিনি মহানন্দে ভাজতে বসে গেলেন। তাঁর 'চিত্তর' কথার উপর আর কোন কথা কখনো স্থান পায়নি। বাবার সব বিধানই তিনি সানন্দে মেনে নিতেন। মাতৃগতপ্রাণ পুত্রও জননীকে "স্বর্গাদপি গরীয়সী" জ্ঞান করতেন।

পুরুলিয়াতে মা ও বেবীর দুজনেরই শরীর বেশ সুস্থ হয়ে উঠল। এই পুরুলিয়া—কলিকাতা, আবার কলিকাতা—পুরুলিয়া আমরা নিয়মিত গিয়েছি ১৯১৩ সাল পর্য্যন্ত। এই বৎসরেই ঠাকুরমার মৃত্যু হওয়াতে, পুরুলিয়ার আকর্ষণ আমাদের আর তেমন ছিলনা। অবশ্য পূজায় হাইকোর্টের ছুটি হলে প্রায় প্রতিবৎসরই আমরা তিন ভাই বোন ও মা, বাবার সঙ্গে পাহাড়ে যেতাম।

১৯০৫ সালে আমাদের কাকা প্রফুল্লরঞ্জন বিলেতে এক ইংরাজ মহিলার পাণিগ্রহণ করেন। তিনি কিন্তু এই ইংরাজ স্ত্রীকে আগেই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। হয়তো বৌ সঙ্গে করে আসবার সাহসের অভাব হয়েছিল তাঁর। বৌকে দেশে পাঠাবার আগে "বৌ যাচ্ছে" এই বাংলা কথাটি ইংরাজী অক্ষরে লিখে তিনি তার করলেন কলিকাতায় হাইকোর্টে তাঁর দাদার কাছে। পুরুলিয়াতে দাদামণি পিতৃদেবের তার পেয়ে কলিকাতা এলেন, নববধূকে পুরুলিয়া নিয়ে যাবার জন্য।

সেদিনটি আমার বেশ মনে আছে, যেদিন দাদামণি ইংরাজ খুড়ীমাকে নিয়ে পুরুলিয়া এলেন। সঙ্গে ছোরদাতুও ছিলেন।

আমরা সব ভাইবোনেরা আগের দিন থেকেই খুব উত্তেজিত হয়েছিলাম। ইংরাজ খুড়ীমা কেমন হবেন, নানা জল্পনা কল্পনা চলতে লাগলো আমাদের ছোটদের বৈঠকে। পরদিন ভোরে উঠে আমরা সব খুড়ীমাকে অভ্যর্থনা করবার জন্য প্রস্তুত। খুড়ীমা আসতেই তাঁকে বেনারসী শাড়ীতে সাজিয়ে পায়ে আলতা দেওয়া হোল, তিনি কিন্তু হাসিমুখে নির্ব্বিবাদে এসব অত্যাচার সহ্য করে গেলেন। ঠাকুরমা তাকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে বল্লেন "তুমি আমার পিরফুল্লের বৌ" এই বলে তাঁর হাতে বাঙ্গালী বধূর সৌভাগ্যচিহ্ন লোহা পরিয়ে দিলেন—সিঁথিতে দিলেন সিন্দুর। শাশুড়ীর দেওয়া এই লোহা আমরণ খুড়ীমার হাতে ছিল। কখনো তা তিনি ফেলেন নি। বড়দের দেবার পালা শেষ হলে, আমরা ছোটরা সবাই মিলে রাশীকৃত ছোট ছোট সেণ্টের শিশি (হয়তো সেগুলো স্যাম্পেলেরই ছিল) দিয়ে খুড়ীমার আয়না টেবিল ভরে দিলাম। দাদা (শুধাংশু গুপ্ত) আমাদের নেতা, এসব জোগাড় করে এনে বলেছিলেন, "এই দেওয়াই ভালো, ইংরাজরা খুব সেণ্ট মাখতে ভালবাসে।" খুড়ীমা হেসে আমাদের সবাইকে খুব আদর করলেন। তাঁর জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত আমরা তাঁর সে আদর থেকে বঞ্চিত হইনি। তখন ছোট ছিলাম, বুঝিনি তো কিছু! পরে ভাবতাম একজন বিদেশিনীর পক্ষে, নিজ পিতামাতা, স্বদেশ, স্বজন সমাজ সব ছেড়ে শুধু একজনের জন্য একেবারে ভিন্ন পরিবেশে চলে আসা কি মুখের কথা? এই বিয়ের জন্য খুড়ীমার জীবনে আর পিত্রালয়ে যাওয়া হয়নি—ইংলণ্ডে তিনি প্রায় প্রতি বৎসর যেতেন সত্য কিন্তু তাঁর পিতৃকুল তাঁকে আর গ্রহণ করেনি। আমার ঠাকুরমা বুঝেছিলেন

তা, তাই আমার মাকে তিনি বলেছিলেন "বৌ! ডোরথী যদি অন্যায়ও করে, তুমি ওকে ক্ষমা করে যেও, ও আমার ছেলের জন্য নিজের সব ছেড়ে এসেছে।" ঠাকুরমার একথা আমার মা কোনদিন অবহেলা করেন নি। সংসারের অসচ্ছলতা তাঁরা যথা-সম্ভব খুড়ীমাকে কোনদিন অনুভব করতে দিতেন না। সবচেয়ে আশ্চর্য্যের কথা, এই ইংরাজ বৌ আর তাঁর একেবারে 'বাঙ্গাল' শাশুড়ী একে অন্যের ভাষা না জেনেও কিন্তু দুজনেই দুজনের সব কথাই বুঝতেন।

পুরুলিয়ার কথা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি আমাদের কাঙ্কুর (৺কালী নারায়ণ ভট্টাচার্য্য), কথা না বলি। আমাদের কালীপদ দা, (৺কালীপদ উকিল), যেমন কলিকাতার বাড়ীর হিসাবপত্র রাখা, বাজার করা সব করতেন, তেমনি কাঙ্কু আমাদের পুরুলিয়ার বাড়ীর সব করতেন। বেতনভুক্ হলেও এদুজনই আমাদের পরিবারেরই একজন হয়েছিলেন। কাঙ্কুকে ঠাকুরমা পুত্রবৎ স্নেহ করতেন—আর কালীপদ দা ছিলেন আমার মায়ের দূর সম্পর্কের কাকা। পিতৃদেবকে কখনো দেখিনি কর্ম্মচারী বলে এঁদের অবজ্ঞা করতে। এরা ছাড়া আরও দুজন আমাদের বাড়ী কাজ করতেন। একজন ছিলেন ৺ললিতমোহন সেন আর একজন ছিলেন আমাদের দূরজ্ঞাতি ৺বিভূরঞ্জন দাশ। ৺ললিত বাবু কলিকাতায় বাবার আইনের লাইব্রেরী দেখতেন, আর বিভূদা ছিলেন বাবার কোর্টের ক্লার্ক।

পুরুলিয়ায় আমাদের প্রাত্যহিক সান্ধ্য সম্মিলনে কাঙ্কুও থাকতেন। প্রতি সন্ধ্যায় ঠাকুরমাকে তিনি রামপ্রসাদী দেহতত্ত্বের পুরাণ গান শুনাতেন। একটি গান ঠাকুরমা শুনতে খুব ভালবাসতেন। কাঙ্কু গাইতেন, "তাই থাকতে সময়, দীনদয়াময়, আর্জ্জী করে রাখি;

শেষে হয় কি না হয়, মনে উদয়, পাছে পরি ফ াঁকি"। ঠাকুরমা তাঁর মৃত্যুর আগের দিন পর্য্যন্ত কাঙ্কুর কাছে এ গান শুনেছেন। তাই এই গানটি বাবার বড় প্রিয় ছিল। প্রায়ই তিনি এ গানটি শুনতে চাইতেন।

এই কাঙ্কু ও ললিতবাবু ঠাকুরমা ও দাদামণির অন্তিম সময়ে যে সেবা করেছিলেন, পিতৃদেব তা কখনো ভোলেননি। এঁদের বলেছিলেন "তোমরা বাবা মার জন্য যে সেবা করেছ সন্তান হয়েও আমি তা পারিনি।" ঠাকুরমা দাদামণিকে ওঁরা মাতৃপিতৃবৎ দেখতেন বলেই বাবাও তাঁদের সঙ্গে ভ্রাতৃবৎ আচরণই করতেন— কোনদিন এঁরা মনে করতে পারেননি যে পিতৃদেবের বেতনভুক্ তাঁরা। পারিবারিক সান্ধ্যবাসরে এঁরাও উপস্থিত থাকতেন। আমরা বহুদিন পর্য্যন্ত জানতাম না যে কাঙ্কু, ললিতবাবু ও কালীপদ দার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নেই। আমাদের পরিবারভুক্ত বলেই মনে করতাম তাঁদের।

আমাদের বাড়ী ইঙ্গবঙ্গ সমাজের শুধু নয়, সর্ব্বজাতির, সর্ব্ব-ধর্ম্মের এক অপূর্ব্ব সংমিশ্রনের কেন্দ্রস্থল ছিল। মন্দির, মসজিদ, গীর্জ্জার তারতম্য করতে আমরা কখনো শিখিনি। খৃষ্ট, মহম্মদ, বুদ্ধ, কৃষ্ণ, চৈতন্য সকলেই আমাদের নমস্য, এই জানতাম। আগেই বলেছি—দাদামণি বলতেন "কোন ধর্ম্মকেই ছোট করে দেখা সবচেয়ে বড় অধর্ম্ম ও অপরাধ।" এই ছিল আমাদের বাড়ীর শিক্ষা।

পুরুলিয়ার বাড়ীর সে দৃশ্য আজও যেন চোখের সামনে দেখতে পাই। বাগানের সামনের বারান্দায় একদিকে দাদামণির তক্তপোষ, পুরু গদি ও তাকিয়ায় সজ্জিত, সামনেই তাঁর লিখবার টেবিল, রাশি রাশি শাস্ত্র, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত ও ইংরাজী বইয়ে ভর্ত্তি।

এই সব বইয়ের মধ্যে আমার পরিচিত ছিল রামায়ণ আর মহাভারত। অক্ষর পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে রামায়ণ ও মহাভারত মা আমাদের রোজ পড়তে বাধ্য করেছিলেন। শুধু কি পড়া! একটি বিশিষ্ট স্বরে স্বর করে দুলে দুলে আমরা পড়তাম। যাইহোক দাদামণির টেবিলে এ বই দুটি থাকাতে আমিও তাঁর পাশে বসে পড়তাম, আর হাজার বার নানান রকমের প্রশ্ন করে' তাঁকে অস্থির করে তুলতাম। কিন্তু একদিনের জন্যও তাকে বিরক্ত হতে দেখিনি। দাদামণির এই তক্তপোষের পাশেই টুলের উপর তাঁর হুকাঁ। কল্কের মুখে একটা ছোট ঢাকনা দেওয়া থাকতো। সাপের মত প্রকাণ্ড নল তাঁর তক্তপোষ জুড়ে থাকতো। আর তামাকের সুগন্ধে সারা বাড়ী আমোদিত হতো। টেবিলের উপর আরো দুটি জিনিষ থাকতো, —চামড়ার কেসের মধ্যে বাক্সর মত একটি ঘড়ি—আর লাল সালু দিয়ে আবৃত জলের গ্লাস রাখবার একটি পাত্র। এতে গেলাসের জল ঠাণ্ডা থাকে। দাদামণি সময়মত কাজ করতে ভালবাসতেন এবং সেই জন্য তার ঘড়ি-প্রীতি এত বেশী ছিল যে আমাদের কলিকাতা আর পুরুলিয়ার বাড়ীতে প্রত্যেক ঘরে ছোট ঘড়ি তো টেবিলের উপর থাকতোই—তাছাড়া বড় দেওয়াল-ঘড়ি দিয়ে বাড়ী ভর্ত্তি করেছিলেন। তিনি বলতেন, "চিত্তর একেবারেই সময়ের জ্ঞান নেই—তাই এমন করে ঘড়ি রাখব যাতে ওর যে দিকে দৃষ্টি পড়ে ঘড়ি দেখতে পাবে।" কিন্তু এত ঘড়ি থাকা সত্ত্বেও বাবা ঘড়ি ধরে কাজটাই করতে পারতেন না।

এই বারান্দা শেষ হলেই আরম্ভ হতো অন্য জগত। সেখানে ড্রয়িং রুম, পিয়ানো, পর্দ্দা, চেয়ার টেবিল দিয়ে সাজান। ম্যাণ্টাল পিসের (চিমনীর উপরের তাকের মত) উপর টুকিটাকি জিনিষের সারি—মাঝে মাঝে পরিবারের সকলের ছবি। দেওয়ালে বড় বড়

অয়েল পেন্টিং। তার মধ্যে দেশের বিখ্যাত সব লোকদের বড় বড় ছবি। এখনকার দিনে ঐ সাজান ঘর দেখতে পেলে আমাদের ছেলেমেয়েরা নিশ্চয়ই বলবে "বাপ্‌রে, কি মিউজিয়ামেই তোমরা থাকতে?" কথাটা বল্‌লে খুব মিথ্যে বলাও হবে না। ড্রয়িং রুমের পাশেই ছিল খাবার ঘর, তাও ফিরিঙ্গি-প্রভাব-বর্জ্জিত নয়। সেখানে আমরা সকাল বিকেলের জলযোগ ও রাত্রের আহার করতাম। এই ঘরের পাশেই কাঁচ ঢাকা বারান্দা দিয়ে ২।৩টা সিড়ি নেবে শশা, ঝিঙ্গে, লাউ, কুমড়ার মাচা করা ছাতের নীচ দিয়ে যেতে যেতে দুপাশে লঙ্কা লেবু তুলতে তুলতে রান্নাবাড়ীতে আসতাম। এখানে আসনে বসে দুপুরের খাওয়া খেতে হতো।

এই রান্নাবাড়ীর দৃশ্য চিরকাল মনে আঁকা থাকবে। সকাল থেকেই কি কর্ম্ম চাঞ্চল্য সেখানে। প্রশস্ত দালানের একদিকে কাঙ্কু বাজার উজাড় করে ঢেলেছে—সামনেই আমগাছের নীচে মাছ কাটা হচ্ছে। ২।৩টি বঁটিতে মা পিসিমারা তরকারি কুটছেন, তার মধ্যেই ঠাকুরমা ঘন পুরু দুধের সরে চিনি দিয়ে মার মুখে গুঁজে দিচ্ছেন, মা সেই সব ওষুধ খাবার মত মুখ করে খাচ্ছেন, আমি দাঁড়িয়ে দেখছি আর ভাবছি "এ সরটা আমাকে দিলে কি উপভোগ করেই না খেতাম।"

ঠাকুরমা একবার পাচক ঠাকুরকে কোন তরকারি কি রকম করে রাঁধতে হবে তা বলে দিচ্ছেন, আবার সকলের মতানুযায়ী কাকে কি দিতে হবে তাও নির্দ্দেশ করছেন। আবার এরি ফাঁকে ফাঁকে মিষ্টির ঘরে গিয়ে কোনও বিশিষ্ট মিষ্টি তৈয়ারী করছেন। বাবা সবচেয়ে পছন্দ করতেন তাঁর তৈয়ারী রাবড়ী, রসগোল্লা আর পাটি-সাপ্টা পিঠা। ঠাকুরমার মিষ্টির ঘরের পাশে

ছোটপিসিমা; মেজদি, সেজদি, পাণের বোঝা নিয়ে পাণ সাজতেন। প্রত্যেক রবিবার আমরা ছোটরা রান্নাঘরে ঠাকুরমার নির্দ্দেশানুযায়ী রান্নাবাড়ার ছোটখাট কাজ করতে পেতাম। এই সুন্দর চিত্র এখন প্রায় উঠে যাবার মতই হয়েছে। কারণ আর্থিক সমস্যার চাপে এখন আমাদের মেয়েদের বাইরের কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। তবুও বাংলা ও বাঙ্গালীর একান্নভুক্ত পরিবারের এই সুন্দর সরল চিত্রটি ক্রমে ক্রমে লোপ পেলেও একেবারে মুছে ফেলবার মত নয়। যে মধুর স্নেহের সম্পর্ক এখানে গড়ে উঠতো তা অতুলনীয়।

কলিকাতা প্রত্যাগমন

পুরুলিয়ার এই আনন্দ নিকেতন থেকে ১৯০৬ সালে আমরা কলিকাতা ফিরে এলাম। এ বৎসরই বাবা দেউলিয়া হবার সব বোঝা গ্রহণ করে আদালতে দেউলিয়া নামাঙ্কিত হলেন। দেউলিয়া হয়ে কাজ করতে তাঁকে অপরিসীম পরিশ্রম করতে হয়েছিল! লোক সমাজেও তিনি হেয় হয়ে ছিলেন বইকি এ জন্য? টাকা পয়সার খবর রাখবার মত বয়স তখন আমাদের হয়নি, তবে একটু জ্ঞান হলে দেখেছি, যে মা কখনো সাজ পোষাক করতেন না; কোন অলঙ্কার পরতে বা গড়াতে তাঁকে কখনো দেখিনি। বরং আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধবের বিয়েতে তাঁকে নিজের অলঙ্কার দিয়ে দিতেই দেখেছি। অলঙ্কারের উপর তাঁর কোন আকর্ষণ ছিলনা। তিনি সর্ব্বদাই সরুপাড় সূতীর শাড়ী পরতেন। সিল্ক বেনারসী তাঁকে পরতে কখনো দেখিনি। মৃত্যুশয্যায় ঠাকুরমা মাকে চওড়া পারের শাড়ী পরতে বলেছিলেন। তাই ঠাকুরমার শ্রাদ্ধের সময় মা চওড়া লাল পাড় শাড়ী পরে বাবার সঙ্গে ঠাকুরমার কাজ করেছিলেন।

১৯১৩ সালে দেউলিয়া নাম ঘোচাবার পর মা আমাদের বলতেন, "যখন সকলে আমাকে প্রশ্নকরতো, গয়ণা পরনা কেন? সাজ পোষাক করনা কেন? তখন আমি চুপ করে থাকতাম। শ্বশুর ও স্বামী যার দেউলিয়া, সে কোন লজ্জায় গহণা, সাজ পোষাকে টাকা খরচ করবে? এজন্য আমার বাবার দেওয়া গহনাও পরতাম না।"

দেউলিয়া হয়েও পিতৃদেব সংসারের পেষণ থেকে নিষ্কৃতি পাননি বা পেতেও চাননি। পিতার ও নিজের দেউলিয়া অবস্থা-

তেই তিনি নিজের সুখ সুবিধা কষ্ট গ্রাহ্য না করেই কাকা ও কাকা-মণিকে ব্যারিষ্টার হতে বিলেত পাঠিয়েছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই মনে করতেন, তিনি যখন সবার বড় তখন পিতার এ দুঃস্থ সময়ে তাঁরই সব দায়ীত্ব গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। ভাই বোনদের শিক্ষা, তাদের বিয়ে, বিধবা অসহায়া দিদির ও পিতৃহীন পুত্রকন্যাদের লালন পালন, তাঁরই কাজ বলে তিনি মনে করতেন, এবং অহর্নিশি এরকম চিন্তাজালে জড়িত হয়ে তিনি কর্ম্মসাগরে ঝাঁপিয়ে পরলেন। পিতার এই দায়ীত্ব গ্রহণে, তাঁর সুখদুঃখের সঙ্গে জড়িত হয়ে তিনি কখনো অনুতপ্ত হননি। এই বিরাট সংসারের দায়ীত্ব সম্পূর্ণ যে তাঁর, একথা তিনি এক মূহুর্ত্তের জন্যও ভোলেননি। মাঝে মাঝে বলতেন "ঋণী আমি সকলের কাছে"! মর্ম্মভেদী তাঁর অন্তরের এই আকুল উক্তি তখন বুঝিনি, বোঝবার বয়সও ছিলনা ; আজ বয়সের সঙ্গে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করে তা বেশ বুঝতে পারছি।

সংসারের এই বিপুল দায়ীত্ব গ্রহণে পিতৃদেব আমাদের মায়ের পূর্ণ সহযোগীতা পেয়েছিলেন। মা সংসারের অবস্থা জানতেন বলেই স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে নিজের দৈহিক সুখ ও সাচ্ছন্দ্যের জন্য একটুও উদ্‌গ্রীব ছিলেন না। পিতৃদেবের শুধু সুখেরি সঙ্গিনী তিনি ছিলেন না। শ্বশুরকুলের সুখ, দুঃখ, আনন্দ ও দায়ীত্ব সব অকুণ্ঠিত চিত্তে বহন করেছিলেন স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে।

মাকে সহধর্ম্মিণীরূপে পেয়েছিলেন বলেই পিতৃদেব সংসারের প্রচণ্ড বাঁধা অতিক্রম করতে পেরেছিলেন। বাবার উপার্জ্জনেই যে সংসার চলতো, সে সংসারের কর্ত্রী হবার জন্য চেষ্টা করে সাংসারিক অশান্তির সৃষ্টি করতে মা অনায়াসেই পারতেন। কিন্তু তিনি তা কখনো চাননি বা করেনও নি। মনে পরে ১৯১৪ সালে দাদামণির

মৃত্যুর পর হাইকোর্টের ছুটি হলে মা বাবার সঙ্গে আমরা ভাইবোনেরা আর কাকা (সুধীর রঞ্জন দাশ) যখন নৈনিতাল গিয়েছিলাম তখন সেখানে একদিন সান্ধ্যবৈঠকে মার অসাক্ষাতে পিতৃদেব বল্লেন "তোদের মা কখনো নিজের জন্য কিছু চায়নি, আমাদের সংসারে তিল তিল করে ও নিজেকে বিলিয়ে দিল ; কোনদিন ওর মুখে কোন অভিযোগ শুনিনি।" মার সম্বন্ধে তাঁর এরকম উচ্ছ্বাসপূর্ণ কথা প্রায়ই তিনি আমাদের কাছে বলতেন। যতদিন ঠাকুরমা জীবিত ছিলেন, ঠাকুরমাই ছিলেন সংসারের কর্ত্রী। তাঁর মৃত্যুর পর মেজপিসিমার নির্দ্দেশেই আমাদের সংসার চলতো। কোনদিন মাকে এর জন্য অভিযোগ করতে দেখিনি ! কারো বিরুদ্ধে তাঁকে কখনো কিছু বল্‌তে আমরা কখনো শুনিনি। সবাকার অন্তরালে থেকে তাঁর কর্ত্তব্য তিনি করে যেতেন।

তাই ভাবি, আজ দেশবন্ধুকে সকলেই জানে, শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করে। কিন্তু তাঁকে দশের বন্ধু, দেশের বন্ধুরূপে সবাকার সামনে এসে দাঁড়াবার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন কে ? তিনি জননী বাসন্তীদেবী।

—(-)(ঃ)—()ঃঃ()—(ঃ)(-)—

স্বদেশী যুগ

(১৯০৫)

১৯০৫ সালে ৩রা ফেব্রুয়ারী ভারতবর্ষের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়কে গভর্ণমেণ্টের আয়ত্তাধীন করার জন্য লর্ড কার্জ্জন একটি বিল উপস্থাপিত করেন। ১১ই ফেব্রুয়ারী তা আইনে পরিণত হয়। এই সালেই ১৯শে জুলাই বাংলাদেশের অঙ্গচ্ছেদ সম্পর্কে ভারত গভর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হয়। সে সময় মার সঙ্গে আমরা পুরুলিয়াতে দাদামণি ঠাকুরমার কাছে ছিলাম। বাবা সপ্তাহান্তে কলিকাতা থেকে সেখানে যেতেন।

পূজার ছুটিতে আমরা বাবা মার সঙ্গে এবার দার্জ্জিলিংএ দাদামশাইর কাছে বেড়াতে গিয়েছিলাম। বাবা মাসীমা ও মামীমাকে নিয়ে খুব ঠাট্টা তামাসা করতেন—বিশেষ করে আট বছরের ছোট, মার একমাত্র বোন, এই মাসীমাকে (মাধুরী দেবী) বাবা অত্যন্ত ভালবাসতেন। ঠাট্টা করে বাবা তাকে "ম্যাডাম্ মাধুরী" বলতেন। কলিকাতাতেও মাসীমা আমাদের বাড়ী প্রায়ই থাকতেন—ঠাকুরমার কন্যাস্থানীয়াই ছিলেন তিনি। আমরা দেখেছি মাসীমারও যত আবদার ছিল তাঁর "চিত্তবাবুর" কাছে।

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ সম্পর্কে ভারত সরকারের বিবৃতি প্রকাশিত হলে দার্জ্জিলিংএ একটি জনসভায় পিতৃদেব ও সিষ্টার নিবেদিতা বক্তৃতা করেছিলেন। সিষ্টার নিবেদিতা, অবু পিসিমা (অবলা বসু) ও স্যার জগদীশ বসু মহাশয়ের সঙ্গে ছিলেন।

৭ই আগষ্ট কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর সভাপতিত্বে কলিকাতা টাউন হলে এক বিরাট সভা আহূত হয়। বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদের হেয় ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে শুধু পিতৃদেব নন, সমস্ত বাংলাদেশই রোষে, ক্ষোভে উত্তেজিত হয়ে উঠল। সমস্ত দেশময় তখন কি বিপুল উন্মাদনা! সুরেন্দ্রনাথ ও বিপিনচন্দ্র এই সভায় বজ্রনির্ঘোষে বল্লেন,—"বিদেশী বস্ত্র ত্যাগ কর, বিদেশ-জাত কোন দ্রব্য যেন আমাদের গৃহে প্রবেশাধিকার না পায়।" এই ডাকে বাঙ্গালী সাড়া দিল, তার এই নিদারুণ ব্যথার ভাগ সমস্ত ভারতবর্ষ গ্রহণ করে' সমবেদনা জানাল। লোকমান্য তিলক, লালা লাজপত রায়, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, মহামতি গোপালকৃষ্ণ গোখেল, ওয়াচা ও অন্যান্য প্রাদেশিক নেতৃবৃন্দ বাঙ্গালীর জাতীয় আন্দোলন সমর্থন করলেন। বাংলার অরবিন্দ ঘোষ, পিতৃদেব, বিপিনচন্দ্র পাল, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অশ্বিনীকুমার দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, মহাত্মা মতিলাল ঘোষ, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, যাত্রামোহন সেন, ব্যারিষ্টার পি, মিত্র, সরলা দেবী এবং মাতৃযজ্ঞের অন্যতম প্রধান হোতা ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় স্বদেশীমন্ত্র প্রচার আরম্ভ করলেন। বাংলার প্রথম প্রচারিত"বন্দেমাতরম্" মহামন্ত্র এই স্বদেশী আন্দোলনের সহায়ক হয়ে সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়লো। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্'কে জাতীয় মন্ত্র বলে গ্রহণ করে' ভারতবাসী গর্ব্বিত হলো।

এসময় ব্রহ্মবান্ধব তাঁর প্রকাশিত 'সন্ধ্যা' কাগজে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ জানাতে লাগলেন। "সন্ধ্যা" কাগজ যেন স্বদেশীকতার অগ্রদূত রূপে বাঙ্গালীকে সচেতন করতে এগিয়ে এল। বাঙ্গালী তার হৃতমান উদ্ধারের বাণী প্রথম শুনতে পেল এই 'সন্ধ্যা' কাগজে। বৃটিশ আমলাতন্ত্রের অবিচার, অত্যাচার, শোষণনীতির বিরুদ্ধে বরাবর

ব্রহ্মবান্ধবের অগ্নিবর্ষী লেখা বার তো হোতই ; এবার আরম্ভ করলেন তিনি বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ। এই আন্দোলনে দেশ ক্ষিপ্ত হয়ে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা আরম্ভ করল,— ব্রহ্মবান্ধব যেন দীপক রাগিণী গেয়ে দেশময় আগুন জ্বালিয়ে দিলেন। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠ'এ যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, বঙ্গভঙ্গে ব্রহ্মবান্ধব-পরিচালিত 'সন্ধ্যা' সেই রূপে আবির্ভূত হলো। দেশময় এই তুমুল আলোড়ন কালেই ২১শে আগষ্ট লর্ড কার্জ্জন পদত্যাগ করে' ১৭ই নভেম্বর স্বদেশ যাত্রা করলেন। কিন্তু বাঙ্গালীর এত চেষ্টাতেও বঙ্গভঙ্গ রোধ হলোনা। স্বদেশ যাত্রার পূর্ব্বে লর্ড কার্জ্জন তার শেষ অস্ত্র বঙ্গভঙ্গ হেনে' গেলেন বাঙ্গালীর বুকে। ভাঙ্গাবঙ্গ জোড়া লেগেছিল আরো পরে, বাঙ্গালীর সে আর এক ইতিহাস ; কিন্তু হারাতে হয়েছিল তাকে সিংভূম, মানভুম ধলভূমকে। বহু সমস্যায় জর্জ্জরিত বাঙ্গালীকে আজ তা ফিরিয়ে দিতে সর্ব্বভারতীয় নেতাদের আচরণ সত্যই বেদনাদায়ক।

এই ঘোষণার ফলে পুনরায় ২২শে সেপ্টেম্বর লালমোহন ঘোষের সভাপতিত্বে একটি বিরাট সভায় বাংলার নেতৃবর্গ জনগণকে তাদের কর্ত্তব্য স্মরণ করিয়ে দিলেন। ক্রমাগত এইরূপ প্রতিবাদ সভায় কলিকাতা বিশেষ উত্তেজিত হয়ে উঠল এবং তার ফলে ২৫শে সেপ্টেম্বর গড়ের মাঠে বিপুল প্রতিবাদ সভা পুলিশ কর্ত্তৃক বাধা প্রাপ্ত হোল। অবশেষে বাংলার জনমতকে পদদলিত করে ২৯শে সেপ্টেম্বর ব্যবস্থাপক পরিষদে বঙ্গচ্ছেদ বিল আইনবদ্ধ করে কার্জ্জন রাজবিধিরূপ অস্ত্রে বঙ্গ খণ্ডনে তাঁর কৃতিত্ব দেখালেন। দেশবাসীর অন্তরের স্বদেশপ্রেম এই কঠোর আঘাতে সুপ্ত সিংহের মতই জেগে উঠল। 'বন্দেমাতরম্' গর্জ্জনের প্রতিধ্বনিতে সমগ্র ভারত কম্পিত হলো। ৮ই অক্টোবর বিশিষ্ট বিশিষ্ট মারওয়ারী ব্যবসায়ীগণ এই মন্ত্রেই অনুপ্রাণিত হয়ে স্বদেশী গ্রহণ ও বিদেশী বর্জ্জনের আন্দোলনে তাঁদের

পূর্ণ সহানুভূতি জানিয়ে ম্যানচেষ্টারের সহিত বিদেশী সূতা ও কাপড়ের নূতন চুক্তি তাঁরা বন্ধ করে দিলেন। যে বন্দেমাতরম্ মন্ত্রে সঞ্জীবিত হয়ে ও নব প্রেরণা নিয়ে সমস্ত দেশ তার কর্ত্তব্য পথে সেদিন অগ্রসর হয়েছিল আজ সেই দেশবাসীকেই সন্তুষ্ট করবার ও রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা বজায় রাখবার জন্যই বন্দেমাতরম্ মাতৃমন্ত্রকেই খণ্ডিত করা হলো। সহস্র সহস্র দেশপ্রেমিক যে মহামন্ত্রে দেশ ও দশের সেবায় স্বেচ্ছায় জীবন বিসর্জ্জন দিয়ে গিয়েছেন, সেই মহামন্ত্রের এই দুর্দ্দশায় বাঙ্গালী নীরব দ্রষ্টা হয়েই রইল!

জাতীয়তার প্রবল তরঙ্গে তখন সমগ্র দেশ প্লাবিত; ছাত্রেরা গভর্ণমেণ্টের স্কুলকলেজে পড়বেনা বলে দলে দলে বের হয়ে এসে বিদেশী বর্জ্জন মন্ত্র গ্রহণ করে পিকেটিং আরম্ভ করে দিল। এই কাজে তাদের দৃঢ় সংকল্প এবং সাফল্যের সূচনা দেখে তদানীন্তন গভর্ণমেণ্ট সেক্রেটারী মিঃ কার্লাইল ১০ই অক্টোবর পিকেটিংএ যোগদান নিষেধাজ্ঞা ও তাঁর "এ্যান্টি স্বদেশী" ইস্তাহার জারী করে, সেই সংক্রান্ত যাবতীয় গভর্ণমেণ্টের কাগজপত্র প্রকাশিত করলেন। ১৬ই অক্টোবর স্যার ব্যামফিল্ড্ ফুলার শিলংএ তাদের নবগঠিত পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশে যুক্ত আসন স্থাপিত করলেন। এ বৎসরেই ১৬ই অক্টোবর আনন্দমোহন বসুর নেতৃত্বে পশুপতি বসুর গৃহের বিশাল প্রাঙ্গণে প্রায় লক্ষ লোকের সমাবেশে একটি বিরাট সভায় রবীন্দ্রনাথ উৎসাহদীপ্ত কণ্ঠে বল্লেন "এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও, কেউ পিছিয়ে যেও না।" তার মধুর কণ্ঠে গীত "বাংলার মাটি বাংলার জল" সকলকে অভিভূত করলো। এই সভাতেই তিনি রাখীবন্ধন প্রচলিত করলেন; এবং সে রাখীবন্ধন মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে একতা বন্ধনের প্রতীক হয়ে আমাদের জাতীয় জীবনে একটি বিশিষ্ট পূণ্য দিন হয়ে রইল।

স্বদেশী ফাণ্ডে এই মিটিং-এই একলক্ষ টাকা উঠে গেল। ব্রহ্মবান্ধবের প্রাণস্পর্শী আবেদনের ফলে জাতীয় বিদ্যামন্দির স্থাপনের জন্য ময়মনসিংএর মহারাজা আচার্য্য সূর্য্যকান্ত চৌধুরী একলক্ষ, গৌরীপুরের জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী একলক্ষ, এবং দেশবাসীর উপাধি দ্বারা সম্মানিত 'দানবীর' রাজা সুবোধ মল্লিক একলক্ষ টাকা এ মহৎ উদ্দেশ্যে দান করে' দেশমাতৃকার মুখ উজ্জ্বল করলেন। ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ, স্যার গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় স্যার হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, স্যার আশুতোষ চৌধুরী এই বিদ্যামন্দিরের কার্য্য নিয়ামক হলেন। সামান্য পারিশ্রমিকে এই বিরাট কার্যভার গ্রহণ করবার জন্য একজন যোগ্য অধ্যক্ষের প্রয়োজন অনুভূত হলে, কার্য্যনির্ব্বাহকমণ্ডলী কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন ; সে বিজ্ঞাপনে শ্রীঅরবিন্দের আসন নড়ে উঠলো। তিনি বরোদার মহারাজার কলেজের সাত শত টাকা পারিশ্রমিক, রাজ সম্মান, সবকিছু ত্যাগ করে মাত্র ৭৫৲ টাকায় দেশ-সেবাব্রতে এই জাতীয়-শিক্ষামন্দিরের প্রধান অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করে শুধু বাংলাদেশকে নয়, সমগ্র ভারতবর্ষকে স্তম্ভিত করলেন। আয়ারল্যাণ্ডের জাতীয় আন্দোলন 'সিন্‌ফিন্‌' আদর্শে অনুপ্রাণিত অরবিন্দের এই বিরাট ত্যাগে বাংলা তাঁকে নব-জাতীয়তা-মহামন্ত্রের গুরুপদে বরণ করে ধন্য হলো, আর আমাদের জাতীয় মুক্তিপথে অগ্রগামী এই সেবকের স্থান হলো ভারতের হৃদয়-সিংহাসনে।

১লা নভেম্বর একতাবন্ধন সুদৃঢ় করবার জন্য জনমত ঘোষণা (Peoples' Proclamation) সর্ব্বত্র প্রচারিত হলো। এই ঘোষণার প্রতিশোধার্থেই যেন লাট ফুলারের চীফ্ সেক্রেটারী মিঃ লায়েন 'বন্দেমাতারম্‌' ভৈরবমন্ত্র, প্রকাশ্য রাজপথে বা পার্কে উচ্চারণ করা নিষিদ্ধ করে দিলেন।

লর্ড কার্জ্জন বঙ্গদেশকে দ্বিখণ্ডিত করলে তার প্রতিবাদে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভারত সচিব লর্ড মর্লির কাছে অভিযোগ জানালেন। লর্ড মর্লি ১২ই জানুয়ারী তার প্রতি উত্তরে জানালেন, "বঙ্গভঙ্গ একটি নির্দ্ধারিত ব্যাপার (Settled fact), এর অদল বদল হবে না।"

লর্ড মর্লির এই উক্তিতে সমগ্র দেশে অশান্তির ছায়া নেমে এল এবং তা ঘনীভূতভাবে প্রকাশ পেল ১৫ই এপ্রিল বরিশাল সম্মিলনে। আব্দুল রসুলের সভাপতিত্বে এই সম্মিলন হয়। অশ্বিনীকুমার দত্তের নেতৃত্বে বরিশাল তখন সংঘবদ্ধ। এই অধিবেশন রোধ করবার উদ্দেশ্যে ম্যাজিষ্ট্রেট্ এমারসন পুলিশ দ্বারা অমানুষিক অত্যাচার চালালেন। চিত্তরঞ্জন গুহঠাকুরতা 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনির জন্য নির্দ্দয়-ভাবে প্রহৃত হলেন। পুলিশের কঠোর অত্যাচারে সম্মিলন ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল।

পুলিশের অত্যাচার যতই উগ্ররূপ ধারণ করল, বাংলার আবালবৃদ্ধবনিতা তাঁদের সংকল্পে ততই অটল হলেন— সমস্ত বাংলা-দেশে পুলিশের জুলুম অবাধে চলতে লাগল,— ২৭শে অক্টোবর ময়মনসিংএ নিরীহ পথচারী ও ছাত্ররা তাদের মাতৃমন্ত্র উচ্চারণের অপরাধে পুলিশ কর্তৃক নির্দ্দয়ভাবে প্রহৃত হলো। গভর্ণমেণ্ট পুলিশ-রাজ প্রতিষ্ঠা করে তাদের কৃতিত্বের নিদর্শন রাখলেন সন্দেহ নেই কিন্তু মাতৃসেবকেরা প্রাণ বিসর্জ্জনের বিনিময়েও তাদের অটল সংকল্প থেকে তিলমাত্র বিচ্যুত হননি।

আমাদের রসারোডের বাড়ীতে তখন তুমুল কোলাহল। ভোম্বলকে জাতীয় শিক্ষামন্দিরে দেওয়া হলো। মনে আছে, ভোম্বল একটা গেরুয়া পাগড়ী বেঁধে বুকে 'স—স' (সন্তান সম্প্রদায়) লেখা চাক্তি পরে ভিক্ষায় বের হতো এবং ওর এই দায়ীত্বপূর্ণ কাজের কথা

আমাদের গম্ভীর হয়েই জানিয়ে দিত। এসময় বিপিনচন্দ্র পাল আমাদের বাড়ী খুব আসতেন। ক্রমশঃই পিতৃদেবের সঙ্গে তিনি গভীর বন্ধুত্বপাশে আবদ্ধ হন।

কলিকাতায় পোড়াবাজারে এসময় খুব বড় একজিবিশন হয়েছিল, কিন্তু লর্ড মিণ্টো তার উদ্বোধন করাতে বিপিনচন্দ্র পাল, পিতৃদেব ও পি, মিত্র এঁরা এই একজিবিশন বর্জ্জন করেন। এখানে রবীন্দ্রনাথের 'মায়ার খেলা' অভিনীত হয়েছিল, এবং তাতে লেডী প্রতিমা মিত্র ও বড় পিসিমার মেয়েরা সেজদি, দিদি, ঝুনু, মায়াদি সকলেই অংশ গ্রহণ করেছিল। এই থিয়েটার দেখবার আমার খুব ইচ্ছে ছিল। রিহার্শেল দেখতে পেয়েছিলাম, কিন্তু যেদিন একজিবিশন খোলা হলো, সেদিন আমার যাওয়া হলো না। বাবা বারণ করলেন। তখন ততটা তো বুঝিনি। 'মায়ার খেলা' দেখতে পেলাম না বলে খুব কষ্ট হলো।

আমরা এসময় খুব স্বদেশী গান গাইতাম ;—"দীনের দীন সবে দীন, ভারত হয়ে পরাধীন।" "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই" "বাংলার মাটি বাংলার জল"; আবৃত্তি করতাম, "সুরেণদাদা বলে গেছে মতিদাদার বাড়ী, মেয়েরা সব শাঁখা পর কাঁচের চুড়ী ছাড়ি," বলে পট্‌পট্ করে কাঁচের চুড়ীর শ্রাদ্ধ করতাম। খেতে বসে সন্ধব লবণ খেতাম আর বলতাম ; "ভুপেনদাদা বলে গেছে শোনরে খোকার মা, রান্না ঘরে বিলিতি নুন আর কক্ষনো এনোনা।" আর বলতাম "বাংলাদেশে জন্মিয়াছি, বাঙ্গালী নাম ধরি, আমাদের মা সোনার বাংলা তাঁকেই প্রণাম করি।" এইসব ছড়া কার লেখা ঠিক মনে নেই, বোধহয় চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। আমাদের কিন্তু খুব ভাল লাগতো এ বইখানি। এই ছড়া বলেই আমাদের ছেলেমেয়েদেরও ঘুম পাড়িয়েছি। সমস্ত অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেছিলাম এই ছড়া-

গুলিকে। পিতৃদেব আমাদের এই সব গান ও ছড়া খুব উপভোগ করতেন। এসময় মাঝে মাঝে আমরা সব ভাই বোনেরা, বাবা কর্ম্মক্লান্ত হয়ে যখন উপরে বিশ্রাম করতে আসতেন তখন তাঁকে নিজেদেরই পরিচালিত ছোটখাট থিয়েটার দেখাতাম। বারান্দায় তক্তপোষের উপর কার্পেট বিছিয়ে হোত ষ্টেজ্ আর পরদা দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে হতো ড্রপ্ সিন্; বড় পিসিমার মেয়ে ঝুনু (সাহানা দেবী) সাজতো বঙ্গমাতা। দেশমাতা চুল ছড়িয়ে মাটিতে শুয়ে ঘুমিয়ে আছেন; তাঁর চারদিকে ঘিরে তার সন্তান, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, সবাই একযোগে তাকে ডাকছে 'মা ওঠ, চোখ খোল, দেখ, "আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে" এরকম গানের পর গান গেয়ে আমরা বঙ্গমাতার ঘুম ভাঙ্গাতাম। এই গানের দলে একেবারে সুরবর্জ্জিত ভাই ভোম্বল শুধু তার 'স–স' চাক্‌তির জোরেই স্থান পেয়েছিল। সমবেত সঙ্গীতের সুর ছাড়িয়ে ভোম্বলের বেসুর চীৎকারে 'বঙ্গমাতা' ওরফে ঝুনু ঘুম ত্যাগ করে গান শেষ না হতেই দাঁড়িয়ে গেয়ে উঠল 'আয় তবে আয় কোলেতে আমার'। তুমুল হাততালির মধ্যে ড্রপ্ সিন্ পড়লো। পিতৃদেব খুব খুসী হতেন এবং আমরা সবাই এরজন্য তাঁর কাছ থেকে টাকা পেতাম। টাকা পাওয়া মাত্র ভোম্বল তার সন্তান সম্প্রদায়ের থলি এনে টাকাটা ভাল কাজের জন্য নিয়ে নিত।

এই সালেই ৬ই জুন, পিতৃদেব দাদামণির ঋণভারের দায়ীত্ব গ্রহণ করে আদালতে দেউলিয়া হলেন। দাদামণিকে শাস্তি দেবার জন্যই তিনি এটা করেছিলেন নিশ্চয়ই, কিন্তু দাদামণি কি শান্তি পেয়েছিলেন এতে? ছেলে তাঁর সঙ্গে তাঁর ঋণের দায়ীত্ব গ্রহণ করল স্ব-ইচ্ছায়, এতে গর্ব্ব হয়তো তাঁর হয়েছিল, কিন্তু শান্তি পাননি কখনো।

আমাদের রসারোডের বাড়ীতে এসময় আর একটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটেছিল। কলিকাতায় সেবার কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। বিপিনচন্দ্র পাল ও পিতৃদেবের সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ও ভুপেন্দ্র নাথ বসুদের কংগ্রেস সভাপতি নির্ব্বাচন নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়। পিতৃদেব চেয়েছিলেন লোকমান্য তিলককে সভাপতি করতে কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের দল চাইলেন দাদাভাই নৌরজীকে। এই উদ্দেশ্যে আগেই তাঁরা দাদাভাই নৌরজীকে 'তার' করে তাঁর সম্মতি এনে ফেলাতে বাধ্য হয়ে তাঁকেই সভাপতি করতে হলো। বাবা খুব ব্যথিত হলেন, এবং আমাদের বাড়ীতে লোকমান্য তিলক, খাপার্দ্দে এবং ডাক্তার মুঞ্জে ও তাঁদের সহকর্ম্মীগণসহ আসবেন জেনেও তিনি এ কংগ্রেস এড়াবার জন্যই মার উপর অতিথিসৎকারের ভার দিয়ে পুরুলিয়া ঠাকুরমা দাদামণির সঙ্গে চলে গেলেন। আমরা মার কাছেই রইলাম। কংগ্রেসের কিছুই বুঝবার বয়স তখন হয়নি আমাদের। শুধু মনে আছে, লোকমান্যর জন্য রসারোডের বাড়ী— রাতদিন লোকে লোকারণ্য ছিল। সারারাত স্বেচ্ছাসেবকেরা 'বন্দেমাতারম্' বলে বাড়ী পাহারা দিত। আমাদের কিন্তু খুব স্ফূর্ত্তি তখন, ইস্কুলের বালাই নেই, রাতদিন কেবল অসংখ্য লোকের আনা-গোনা, দেখতে খুব ভাল লাগত। ভোম্বল স্বেচ্ছাসেবক হয়ে কেবল তিলক মহারাজের ঘরে আর বাইরে ছুটে বেড়াত। আমরাও তাঁকে দেখবার জন্য উঁকি ঝুঁকি মারতাম। তাঁর লাল টুপী ও লাল চটী জুতো আমাদের খুবই ভাল লাগত। মা যখন তিলক মহারাজের খাওয়া দাওয়ার তদারক করতেন বা তাঁর সঙ্গে বসে গল্প করতেন, তখন আমরাও সেখানে থাকতাম। কংগ্রেসের অধিবেশন হয়ে গেলেই পিতৃদেব কলিকাতা ফিরে এলেন। লোকমান্য তারপরও কিছুদিন ছিলেন। তিলকের সঙ্গে বাবার স্নেহ-প্রীতির নিবিড়

সম্পর্ক ছিল; দুজনে দুজনকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন। রাজনৈতিক আলোচনা ছাড়াও তাঁদের দুজনের মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বহু আলোচনা হতে দেখেছি। একথা বললে ভুল হবে না যে লোকমান্যের মহারাষ্ট্রও পিতৃদেবকে একান্ত আপনার জন বলেই গ্রহণ করেছিল।

এই সময়েই শ্রীঅরবিন্দ ও বিপিনচন্দ্রের পরিচালনায় "বন্দেমাতরম্" কাগজ প্রকাশিত হয়।

——o——

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও আলীপুর বোমার মামলা

১৯০৭ সালে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও বিপিনচন্দ্র পাল রাজদ্বারে অভিযুক্ত হলেন।

শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন,—"বঙ্গদেশে কালোচিত কৌশলের সঙ্গে দূরদর্শিতার সমন্বয় একমাত্র চিত্তরঞ্জনেরই দেখা গিয়াছে।" ভবিষ্য সাধকের এই সারগর্ভ ও সংক্ষিপ্ত উক্তির যথার্থতা দেশবাসী উপলব্ধি করেছিল। বাস্তবিকই পিতৃদেব একাধারে কবি, দার্শনিক, স্বজাতিবৎসল এবং স্বদেশ প্রেমিক ছিলেন। জীবনের স্বপ্নকে তিনি বাস্তবে পরিণত করতেন। অবশ্য তাঁর কাছে যা বাস্তব অপরের কাছে তা হয়তো স্বপ্ন বা স্বপ্নাতীত ছিল। তখনকার ইংরাজের সংস্কার আইনকে প্রবল রাজশক্তির গণ্ডীর ভিতর থেকে টেনে বাইরে এনে লোকচক্ষুর সামনে চূর্ণ বিচূর্ণ করে তিনি তাঁর অদ্ভুত শক্তির বহু দৃষ্টান্ত দেখিয়ে 'মডারেট' প্রদর্শিত সংকীর্ণ আবেদন নীতি হতে সর্ব্বভারতীয় রাজনীতিকে এক উন্মুক্ত পথের সন্ধান দিয়েছিলেন। ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ-দীপ্ত তাঁর জীবন তাই শিক্ষিত ও অবহেলিত জনগণ-নির্ব্বিশেষে সকলের উপর প্রভাব বিস্তার করে এক নবযুগের সৃষ্টি করেছিল।

পরবর্ত্তী জীবনের লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনবিদের সূচনা সূচিত হোল যখন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও বিপিন চন্দ্রের পক্ষ সমর্থনে পিতৃদেব দাঁড়ালেন। হাইকোর্টে আদিম এবং ফৌজদারী দুই বিভাগেই তিনি ছিলেন সব্যসাচী বিশেষ। আদিম বিভাগে তাঁর প্রসার ও প্রতিপত্তির সোপান আরোহণ কালে বাংলাদেশে মরাগাঙ্গে বান এলো। পিতৃদেব

সে সময় 'জয় মা' বলেই যেন বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে স্বদেশ-প্রেম-তরীর হাল ধরলেন। ব্রহ্মবান্ধব তাঁর 'সন্ধ্যা' কাগজে রাজদ্রোহমূলক লেখার জন্য, এবং বিপিন চন্দ্র প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কিংস্‌ফোর্ডের এজলাসে সাক্ষীরূপে আহূত হয়েও মূক হয়ে থাকবার জন্য, রাজ-দ্বারে অভিযুক্ত হলেন। বাবা ব্রহ্মবান্ধবের পক্ষ সমর্থন করলেন। এ সময়ে মোকর্দ্দমা বোঝাবার জন্য উপাধ্যায় আমাদের রসারোডের বাড়ীতে আসতেন। কোন কোন দিন গভীর রাত্রি হয়ে যাওয়াতে তিনি আমাদের বাড়ীতেই থাকতেন। সুন্দর তেজোদীপ্ত তাপস মূরতি ছিল তাঁর। তাঁকে দেখলেই সমস্ত মন ভক্তি ও শ্রদ্ধায় ভরে উঠতো। আদালতে যাবার শেষদিনে আমাদের বাড়ী থেকেই তিনি খেয়ে গেলেন। মার হাতের রান্না কুমড়োর ছেঁচকি খেয়ে তিনি এতই তৃপ্ত হয়েছিলেন, যে মাকে বল্লেন "এমন চমৎকার রান্না আমি আর খাইনি, আমি ফিরে এসে আবার আপনার হাতের কুমড়ো ছেঁচকি খাব",—কিন্তু আর তিনি মার হাতের রান্না খেতে কোনদিনই আসেননি। সেই যাওয়াই তাঁর 'অগস্ত্য' যাত্রা হোল।

ব্রহ্মবান্ধবের মামলার সময় গভর্ণমেণ্টের অনুবাদক নারায়ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্যকে জেরা করবার সময় পিতৃদেব মাজিষ্ট্রেটের অসঙ্গত ও অন্যায় আচরণের তীব্র প্রতিবাদ করে এজলাস থেকে বের হয়ে এলেন। ব্রহ্মবান্ধব বাবাকে বলেছিলেন, "আমি ইংরাজের আদালত মানিনা, আমি জেরা করব না।" বাবা বল্লেন "আমার ও ঐ অসঙ্গত আচরণকারী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে আর যেতে ইচ্ছে করেনা, আপনাকে হয়তো জেলেই যেতে হবে।" উপাধ্যায় তখন বলেছিলেন আপনি "নিশ্চিন্ত থাকুন, ইংরাজের সাধ্য নেই আমাকে জেলে পাঠায়।" তপঃসিদ্ধ সাধকের সে কথা মিথ্যা হয়নি। এরপরই

হঠাৎ তাঁর দেহে অস্ত্রোপচার আবশ্যক হয়ে পরাতে তাঁকে ক্যাম্পবেল্ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়; সেখানে তিনি যেন ইচ্ছামৃত্যুই বরণ করে নিলেন। বিদেশীর আইন তাঁর কেশও স্পর্শ করতে পারল না। মাতৃযজ্ঞের হোতা 'সন্ধ্যার' ধ্রুবতারা ভারতবরেণ্য ব্রহ্মবান্ধব

"ধিনতা ধিনা পাকা নোনা,
ঘুচলো ভবের আনাগোনা
তোর হাতের ফাঁসী রইল হাতে
আমি বন্ধন দশায় পরবনা।" বলে বৃটিশ গভর্ণ-

মেণ্টকে যেন উপহাস করেই ইহলোক ছেড়ে চলে গেলেন।

তাঁর শেষ বিদায়ের স্মৃতি বক্ষে ধরে শোকমগ্ন রসারোডের বাড়ী নীরব নিথর হয়ে রইল। এরপর ১৯০৮-৯ সালে আলীপুর বোমার মামলা।

শ্রীঅরবিন্দ যে সময় বরোদার উচ্চপদ ত্যাগ করে দেশমাতৃকার সেবায় আত্মনিয়োগ করে কলিকাতায় ন্যাশনাল কলেজে মাত্র ৭৫৲ টাকায় প্রিন্সিপালের পদ গ্রহণ করলেন, সে সময় বাংলাদেশে একদল শক্তিশালী জাতীয় কর্ম্মীর আবির্ভাব হয়, এবং অরবিন্দের অসাধারণ বাগ্মীতায় সে দল আরো সমৃদ্ধি লাভ করে। কয়েক বৎসর পরে এই দলের কয়েকজন কর্ম্মী বিধিসঙ্গত আন্দোলনের (constitutional agitation) পথ পরিত্যাগ করে গুপ্ত হত্যা ও বিপ্লব ইত্যাদি দ্বারা বৃটিশ শক্তিকে পরাভূত করতে প্রবৃত্ত হলেন। গুপ্ত হত্যায় অর্দ্ধবঙ্গের সমর্থন ছিল কিনা জানিনা; তবে ঐ সময়ের ইতিহাসে দেখা যায় যে অরবিন্দের বাংলার নেতৃত্ব গ্রহণ করার পরই জাতীয় আন্দোলনের রূপ এই পথেই চলে আসে। অবশ্য এসম্বন্ধে নানা মতভেদ আছে। এসময় মজঃফরপুরে ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী, কিংস্‌ফোর্ডকে হত্যা করতে গিয়ে ভুলক্রমে মিসেস্ কেনেডী ও

তার কন্যাকে হত্যা করে। হত্যা করার অভিযোগে ১লা মে ক্ষুদিরাম বসু ধৃত হয় এবং ২রা মে ৩৮।৪ রাজা নবকৃষ্ণ রোডে, হেমচন্দ্র দাস, নবশক্তি অফিসে অরবিন্দ ঘোষ, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, কানাইলাল দত্ত, শৈলেন্দ্র বসু ও অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এই হত্যার ষড়যন্ত্রে সংশ্লিষ্ট সন্দেহে ধৃত হন, এবং ৩২নং মুরারী পুকুর বাগানে খানাতল্লাসীকালে বারীন্দ্র ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, ইন্দুভূষণ দত্ত প্রভৃতি দশজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। ৩রা মে প্রফুল্ল চাকী মোকামা ষ্টেশনে ধৃত হওয়া মাত্র রিভলবার দ্বারা আত্মহত্যা করেন। বিপ্লবীদের আইনে ধরা পড়ার অনতিপূর্ব্বেই আত্মহত্যা করার এই আইন ঠিকমত পালন করে প্রফুল্ল চাকী ইংরেজ শাসকদের বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে বিপ্লবীরা সুসংবদ্ধ ও সুপরিচালিত।

এঁদের গ্রেপ্তারে দেশময় তুমুল উত্তেজনা পড়ে গেল। ইংরাজ বিদ্বেষে দেশ তখন ভরপুর। আমলাতন্ত্রের কঠোর নীতি অবলম্বনের জন্যই নির্দ্দোষ ইংরাজ নাগরিকদের কেউ কেউ বিপ্লবীদ্বারা নিহত হলেন। ৬ই মে রেভারেণ্ড হিগেন বোথাম গুলিদ্বারা নিহত হলে, কুষ্টিয়ায় পাঁচজন বাঙ্গালী যুবক এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অপরাধে ধরা পড়ে। সমস্ত দেশে আগুন জ্বলে উঠল। ইংরাজ ধ্বংস করলে বৃটিশ আমলাতন্ত্রও ধ্বংস হবে এবং দেশ স্বাধীন হবে এই বিশ্বাসের অনুবর্ত্তী হয়েই বিপ্লবীদল, বোমা, সশস্ত্র ডাকাতি, গুপ্ত হত্যায় রত হোল। কোন কোন রাজনৈতিক ইতিহাস লেখক ও নেতা এটা 'ভুল পথ' বলে ব্যাখ্যা করেন, কিন্তু এটা ভুললে চলবেনা যে তাদের অন্তর্নিহিত কামনা ছিল দেশমাতাকে দাসত্ব শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার। মডারেটদের আবেদন নীতিতে কোন ফল হবেনা বুঝে এবং বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট তাদের দেশের কোন কাজ করবার সুযোগ দেবেনা জেনেই প্রবল দেশাত্ম বোধের প্রেরণায় তারা নিজেদের প্রাণ তুচ্ছ করে ঝাঁপিয়ে

পরেছিলেন দেশকে স্বাধীন করবার প্রয়াসে। এ প্রসঙ্গে পিতৃদেব ১৯১৭ সালে ভবানীপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনে বলেছিলেন,—"প্রথমেই আমাকে বলিতে হয় যে যাহাদের এনার্কিষ্ট্ বল তারা বস্তুতঃ পক্ষে এনার্কিষ্ট্ নহে"। বৃটিশ রাজশক্তিকে তিনি তাদের চরম দমন-নীতির ভুল দেখিয়ে আরও বলেছিলেন, "কি কারণে এই যুবকবৃন্দ রাজবিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে তাহা অনুসন্ধান করিয়া না দেখিলে এই শাসন সম্পূর্ণরূপে সার্থক হবে না।" আমার মনে হয় বিপ্লবীদের পথ যদি সত্যই 'ভুল পথ' হয়ে থাকে তবে তার জন্য ইংরাজের দমন-নীতির সঙ্গে মডারেটদের আবেদন নীতিও সমভাবেই দায়ী। দেশ-প্রেমের স্বতঃস্ফুর্ত্ত আবেগ কোন নির্দিষ্ট পথ দিয়ে চলবে এ কথা কোন দেশের স্বাধীনতার ইতিহাসেই দেখা যায় না বরং নানামত ও নানাপথে এসে এক সঙ্গমে শক্তিশালী হয়ে সুনির্দিষ্ট পথে এগিয়ে যাওয়ার দৃষ্টান্তই দেখা যায়।—তাই বলে এক মতাবলম্বীরা অন্য মতাবলম্বীদের পথকে 'ভুল পথ' বলাটা ঠিক বলে মনে হয় না। তাই বিপ্লবীদের দেশাত্মবোধ দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের প্রয়াসে জীবণ পন কোন শ্রেণীর ঐতিহাসিকের মতে 'ভুল পথ' বলে মনে হলেও ভারতের ইতিহাসে তা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে বলে আমি মনে করি।

বোমা-আতঙ্কগ্রস্থ গভর্ণমেণ্ট ৮ই জুন ব্যবস্থাপক সভায় সংবাদ-পত্র আইন ও বিস্ফোরক আইন পাশ করে দমননীতি আইনকে আরও কঠোর করেনিলেন। গভর্ণমেণ্ট যতই তাদের কঠোর নীতি ও আইনের বাঁধনে দেশকে বাঁধতে লাগলেন বিপ্লবীরাও ততই তাঁদের পূর্ণ শক্তি নিয়োজিত করল তাদের আরব্ধ কাজে।

আলীপুরের সেসন্ জজ্ মিঃ বীচক্রফ্ট ইংলণ্ডে অরবিন্দের সহপাঠী ছিলেন। তাঁরই এজলাসে এই আলীপুর বোমা ষড়যন্ত্রের মামলার বিচার আরম্ভ হলো। আসামীদের পক্ষ সমর্থনের জন্য

প্রথমে বিচক্ষণ ব্যারিষ্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী নিয়োজিত হয়েছিলেন। পিতৃদেবের নিকট তখনো এ মামলা পরিচালনা করার কথা বলতে কেউ আসেননি। কিন্তু প্রথম থেকেই বাবার এ মামলা সমর্থন করবার খুব ইচ্ছা ছিল। এই সময়ে তিনি খুব পরলোক তত্ত্ব আলোচনা করতেন, এবং প্রায়ই রাত্রে আমাদের রসারোডের বাড়ীতে আত্মা আনয়ণ করবার জন্যে চক্রে বসতেন। আমরা ছেলেমেয়েরা ঘুরে ফিরে এদরজা ওদরজা দিয়ে উঁকি ঝুঁকি মারতাম। একদিন বাবা বল্লেন "আজ আত্মাচক্রবৈঠকে অরবিন্দের মোকর্দ্দমার কথা জিজ্ঞাসা করব।" নাটোরের স্বর্গীয় মহারাজা জগদীন্দ্র নাথ রায়ও এবৈঠকে থাকতেন। সেদিন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের আত্মা এসেছিলেন; বাবা অরবিন্দের কথা জিজ্ঞাসা করতেই ইংরাজীতে লেখা হলো "you must defend Aurobinda" এবং এই একই কথা চঞ্চল পেনসিল ঘুরে ফিরে বারবার লিখতে লাগল। পিতৃদেব খুব উত্তেজিত হলেন এতে। বিজয়মামা (বি, সি, চ্যাটার্জ্জী ব্যারিষ্টার) এলে তাঁকে বল্লেন "তুমি দেখে নিও বিজয়, এ মোকর্দ্দমা আমার কাছে আসবেই।" মোকর্দ্দমা সত্যই তাঁর কাছে এলো। কারণ মামলা পরিচালনা করবার অর্থ নিঃশেষিত হলে ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তীর মত বিচক্ষণ ব্যারিষ্টারকে আর নিযুক্ত রাখা সম্ভব হলো না, এবং তিনিও থাকতে চাইলেন না। তখন অরবিন্দের তরফ থেকে 'বন্দেমাতরমের' কর্ম্মীগণ, শ্রীশ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী ও কৃষ্ণকুমার মিত্র বাবাকে প্রথম এ মামলা পরিচালনার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু কৃষ্ণকুমার মিত্র অন্তরীণে আবদ্ধ হওয়ায়, উল্লাস্ করের জননী এ'সে পিতৃদেবকে এ মামলা করতে বলে বল্লেন,—"আমি শুধু আমার ছেলের জন্য আসিনি, সব ছেলেদের বাঁচাবার ভার তুমি নাও বাবা"। বাবা উল্লাস করের মাকে প্রণাম করে বল্লেন, "আপনার আশীর্ব্বাদে আমরা যেন জয়ী হই"।

উল্লাসকরের মাকে দেখে বাবা স্তম্ভিত হয়েছিলেন, তিনি প্রায়ই বলতেন, "এই মা না হলে কি এমন ছেলে হয়? ক'জন মা বলতে পারে আমি শুধু আমার ছেলের জন্য আসিনি! এই মায়েরাই দেশকে ধন্য করে রেখেছে।"

এর পর পিতৃদেব প্রথমে নামমাত্র পারিশ্রমিকে মামলা আরম্ভ করলেন। তখন খুবই কষ্টে আমাদের চলতো। তপঃসিদ্ধ তাপসের মতই বাবা যেন দুশ্চর তপস্যায় সমাহিত হলেন। কাজ! কাজ! কাজ! অষ্টপ্রহর দেখতাম আমবা বাবাকে রাশি রাশি আইন পুস্তকের মধ্যে ডুবে থাকতে। রসাবোডেব কোলাহলপূর্ণ বাড়ী যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। আমরা পর্য্যন্ত আমাদের খেলা ধূলা ভুলে গেলাম, সকলেই তটস্থ থাকতাম। সামান্য শব্দেও যোগীর যোগ যেন ভেঙ্গে না যায়। বাড়ীশুদ্ধ সকলে সন্তর্পনে চলাফেবা করতে লাগলো। নিত্য সান্ধ্যবাসরে আমবা পিতৃদেবের সঙ্গ সুখ থেকে বঞ্চিত হলাম। এক একদিন এমনও দেখেছি যে তাঁর উঠে খেতে আসবারও সময় থাকতো না। ঠাকুরমা বাবার অফিস ঘরে নিয়ে তাঁকে কতদিন খাইয়ে দিয়েছেন; মা পাশে থেকে সন্তর্পনে 'এটা' 'ওটা' এগিয়ে দিতেন। আমরা শুনতাম আমাদের দেশের সোনাব ছেলেদের জীবন বিপন্ন, বাবা তাদের বাঁচাবার চেষ্টা করছেন। আমোদ প্রমোদেব সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর বিলাস সম্ভারও একে একে অদৃশ্য হতে লাগল। বাবা যেন জীবন সর্ব্বস্ব পণ করে এই সাধনায় সিদ্ধি লাভ করতে কৃতসংকল্প হলেন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন সরকার পক্ষের ব্যারিষ্টার আর্ডলী নরটন্। এই মামলায় পিতৃদেব সূক্ষ্মদর্শিতা, আইনজ্ঞতা ও দেশপ্রীতির যে পরিচয় দিয়েছিলেন তা সত্যই দুর্লভ। ফৌজদারী আইনে তাঁর গভীর সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয়ে বীচক্রফ্‌ট তাঁকে ফৌজদারী আইনের স্রষ্টা বলে (Maker of Criminal Law) উল্লেখ করেছিলেন। এই মামলায় তাঁর আইনের

কূট তর্কবিতর্ক শুধু আইন পুস্তকেই লিপিবদ্ধ হয়ে নয়; সমগ্র দেশবাসীর হৃদয়ে তা চিরস্মরণীয় হয়ে রইল। এই মামলাতেই তিনি আইনের অগ্নিপরীক্ষা অতিক্রম করে দেশপ্রেমের এক উজ্জ্বল আদর্শ স্থাপন করলেন।

মোকর্দ্দমা চলার সময় পিতৃদেব মাঝে মাঝে রাজবন্দীদের দেখতে যেতেন, সে সময় তাঁর সঙ্গে ভাই ভোম্বলও যেতো। একদিন ভোম্বলকে উল্লাসকর জিজ্ঞেস করেছিলেন; "বড় হলে তুমি কি হবে?" ভোম্বল তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়েছিল "আমি বাবার মত ব্যারিষ্টার হব"– উল্লাসকর হেসে ভোম্বলকে বলেছিলেন "খোকা, বড় হলে তোমারও যদি ব্যারিষ্টার হতে হয়, তবে আমাদের আজ এখানে আসা বৃথা হয়েছে। আশাকরি ইংরাজ রাজত্বে ব্যারিষ্টার তোমার হতে হবে না।" দেশকে তাড়াতাড়ি শৃঙ্খল মুক্ত করবার কি উদগ্র আকাঙ্খাই না তারা হৃদয়ে পোষণ করেছিলেন। ভোম্বল বাড়ী এসেই বল্ল "আমি ব্যারিষ্টার হবনা, উল্লাসকর বারণ করে দিয়েছেন।" বাবা যাঁদের জন্য এত কাজ করছেন, তাঁদের আমরা দেবতা বলেই মনে করতাম।

অরবিন্দকে সমর্থন করতে পিতৃদেব যেদিন প্রথম কোর্টে দাঁড়ালেন—অরবিন্দ তখন বলেছিলেন, "আমার সামনে আজ সাক্ষাৎ নারায়ণ দাড়িয়েছেন।" হয়তো তাঁর রক্ষাকর্ত্তারূপে তিনি পিতৃদেবের মধ্যে নারায়ণকে অনুভব করেছিলেন। এরপর জেলেও তিনি মাছে মাঝে নারায়ণ দর্শন করতেন। জানি না, তাঁর জীবনের এখান থেকেই ধর্ম্মের দিকে মোড় ঘুরেছিল কি না,—কেননা পরবর্ত্তী জীবনে পণ্ডিচেরীর শ্রীঅরবিন্দই তার প্রমাণ। মানুষের জীবনের গতি প্রকৃতির অদৃশ্য হস্তের চালনায় কোথা হতে কোথায় চলে

যায়, তা সত্যই দেখবার মত। পরবর্ত্তীকালে যখন বারীণ ঘোষদের বিপ্লববাদ থেকে রক্ষাকল্পে তাদের জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য পিতৃদেব একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিত করেছিলেন, তখন নারায়ণ সকলের রক্ষাকর্ত্তা অরবিন্দের একথা অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করেই বুঝি পত্রিকার নামাকরণ করেছিলেন "নারায়ণ"।

সেসন্ কোর্ট থেকে হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতি স্যার লরেন্স জেনকিন্স্ ও বিচারপতি মিঃ উড্রফের এজলাসে এই মামলার শুনানী আরম্ভ হয়। তখন পিতৃদেবের আইন বিশ্লেষণ শক্তি ও যুক্তিতর্কের প্রভাব এবং অশ্রুধৌত ভাবাভিভূত হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতায় বিচারপতিদ্বয় স্তম্ভিত হয়েছিলেন। তাঁর সুযুক্তিপূর্ণ বাগ্মীতা আইন ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে রইল আলীপুরের বোমার মামলায়। পিতৃদেব অরবিন্দকে সসম্মানে মুক্ত করে নিয়ে এলেন। দীর্ঘ দশমাসের তপস্যায় তিনি সিদ্ধিলাভ করলেন।

মোকর্দ্দমা চলার কালে উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলির মধ্যে কানাই কর্ত্তৃক নরেণ গোসাইকে হত্যাই প্রধান। অরবিন্দ ঘোষ এবং বাংলার অন্যান্য বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিকে ডাকাতি ও হত্যা করার প্রয়াসে সংশ্লিষ্ট বলে নরেণ গোসাই রাজসাক্ষী রূপে বিবৃতি দেওয়াতে, ৩১শে আগষ্ট কানাই জেলের মধ্যে গোপনে বাহির হতে আনা রিভলভার দিয়ে এই অকৃতজ্ঞ বিশ্বাসঘাতককে ধরাতল হতে নিশ্চিহ্ন করে দিল। এই হত্যার জন্য বিচারে কানাইয়ের ফাঁসীর হুকুম হয়। এই ঘটনা উপলক্ষ করে রসরাজ পঞ্চানন 'বঙ্গবাসীতে' লিখলেন,—

দ্বাপরে কানাই ছিল নন্দের নন্দন,
কলিতে তাঁতীর কুলে দিল দরশন॥

কানাইকে ছলিয়াছিল অক্রুর গোঁসাই।
গোঁসাইকে কানাই দিল বৃন্দাবনে ঠাঁই॥
গোঁসাই হোল গুলীখোর কানাই নিল ফাঁসী।
কোন চোখে বা কাঁদি, বল, কোন চোখে বা হাসি ?

কানাইয়ের অন্ত্যেষ্ঠি ক্রিয়ার দিন শোকসন্তপ্ত স্বদেশবাসী অসংখ্য নরনারী শোকাকুল হৃদয়ে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন করল। সমস্ত কলিকাতা ভেঙ্গে পরল কেওড়াতলা শ্মশান ঘাটে। অলক্তক রঞ্জিত কানাইয়ের পায়ের ছাপ নেবার জন্য কাড়াকাড়ি পরে গেল। কানাইয়ের শবের প্রতি দেশবাসীর ভক্তি শ্রদ্ধার ভাব দেখে সত্যেনকে ফাঁসীর পর আলীপুর জেলের মধ্যেই অন্ত্যেষ্ঠিক্রিয়া সম্পন্ন করার ব্যবস্থা হলো। এই ভাবেই দেশবাসী, গভর্ণমেণ্ট দ্বারা দেশপ্রেমিকের প্রতি তাদের অন্তরের শ্রদ্ধা জানাবার অধিকার থেকেও নির্ম্মম ভাবে বঞ্চিত হলো। পিতৃদেব ব্যথাতুর চিত্তে নীরবে শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করলেন। শ্রদ্ধাপূরিত হৃদয়ে আমরা এই বরেণ্য দেশমাতৃকার সুসন্তানের প্রতি আমাদের অন্তরের ভক্তি জানালাম। গম্ভীর উদাত্ত স্বরে দেশ গেয়ে উঠল—

"ক্ষুদিরাম গেল হাসিতে হাসিতে
ফাঁসীতে করিতে জীবন শেষ
পাপিষ্ঠ নরেণে বঁধিল কানাই—
সত্যেন ধন্য করিল দেশ।"

আপিলের মামলার বিচারে বারীণ ও উল্লাসকরের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়ে গেল।

শ্রীঅরবিন্দের অন্যান্য কর্ম্মীগণ সহ মুক্তিলাভে রসারোডের উৎসব-মুখরিত সে দিনের দৃশ্য জীবনেও ভুলব না। কার যাদুস্পর্শে

গম্ভীর মৌন সে গৃহ মুখরিত হয়ে উঠল দেশবাসীর কলকোলাহলে? অরবিন্দ-সহ মুক্ত বন্দীরা আমাদের বাড়ীতে আসতেই পুরনারীরা শঙ্খ ও উলুধ্বনির সঙ্গে লাজবর্ষণ করে তাঁদের অভিনন্দন জানালেন। রাশীকৃত নূতন ধুতি আনান হলো, তাঁদের জন্য। 'বন্দেমাতরম্' বলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তাঁরা আমাদের পুকুরে। মুক্ত বন্দীদের প্রাণের হিল্লোলে পুকুরের জল উচ্ছল হয়ে উঠল। সমবেত কণ্ঠে তাদের জাতীয় সঙ্গীতে আকাশ বাতাস মুখরিত হলো।

মা ওঁরা রান্নাবাড়ার আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পরলেন, দেবভোগ দেখবার জন্য আমরা ভাইবোনেরা মেতে উঠলাম— রাশীকৃত কলার পাতা ও মাটীর গেলাস নিয়ে বসে গেলাম ধুতে। 'আনন্দ আজ কহনে না যায়' এমনি ভাব সবাইর। পিতৃদেবের আপিস ঘরের সামনের বৃহৎ দালানে খাবার যায়গা করা হলো। ঘণ্টাখানেক জলে ঝাপাঝাপি, গান ইত্যাদি করে সকলে উঠে এলেন। নববস্ত্রে সজ্জিত হয়ে কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে বিশ্বের ক্ষুদা নিয়ে দেশমাতৃকার সুযোগ্য সন্তানেরা খেতে বসলেন। সমস্বরে আবার ধ্বনিত হোল 'বন্দেমাতরম্'। মা ওঁরা পরিপাটি করে পরিবেশন করে ধন্য হলেন, আমরাও পরিবেশন করার জন্য অস্থির হলে, আমাদের নুন, জল আর মিষ্টি দিতে দেওয়া হলো। তাতেই আমরা স্বর্গ পেলাম হাতে। অরবিন্দের পাতে সন্দেশ দিয়েছিলাম এখনো সে কথা গর্ব্বের সঙ্গেই স্মরণ করি। পিতৃদেব তাঁদের সঙ্গেই খেতে বসেছিলেন। তিনি মুক্ত রাজবন্দীদের উদ্দেশ্য করে বল্লেন; "আজ আর তোমাদের সান্‌কী পালাতে চাইবে না।" সেদিন রসারোডের এই দালানে বাঙ্গালী হরিহর মূর্ত্তি অরবিন্দ ও চিত্তরঞ্জনকে অন্তরের প্রণাম ও অভিনন্দন জানাল।

আলীপুরের এই মামলার পর থেকেই ভাগ্যলক্ষ্মী পিতৃদেবের প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করতে আরম্ভ করলেন। এরপরে ডুমারওণের

মামলায় তিনি দেওয়ানী মামলার কৃতিত্ব প্রকাশ করে বিখ্যাত হন। আলীপুর ও ডুমরাওণের এই দুই মামলা তাঁকে ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যবহারাজীব বলে প্রতিষ্ঠিত করে। আগেই বলেছি তিনি আইন ইতিহাসে সব্যসাচী বলে উল্লিখিত হলেন। এরপর গভর্ণমেণ্টের দায়ীত্বপূর্ণ মোকর্দ্দমা পরিচালনার জন্য তাঁরই ডাক আসতো। যশোলক্ষ্মী ও ধনলক্ষ্মী এসে তাঁর ভাগ্যলক্ষ্মীর সঙ্গে যুক্ত হলেন।

আলীপুরের মামলার অবিশ্রাম কার্য্যের পর পূজাবকাশে হাইকোর্ট বন্ধ হলে বাবা আমাদের নিয়ে সেবার দার্জিলীং গেলেন। আমরা বার্চ্চ হিলের দিকে দ্বারিক পিসামহাশয়ের 'রে ভিলা' নামে বাড়ীতে ছিলাম। সহরের থেকে অনেক দূরে এ জায়গাটা পিতৃদেব খুবই পছন্দ করতেন। এখানে তিনি তাঁর সাহিত্য সাধনা করার প্রচুর অবসর পেতেন। বাড়ীটা দূরে অবস্থিত থাকায় সহজে বড় কেউ আসতেন না। পিতৃদেবও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে দিবারাত্র মগ্ন হয়ে থাকতেন। এ সময় তিনি ছোট ছোট বহু কবিতা লিখেছিলেন, পরে তা 'নারায়ণে' প্রকাশিত হয়েছিল।

আমরা ভাইবোনেরা লক্ষ্য করতাম এবার, যেন তিনি সব সময়ই কেমন অবসন্ন থাকতেন। আলীপুরের মামলায় অত্যধিক পরিশ্রমেই তিনি এরকম হয়েছিলেন সন্দেহ নেই। বাড়ীর এত নির্জ্জনতা আমাদের বিশেষ পছন্দ না হলেও পিতৃদেবের কিন্তু শারীরিক উপকার খুবই হলো। এখানেই তাঁর যথার্থ বিশ্রাম হয়েছিল,—শরীর ও মনে।

—※—

ডুমরাওণ মোকর্দ্দমা।

১৯১০ সালেই দার্জ্জিলিং থেকে পূজাবকাশের পর ফিরে এসে বাবা দেওয়ানী বিভাগে ডুমরাওণের মোকর্দ্দমা গ্রহণ করেন। দীর্ঘকাল ধরে এ মোকর্দ্দমা পরিচালনার জন্য তাঁকে আরাতে থাক্‌তে হয়েছিল। ঠাকুরমা, দাদামণি ও আমাদের সকলকে নিয়ে পিতৃদেব আঁরাতে চলে গেলেন।

ডুমরাওণের রাজতক্ত দাবী করে কেশপ্রসাদ সিং তাঁর পক্ষ সমর্থনের জন্য পিতৃদেবকে নিয়োজিত করেন। মোকর্দ্দমা বোঝাবার জন্য কেশপ্রসাদ বাবু রোজ আমাদের বাড়ীতে আসতেন। তখন তাঁর কোন ঐশ্বর্য্যই ছিলনা, অতি সাধারণ লোকের মতই আসতেন তিনি। আমাদের বেহারা বদ্‌রীর সঙ্গে গল্প করতেন, "যেবা পানি পিলাওতো ভাই" বলে যতদিন তাঁকে দেখেছি বদ্‌রীর লোটা থেকে জল পান করতো। আচার বিচারে অত্যন্ত গোঁড়া ছিলেন বলে আমাদের পাত্রে জল পান করতেন না। এই অতি সাধারণ বেশী ভদ্রলোক একদিন মহারাজা হবেন আমরা ভাবতেই পারতাম না। তাহলেও তাঁর যে দৃঢ় জেদ্ ছিল তা বেশ বোঝা যেতো। বেশভূষায় তাঁকে মহারাজ বলে চেনবার উপায় না থাকলেও চলনে বলনে তাঁর মহারাজার মতই দৃপ্ত ভঙ্গী ছিল। তিনি প্রায়ই বলতেন "দাশ সাহেব, গদ্দি মিলনেসে আপকা লিয়ে ম্যায় জান দে দুঙ্গো"। তার উপর কলিকাতার বাড়ী গাড়ী, আমাদের বিয়ে, ভোম্বলের শিক্ষা দীক্ষা সব কিছুরই ভার তাঁর, এইসব বলতেন। পিতৃদেব হাসতেন আর বলতেন "যখন সত্যি মহারাজ হবে তখন এসব কথা কি মনে থাকবে তোমার"? কেশপ্রসাদ বাবু

উচ্ছসিত হয়ে বলতেন "জরুর, জরুর"। ভদ্রলোক কিন্তু পিতৃদেবকে ভালবাসতেন খুব। বাবা অসুস্থ হলে, তার খাটে বসে গা হাত পর্য্যন্ত টিপে দেবার জন্য অস্থির হয়ে যেতেন।

কেশপ্রসাদ বাবুর পক্ষ সমর্থনে পিতৃদেব ও বিরোধী পক্ষে গার্থ সাহেব ছিলেন। পরে লর্ড সিংহ, প্রভৃতি সকলেই ছিলেন। এসময় আরার জনসাধারণ বাবাকে শিয়ালদাশ ব্যারিষ্টার, আর গার্থকে গাদ্ধাসাব ব্যারিষ্টার বলতো।

মনে আছে এ সময়েই হ্যেলীর ধুমকেতু উঠেছিল। কোন অশুভক্ষনে আমরা বাড়ী শুদ্ধ সবাই উঠে একদিন ভোর রাত্রে সেই ধুমকেতু দেখলাম জানিনা, পরের দিনই সে কথা শুনে আমাদের গোয়ালা ঠাকুরমাকে বলেছিল "মাজী কাহে আপলোক সবনে উয়ো দেখা-উ বহুত খারাপ, সব কুছ নাশ হো যাতা ও দেখনসে"। তার একথা শুনে ঠাকুরমা ভয়ই পেয়েছিলেন। আমরা এই নিয়ে হাসি তামাসা করতাম। সেই গোয়ালার কথা কতখানি সত্যি তা জানিনা, কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই ধুমকেতুর মতই মৃত্যু এলো আমাদের বাড়ী। কাকামণি স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য তাঁর মেজ বৌঠানের (প্রফুল্ল রঞ্জনের পত্নী) কাছে দার্জিলীং বেড়াতে গেলেন। খুড়ীমা তাঁর শিশুকন্যা গৌরী ও উমাকে নিয়ে সেখানে সণ্টহিল বাড়ীতে ছিলেন। মেজপিসিমাও তখন নাটোরের রাণী পিসিমার সঙ্গে দার্জিলীং-এই ছিলেন। কাকামণি যাবার অল্পকাল পরেই তাঁর অসুস্থতার বার্ত্তা বহন করে 'তার' এল। খবর পেয়ে বাবা সেদিনই ঠাকুরমাকে দার্জিলীং পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন ঠাকুরমার সে অস্থিরতা যেন এখনো চোখের সামনে দেখতে পাই, ঘুরে ফিরে শুধু আমাদের এসে জিজ্ঞেস করতেন; "বল্‌তো তোদের কাকামণি কেমন আছে"? 'সে ভাল হবে' বল্‌তো!" এর উত্তরে যখনি আমরা বলতাম "হ্যা, কাকামণি ভাল হয়ে যাবে" তক্ষুনি আমাদের

তিন ভাইবোনকে কত আদর করে বলতেন "যদি তোদের কাকামণি ভাল হয় তোদের আমি যা চাস তাই দেব"—যেন বিশ্ব সংসারের জিনিষ দিয়ে তিনি পুত্রের প্রাণ ভিক্ষা করছেন। হয়তো বা ভেবেছিলেন ছেলেপিলের একান্ত কামনা ভগবান শুনবেন। ঠাকুরমার সে আকুলতা দেখে আমাদের মন খুই খারাপ হয়ে গেল। ঠাকুরমা চলে যাবার দুদিন পরেই শোকবার্ত্তা বহন করে আবার 'তার' এসে আমাদের বাড়ী নিস্তব্ধ করে দিল।

পিতৃদেব পাথর হয়ে গেলেন, বুকফাটা করুণ স্বরে তিনি বলে উঠলেন "আজ ভোলাকে না নিয়ে ভগবান আমার ছেলেকে নিলেন না কেন? তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল কাকামণিকে দত্তক দেওয়া হয়েছিল বলেই তিনি অভিমান ভরে চলে গেলেন। এ বিয়োগ ব্যথা আমরণ তাঁর হৃদয়ে জাগ্রত ছিল।

মেজপিসিমা ঠাকুরমাকে ও খুড়ীমাকে নিয়ে কলিকাতা আসছেন জেনে, মা, দাদামণিও আমাদের নিয়ে কলিকাতা এলেন। মাত্র কমাস আগে রসারোডের যে বাড়ী ছোট পিসিমার বিবাহোৎসবে মুখর হয়েছিল সে বাড়ীতে অল্প ব্যবধানের মধ্যেই ঘন শোকের ছায়া নেমে এলো। ঠাকুরমা একরকম শয্যাশায়ী হলেন।

এর পর তিন বৎসর ঠাকুরমা বেঁচে ছিলেন, কিন্তু তা না বাঁচারই মত। উপর্য্যুপরি ১৯০৮, ১৯০৯ ও ১৯১০ সালে দৌহিত্রি, কন্যা ও পুত্র বিয়োগের কঠিন আঘাতে ঠাকুরমা একেবারে ভেঙ্গে পরলেন। কাকামণির মৃত্যুর পর তিনি বিশেষ করে বলেছিলেন যে, আমাদের বংশের কিন্তু কেউ যেন কখনো স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য দার্জিলীংএ না যায়। কিন্তু আশ্চর্য্য পিতৃদেব যখন জীর্ণদেহ নিয়ে স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য সেই দার্জিলীং-এই গেলেন, তখন নিয়তির বিধানে আমাদের কারুরই

একবারও ঠাকুরমার নিষেধাজ্ঞা মনে হয় নি। যে মা, ঠাকুরমার আদেশ জীবনে কখনো অমান্য করেননি, তাঁর পর্য্যন্ত ভুল হয়ে গেল। তাই লোকে বলে "নিয়তি কেন বাধ্যতে"।

সুদীর্ঘ এই ডুমরাওণ-রাজ মামলায় পিতৃদেবের কূট আইন বিশ্লেষণ জয়যুক্ত হলো। পথের ধুলো থেকে বাবু কেশপ্রসাদ মহারাজা কেশপ্রসাদ সিং হয়ে ডুমরাওণের রাজতক্তে বসবার অধিকার পেলেন। গদিতে বসে মহারাজা তাঁর পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা ভুলে গেলেও তাঁর আপীলের সময় এবং তাঁর অন্যান্য সব মোকর্দ্দমাতে তিনি বাবাকে নিযুক্ত করতেন। কলিকাতায় বাড়ী, গাড়ী পাওয়ার চেয়েও এটা বেশী হয়েছিল সন্দেহ নেই। আপীলে জয়যুক্ত হবার পর বিধিমতে কেশপ্রসাদ সিং ডুমরাওণের মহারাজা বলে গভর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক স্বীকৃত হলেন।

——০——

আমাদের বিলাত যাত্রা

১৯১১ সালে বেবীর শরীর খুব খারাপ হলো। আমরা তখন কলিকাতায় ছিলাম। ডাক্তার নীলরতন সরকার, বার্ড ও অন্যান্য সব ডাক্তারদের পরামর্শে বেবীকে চিকিৎসার্থ বিলেতে নিয়ে যাওয়া স্থির হলো। কথা হলো পূজাবকাশে কোর্ট বন্ধ হলে বাবা যাবেন; আর জুন মাসে আমাদের নিয়ে মা আগেই রওনা হবেন। পিতৃদেবের সঙ্গে বিলাত যাত্রার সহযাত্রী হয়েছিলেন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার লরেন্স জেনকিন্স্ ও জাষ্টিস্ উড্রফ্। আলীপুরের মামলার সূত্রেই জেন্কিন্স্ বাবার প্রকৃতির প্রকৃত পরিচয় পেয়েছিলেন। ইংরেজ শাসক হিসাবে যাই হোক না কেন জাতি হিসাবে গুণীর মর্য্যাদা দিতে কখনো কার্পণ্য করে না। এটা ইংরাজ চরিত্রের এক বিশিষ্ট গুণ। জেনকিন্স্ তাই ব্যক্তিগত ভাবে বাবাকে বন্ধুরূপেই গ্রহণ করেছিলেন। এই বিলাত যাত্রাকালেই 'সাগর সঙ্গীত' রচনার সূত্রপাত হয়। সাগরের শোভা দেখেই হৃদয়ে তিনি অসীমের সন্ধান পেয়েছিলেন; অনন্ত পারাবারের বিভিন্ন রূপ তাঁর হৃদয়ে যে রেখাপাত করেছিল, সেই রূপই বিকশিত হয়ে রূপায়িত হলো তাঁর 'সাগর সঙ্গীতে'।

আমরা লণ্ডনে পৌঁছাবার কিছু পরেই বাবা এসে পৌঁছালেন। বেবীর শারীরিক অসুস্থতার জন্য ডাক্তারের পরামর্শে আমরা সমুদ্র ভ্রমণের জন্যই কলিকাতা থেকে রওনা হয়েছিলাম।

বাবা এলেপর আমাদের আনন্দের আর সীমা রইল না—জানা কথাই ছিল যে মার মত বাবা কড়া শাসন করবেন না। তাঁর সঙ্গে

আমরা লণ্ডনে সব দেখে বেড়াতে লাগলাম। সেখানে থিয়েটারে সেক্সপিয়ারের সব নাটকই প্রায় দেখে ফেলেছিলাম। থিয়েটার দেখে এসেও বাবা 'হ্যামলেট' আবৃত্তি করতেন; সুন্দর ছিল তাঁর আবৃত্তি ভঙ্গী। এর মধ্যে একদিন রবীন্দ্রনাথ, রথেনষ্টাইন ও ইয়াট্‌কে নিয়ে আমাদের বাড়ী রাত্রে খেতে এসেছিলেন,—সস্ত্রীক প্রফেসার কেটল্‌ও উপস্থিত ছিলেন। আর্ট, কবিতা, সাহিত্য আলোচনার পর রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সোনার তরী' পড়ে শোনালেন। সে পড়া বোধ হয় জীবনেও ভুলতে পারব না। রাস্তার উপরেই নীচের তলায় আমাদের বসবার ঘর ছিল। রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বরে একে একে লোক জমা হতে লাগল বাইরে। এরপর রবীন্দ্রনাথ পড়লেন "হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে ময়ূরের মত নাচেরে"। তাঁর গলার স্বরে নৃত্যের ভঙ্গীই যেন প্রকাশ পেল। তা শুনে সকলেই মুগ্ধ হয়েছিলেন। তারপরই "মাতাল হয়ে পাতাল পানে ধাওয়া" পড়ে তিনি শেষ করলেন। সকলেই স্তব্ধ হয়ে গেলেন; সুরের রেশে ঘর ভরপূর। কবিগুরুর অনুরোধে বাবা 'সাগর সঙ্গীত'এর খাতা থেকে কিছু তাঁকে শোনালেন। 'সাগর সঙ্গীত' নিয়ে অনেকক্ষণ তাঁদের আলাপ-আলোচনা চলতে লাগলো। এই রকম কোরে কবিতার আলোচনায় একটি মধুর সন্ধ্যা কেটে গেল।

বাবার সঙ্গে বিখ্যাত অভিনেতা ফরবস্‌ রবার্টসন ও এফ, আর বেনসনের অভিনয় দেখবার সুযোগ হয়েছিল। বাবার বন্ধু শ্রীযুক্ত শ্রীশ বসু আমাদের ভাই-বোনেদের বিখ্যাত অভিনেত্রী স্যেরা বারণহার্ট্‌ এর অভিনয় দেখিয়েছিলেন। ফরাসী ভাষা না জানলেও অভিনয় প্রতিভা বুঝতে কষ্ট হলো না। থিয়েটারের পর মিঃ বসু আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন সেই বিখ্যাত অভিনেত্রীর সঙ্গে। বাবার কাছে এতদিন শুধু তাঁর নানারকম গল্পই শুনেছিলাম; এবার তাঁকে চাক্ষুস দেখে ধন্য হয়ে গেলাম।

এ রকম অনাবিল আমোদ আহ্লাদে বাবা মার সঙ্গে বিলাত প্রবাসের দিন ফুরিয়ে এলো। বাবা ফেরবার সময় বম্বে হয়ে কলিকাতা গেলেন। আমরা মাসাধিক কাল সমুদ্র ভ্রমণ করে কলিকাতা ফিরে এলাম।

(ooo ooo --)

রাজধানী পরিবর্ত্তন ও মুসৌরী ভ্রমণ

উপনিবেশক স্বায়ত্ব শাসন সম্পর্কে লর্ড স্ক্রুর পার্লামেণ্টে বক্তৃতা (১৯১২)

১৯১২ সালে বাবা যদিও প্রকাশ্য রাজনীতি ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভাবে আবির্ভূত হননি, কিন্তু দৈনন্দিন রাজনৈতিক আলোচনায় তিনি সর্ব্বদাই মগ্ন থাকিতেন। এই সময় ভারত সরকার কলিকাতা হতে দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তরের ব্যাপারে ভারতসচিব লর্ড স্ক্রুর কাছে একটি ডেসপ্যাচ পাঠান। তাতে প্রাদেশিক ব্যাপারে প্রাদেশিক স্বাধীনতার (Autonomous power in all provincial matters) কথা ছিল। এতে অনেকেই আশা করেছিলেন যে, ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত্ব শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু লর্ড স্ক্রু এই আশার মুলে কুঠারাঘাত করে হাউস অফ লর্ডস্‌ বল্লেন "কোন কোন ভারত-বাসী সাম্রাজ্যের অন্যান্য ভাগের মত স্বায়ত্ত্ব শাসন পাবার যে আশা করেন, তা হতে পারেনা, এবং সেই পথানুসরণে ভারতের কোন ভবিষ্যত আমি দেখি না। স্বায়ত্ত্ব শাসনের অধিকার ভারতকে' প্রদান করা সঙ্গত নয়"। এই বক্তৃতার পরে ১৯শে জুন তিনি বলেন, যে ভারতবাসীর পক্ষে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থেকে সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত্ব শাসন লাভ স্বপ্নমাত্র। ভারত সচিবের এই ঘোষণাতে নরম পন্থীরা একটুও বিচলিত হলেন না। বাবা খুবই ক্ষুব্ধ হলেন। তখন থেকেই ভারতের সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত্ব শাসনলাভের বাসনা মূলীভূত হয়েছিল তাঁর হৃদয়ে এবং সেই বাসনায়ই মুকুলিত হয়েছিল পরবর্ত্তী কালে "পূর্ণ স্বরাজে"।

এ বৎসর নূতন রাজধানীতে প্রবেশ করবার কালে লর্ড হার্ডিঞ্জের প্রতি বোমা নিক্ষিপ্ত হয় এবং তিনি উহাতে আহত হন। এই ব্যাপারে বৃটিশ রাজশক্তি আরো প্রচণ্ড রূপ ধারণ করলো। কিন্তু তাঁদের কঠোর শাসন নীতিতেই যে ভারতে বিপ্লব দ্বারা স্বাধীনতা লাভের আগ্রহ পুঞ্জিভূত হয়েছিল তা বলাই বাহুল্য।

এ বছরেই পূজাবকাশে বাবা মার সঙ্গে আমরা ভাই বোনেরা মুসৌরী শৈলে বেড়াতে গিয়েছিলাম। 'স্নোডন' বলে যে বাড়ীটিতে আমরা ছিলাম, তা একরকম পাহাড়ের চূড়ায় বললেই চলে। চারিদিকের মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যে মুসৌরী পাহাড় ভরপুর—রজত-শুভ্র বরফের পাহাড় পরিষ্কার দেখা যেত আমাদের বারান্দায় বসে। প্রবেশদ্বার থেকে বাড়ীতে পৌছাতে আমাদের প্রায় সাতটি বাঁক ঘুরে উঠতে হতো। বাবা আমাদের নিয়ে প্রায়ই বেড়াতেন। তিনি আমাদের সঙ্গে ব্যবহারে যেন আমাদেরি একজন হয়ে যেতেন। খুব উৎফুল্ল হয়ে বের হতাম আমরা তার সঙ্গে। একদিন উৎরাই নামবার আগে বাবা হঠাৎ আমার হাত ধরে "ওয়ান, টু, থ্রী" বলে' ব্যাপারটি বুঝবার আগেই এমন দৌড় দিলেন যে উৎরাইএর ঝোঁক সামলাতে না পেরে দুজনেই আছাড় খেয়ে পড়ে গেলাম। আমরা ব্যথার কথা ভুলে তাড়াতাড়ি গা ঝেড়ে উঠে চারিদিক দেখতে লাগলাম। কেননা প্রায় রোজ বিকেলেই, বি, এল, মিত্র (স্যার) ও হেমচন্দ্র মজুমদার ব্যারিষ্টার আসতেন বাবার সঙ্গে বেড়াতে যাবার জন্য। যা হোক উঠে সাবধান হয়ে মন্থর গতিতে আমরা উপনীত হলাম ক্যামেলস্ ব্যাক পাহাড়ের কাছে। আমাদের বাড়ী থেকে এর দূরত্ব বড় কম নয়—৩।৪ মাইল তো নিশ্চয়ই হবে,—তাহলেও বাবার সঙ্গে হাসি গল্পে, কথায় বার্ত্তায় কোথা দিয়ে সময় ও পথ ফুরিয়ে যেত বুঝতেই পারতাম না।

মুসৌরীর দিনগুলি বড় সুন্দর ভাবে কেটে যেত। কাকা

প্রফুল্লরঞ্জন এসে পরলেন আমাদের কাছে; খুড়ীমা মেয়েদের নিয়ে আগেই এসেছিলেন। সকালে বিকালে বেড়ান, সাহিত্যালোচনা, গান, বন্ধুবান্ধবের সমাগমে বাবা খুবই আনন্দ পেতেন।

একদিন পিতৃদেব জুনীয়ার ব্যারিষ্টার হেম মজুমদারকে নিয়ে পরলেন। তাঁর কাছে ছোট বড় ছিল না—সকলের সঙ্গেই সমভাবে আনন্দ করতেন তিনি। বাবা নিজে প্রত্যহ একপেগ ব্র্যাণ্ডী খেতেন—একদিন ধরলেন মিঃ মজুমদারকে। সে ভদ্রলোক কিছুতেই খাবেন না আর বাবাও ছাড়বেন না—নানারকমে ঠাট্টা বিদ্রূপে বেচারীকে জর্জ্জরিত করলেন শেষে বয়কে ডেকে বল্লেন "মজুমদার সাবকো লিয়ে একবোতল দুধ লে আও।" মা তখন মজুমদার সাহেবের পক্ষ নিয়ে বাবার উপর খুব রাগ করাতে বাবা মজুমদারকে বল্লেন "কি খেলে না তো? এর মজাও বুঝলেন না।" এইসব হাস্য পরিহাস যে অসহযোগ আন্দোলনের অন্যতম নেতা দেশবন্ধু করতেন তা বোধ হয় কেউ ভাবতেও পারে না। তাই এখন দেখি যে পিতৃদেব সর্ব্ব অবস্থায়ই তাঁর সহজাত "মানুষ" রূপটি আমাদের দেখিয়েছিলেন। ভোগ এবং ত্যাগ কোনটাতেই তাঁর "সবার উপরে মানুষ সত্য" রূপটি তিনি কখনও হারাননি।

তিনি সান্ধ্য সাহিত্য বৈঠকে প্রায়ই বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' ও 'কমলাকান্তের দপ্তর' পড়তেন। সন্ধ্যাবেলায় সাহিত্য বৈঠকে কাকা, বাবা, ও মা মিলে নানাবকম সাহিত্য নানারকমে আলোচনা করতেন। বাংলা সাহিত্যিকদের মধ্যে বাবা সবচেয়ে ভালবাসতেন বঙ্কিমচন্দ্রকে তাঁর 'আনন্দমঠ' ও 'কমলাকান্তের দপ্তর' বাবার খুব প্রিয় ছিল। তিনি যখনই পড়তেন, "আমি কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী তোমাদিগকে হিতবাক্য বলিতেছি। পিয়াদার শ্বশুর বাড়ী আছে তবু সপ্তদশ

অশ্বারোহী মাত্র যে জাতিকে জয় করিয়াছিল, তাহাদের পলিটিকস্ নাই। 'জয় রাধে কৃষ্ণ, ভিক্ষা দাওগো' ইহাই আমাদের পলিটিকস্, তদ্ভিন্ন অন্য পলিটিকস্ যে গাছে ফলে তাহার বীজ এদেশের মাটিতে লাগিবার সম্ভাবনা নাই।" তখনই বাবা বলতেন "বাঙ্গালী জাতির পরাধীনতার ব্যথা ও ধীক্কার এমন ভাবে আর কেউ লেখেনি। বঙ্কিমই মাতৃপূজামন্ত্রে জাতীয়তা-বোধকে জাগিয়ে তুলে চোখ খুলে দিয়েছেন।" একথা বলতে ভাবে তন্ময় হয়ে যেতেন তিনি। আমাদের মনে হতো বঙ্কিমচন্দ্রের এই বিচিত্রতম সৃষ্টি কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তীই যেন পিতৃরূপে সম্মুখে আসীন। এভাবে নিত্য সাহিত্যিক বৈঠকে আমরা এক একদিন এক এক রকম কথাবার্ত্তা শুনতাম। বিদেশী কবিদের মধ্যে ব্রাউনিং বেশী পড়া হতো। "The Last Ride Together" তার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। ব্রাউনিং সম্বন্ধে তার মত ছিল যে "ব্রাউনিং শুধু মুল চরিত্রের (বস্তুর) বিশদরূপ ফুটিয়ে ক্ষান্ত হতেন না, সে সঙ্গে তার পারিপার্শ্বিক বৈশিষ্ঠ্য, তা ব্যক্তিগতই হউক বা প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীই হউক, প্রত্যেকটি বিভিন্ন ভাব বা রূপ সমষ্টিগত হয়েই যেন তাঁর ভাবের অভিব্যক্তিতে ফুটে উঠতো"। "Ride, ride together, for ever ride" বলে যখন বাবা শেষ করতেন, ব্রাউনিং যেন মুর্ত্ত হয়ে উঠতেন আমাদের চোখের সামনে। আজ তাই ভাবি বাবা মা ভাগ্যিস্ বয়স হয়নি' বলে এই সব আলোচনা বা বৈঠকে আমাদের প্রবেশ নিষেধ করে দেন নি—জীবনের একটি পরম সম্পদ থেকেই তাহলে আমরা বঞ্চিত হতাম।

এই সময় পিতৃদেবের বিশিষ্ট বন্ধু এটর্ণী কুমার কৃষ্ণ দত্ত কলিকাতা থেকে মুসৌরী এলেন। কুমার কৃষ্ণ বাবু একদিন বাবাকে বল্লেন "ফেরবার সময় চলুন না একটু তীর্থ ভ্রমণ করে যাই। কাছেই হরিদ্বার, সেখান থেকে হৃষিকেশ আর লছমণঝোলা দেখে

যাওয়া যাবে"। কুমার বাবুর প্রস্তাবে বাবা তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেলেন।

হরিদ্বারে আমরা ডাক বাংলোতে উঠলাম। মা আর কুমার বাবু ঠিক করলেন গঙ্গাস্নান করে দেবদর্শনে যাবেন। বাবা বল্লেন, "তোমরা সব পূণ্যি কর, আমি এখান থেকেই হরির চরণ চিন্তা করব"। এই বলে তিনি সটান শুয়ে পরলেন। আমরা সকলে হিমশীতল জলে ডুব দিয়ে দেবদর্শন করলাম। মা গঙ্গায় ফুল ও দুধ দিয়ে আমরা উঠে পরলাম। পরদিন কনখল গেলাম। কনখলে দক্ষরাজ প্রাসাদে এলাম। এখানেই শিবহীন যজ্ঞ হয়েছিল, সে প্রকাণ্ড কুণ্ড দেখে মার কাছে শোনা কবিতা মনে হলো।

"দক্ষের নন্দিনী সতী
দক্ষের ভবন
দেখিতে অদ্ভুত যজ্ঞ
করেন গমন"॥

পিতৃদেব কেন যে হরিদ্বার এসেছিলেন জানিনা। গঙ্গাছাড়া তিনি আর কিছুই দেখবার আগ্রহই দেখালেন না। গঙ্গা আর হিমালয়ের রূপেই তিনি তন্ময় হলেন। "তিনরাত্রি না থাকলে তীর্থ-বাসের ফল হবেনা" বল্লেন কুমার বাবু। বাবা তিনরাত্রি থাকতে আর আপত্তি করলেন না। এখানকার গুরুকুল আশ্রম বাবার খুব ভাল লেগেছিল। পাঁচ বৎসরের ছেলে এখানে এসে চৌদ্দ বৎসরে শিক্ষা দীক্ষা শেষ করে আশ্রম থেকে বের হয়। তাদের দেখে মনে হচ্ছিল যেন রামায়ণের যুগের কোন মুনির আশ্রমে এসেছি।

ওখান থেকে হৃষিকেশের পথে রওনা হলাম। দুদিকে ঘন ঝোপ, সামনে বরাবর পাহাড় দেখতে দেখতে সরু পথ দিয়ে চলেছি

আমরা। রাস্তায় কত যাত্রীর সঙ্গেই না মুখোমুখি হলো—কেউ যাচ্ছে কেউ আসছে। দেখা হলেই "জয় গঙ্গামাইকি জয়, জয় হৃষিকেশজী কি জয়" বলে জয় ধ্বনি করে উঠছে। ঠিক সন্ধ্যে বেলা কলোচ্ছাসিনী গঙ্গাকে পাশে রেখে শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর ধ্বনির মধ্যে শুভ মঙ্গল আরতিক্ষণে আমরা হৃষিকেশে পৌছলাম। অপূর্ব্ব সুন্দর সে সন্ধ্যা চিরদিন স্মৃতির সাথী হয়ে থাকবে। ধূপ, ধূনা শঙ্খ, ঘণ্টা স্তবপাঠ এক স্বর্গীয় আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছিল।

এখানে আমরা কালী কমলী আলার ধর্ম্মশালায় উঠলাম। এখানে গঙ্গার আর এক রূপ। গঙ্গার অপরূপ শোভা বর্ণনায় আমি অক্ষম। শুভ্র-তুষার-কিরিটী হিমালয়, পাদদেশে কল-কল্লোলিনী গঙ্গা আনন্দে প্রবাহিতা ; জ্যোৎস্না প্লাবিতা রাত্রি, ধ্যান-মগ্ন গিরিরাজ হিমালয়ের ধ্যান ভাঙ্গাবার জন্যই যেন গঙ্গার সে আনন্দগীতি, এই শাশ্বত শোভা উপভোগের জন্য আমরা গঙ্গার কূলে এসে বসলাম। গঙ্গার দুই তীর ধরে এখানে ওখানে সন্ন্যাসীদের ধূনির আলো যেন পথ-হারাদের পথের সন্ধান জানিয়ে দিচ্ছে। কুলবধূরা সন্ধ্যা-প্রদীপ ভাসিয়ে প্রণাম করে ধীরে ধীরে ঘরে ফিরে যাচ্ছে। আমরা নির্ব্বাক হয়ে বসে সেই শোভা প্রাণ ভরে উপভোগ করতে লাগলাম। বাবার দিকে চেয়ে দেখলাম, তিনি যেন অসীমের সম্মুখে ধ্যানে সমাহিত! কুমার বাবুর নিমিলিত নেত্রের অশ্রুধারা ; মনে হলো সত্যই ধন্য হলাম এ পবিত্র তীর্থের পরশে।

পরদিন সকালে উত্থান-আরতির মঙ্গলবাদ্য শুনতে শুনতে গঙ্গাস্নানে গেলাম। দাঁতের ব্যথার জন্য বাবা গেলেন না। স্নান সেরে দূরে পাহাড়ের গায়ে গুহায় গুহায় ধ্যানরত সাধুদের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে এলাম, বাবা অসুস্থ হয়ে রয়েছেন

বলে। ঘরে ঢুকে আমরা থমকে দাঁড়ালাম ; দরজার কাছ থেকে দেখি, বাবা দরজার দিকে পিঠ করে গভীর ঘুমে মগ্ন। আর তাঁরই সামনে বিরাট এক শ্রীরামের অনুচর খুব মনোযোগ দিয়েই আমাদের ফলের ঝুড়ি নিঃশেষ করছে ; এবং মাঝে মাঝে হুএকটি জানালা দিয়ে তার স্বজাতীয়দের অতি উদার ভাবে বিলিয়ে দিচ্ছে। ভোম্বল পাহাড়ে-উঠা লাঠি হাতে দাঁড়াতেই বীর হনুমান পলায়ন করলেন।

খেতে দিতে গিয়ে মা দেখলেন হনুমান তাঁর প্রসাদী ছাড়া বিশেষ কিছুই রেখে যায়নি। বাবা অম্লান বদনে বললেন "ওকে আমি অনেকক্ষণ ধরেই দেখছিলাম। কিন্তু একথা বলতেই হবে ও মোটেই স্বার্থপর নয় ; ওর মত স্বজাতিপ্রীতি আমরা পেলে দেশ উদ্ধার হয়ে যাবে। একলা খেয়েও কিন্তু সন্তুষ্ট হলো না, ওর স্বজাতীয়দেরও তার ভাগ দিল। ওর এই একাত্মবোধই আমি এতক্ষণ লক্ষ্য করছিলাম।" বাবার এই একাত্মবোধের কথা মাকে কিছুমাত্র স্পর্শ করল না, তাঁর ভাবনা হলো বাবাকে এখন কি খেতে দেবেন।

হৃষিকেশের অপর পারে লছমনঝোলা। আমরা প্রসিদ্ধ সেই দোলায়মান ঝোলার উপর দিয়ে পার হতে লাগলাম, সঙ্গী হলো অসংখ্য বানর। ঝোলার মাঝপথে এসে গঙ্গার ভৈরব গর্জ্জনে আমরা একে অন্যের কথা শুনতে পাচ্ছিলাম না। এমন দৃশ্য কি জগতে আর কোথাও আছে! চারিদিকে গগনচুম্বী হিমালয়, তুষার-ধবলিত, আর পদপ্রান্তে কল-নাদিনী গঙ্গা। অপর পারে দাঁড়িয়ে গঙ্গার এই শোভা দেখবার বেলায় কুমার বাবু বললেন, "এখানে দাঁড়িয়ে খুব জোরে যদি কাউকে ডাক, দেখবে উত্তর

আসবে।" আমরা চীৎকার করে পাহাড়-বেষ্টিত এইস্থানে নিজেদের কণ্ঠস্বর শোনবার জন্য উৎসুক হলাম। মার কাছে শোনা কবিতাটি—

"ডাবেন জননী নিমাই নিমাই
প্রতিধ্বনি বলে নাই, নাই, নাই"॥

মনে পড়ল। প্রাণপাত করে ডাকলাম, "নিমাই, নিমাই"! উত্তর এলো' "নাই, নাই"। ভোম্বল বলল, "আচ্ছা দিদি, আমাদের নাই বলার কি দরকার? তার চেয়ে বলিনা কেন "নিমাই কাছে"। উত্তর এলো, "আছে"। সত্যই সে প্রতিধ্বনি যেন মনের কথা বলেই আমাদের সান্ত্বনা দিল। বাবা বল্লেন "নিমাই আছে।" তিনি যে আমাদের এ খেলা নিবিষ্ট হয়ে দেখছিলেন, আমরা লক্ষ্যই করি নি।

এখন ভাবি সত্যিই কি সেদিন নিমাই কাছেই ছিলেন আমাদের? যথাসময়ে আমরা,

"ছাড়ি গিরিনদী, ছাড়ি তীর্থ আজ
চলিলাম এবে হে দেবাদিরাজ"॥

বলে' দেবাদিদেবের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে রওনা হলাম। হৃষিকেশ, লছমণঝোলা ভ্রমণের মধুর চিত্র অঙ্কিত হয়ে রইল মনের মণি-কোঠায়। স্মৃতিপটে আঁকা সে চিত্র কোন দিন মুছে যাবার নয়।

—(:)(—(:)(—

মাতৃবিয়োগ

(১৯১৩)

পূজাবকাশেই আমরা একান্তভাবে পিতৃদেবকে আমাদের মধ্যে পেতাম। কলিকাতায় তাঁর কর্ম্মময় জীবনে সেটা প্রায়ই সম্ভবপর হয়ে উঠতো না। তাঁর কাজের অবসরে এবং আমাদের স্কুল ও ভিন্ন ভিন্ন মাষ্টার মশাইদের ফাঁকে যেটুকু সঙ্গ পেতাম, তার জন্যই আমরা উৎসুক হয়ে থাকতাম। প্রায় প্রতিদিন রাত্রেই খাবার পর তাঁর সঙ্গে আমাদের প্রাণ খুলে কথাবার্ত্তা বলার সুযোগ হতো। কাজ করে উপরে আসতে যদি তাঁর রাত্রি বেশীও হতো, আমরা বসে থাকতাম উদ্‌গ্রীব হয়ে, তাঁর সঙ্গ-সুখের আশায়। বাবার কাছে এসময় কতরকমের কথা-বার্ত্তাই না আমরা শুনতাম। একবারও মনে হতোনা যে একজন বিচক্ষণ আইনজ্ঞ আমাদের মধ্যে বসে আছেন। কোনদিন তাঁর কাছে আইনের কোন কথা আমরা শুনিনি। শুধু মাঝে মাঝে বলতেন, "এ ব্যবসায় আমার আর ভাল লাগে না, সত্য মিথ্যার সাগর-সঙ্গমে এমন নিত্যস্নান আর আমার পোষাচ্ছে না।"

ঠাকুরমার ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য এসময় তিনি খুবই ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছিলেন। সন্ধ্যার পর বাবার ঘরে উঠে আসতে ঠাকুরমার কষ্ট হবে মনে করে আমাদের সান্ধ্যবৈঠক ঠাকুরমার ঘরেই বসতো।

১৯১৩ সালে ১৪ই মে পিতৃদেব সমস্ত ঋণ পরিশোধ করে "দেউলিয়া" নাম থেকে নিষ্কৃতি লাভ করেন। এই প্রসঙ্গে বিচারপতি ফ্লেচার বলেছিলেন, "কোন ব্যক্তি দেউলিয়া হবার পর স্ব-ইচ্ছায় সেই

ঋণ স্বীকার করে' তা পরিশোধ করেন, এ দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসে আমি প্রথম দেখলাম।" ঋণমুক্ত হয়ে এতদিন পরে তিনি শান্তি পেলেন। মনে পড়ে সেদিন ঠাকুরমা, দাদামণির গৌরবদীপ্ত আনন্দপূর্ণ মূর্ত্তির কথা। আনন্দাশ্রুতে তাদের বুক ভেসে গেল। কোর্ট থেকে এসে যখন বাবা তাঁদের প্রণাম করলেন, ঠাকুরমা বাবাকে বুকে জড়িয়ে ধরে নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করলেন, বল্লেন, "জন্ম জন্ম যেন তোরই মা হই।" পরের দিন প্রত্যুষে যখন এই ঋণ পরিশোধের বার্ত্তা সমস্ত কাগজে প্রকাশিত হলো, ঠাকুরমা আমাদের ডেকে বললেন, "চিত্ত'র নামে কি লিখেছে পড়তো?" পড়া কাগজখানি শতবার পড়ে ও শুনেও পুত্রগর্ব্বে গর্ব্বিতা মার যেন তৃপ্তি হতোনা। বাবার এই ঋণ-শোধ ব্যাপার আজকের পৃথিবীতে সত্যই বিরল। এই প্রসঙ্গে আর একজনের কথা মনে পড়ে, তিনি হচ্ছেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পিতৃঋণ পরিশোধ করে তিনিও দৃষ্টান্ত রেখেছিলেন।

এরপর ঠাকুরমা বাবাকে একদিন বল্লেন, "বৌ এতদিন কোন গহনা পরেনি— এবার তারজন্য কিছু নিয়ে আয়।" বাবা মাকে একটি হীরার আংটি দিয়েছিলেন। আমরা মাকে রাগাবার জন্য বল্লাম "এবার কিন্তু বাবা পনের টাকার আংটি দেননি— সেটা মনে রেখ।" আমরা দু'বোন ও সমবয়সী পিসতুতো বোনেরা সোনার চুড়ী ও বালা পেয়েছিলাম। ঝুনু বাবার গানে সুর দিয়ে সুন্দর একটা অর্গান্ পেয়েছিল। আমরা অবশ্য সকলেই অবাধে ওটাতে হাত চালাতাম।

সান্ধ্যবৈঠকের কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর কথা মনে হয়। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর সঙ্গে আমাদের পরিবারের বিশেষ প্রীতির সম্পর্ক ছিল। পরবর্ত্তীকালে বাবা নিজ সম্পাদিত 'নারায়ণ' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের কঠোর

সমালোচনা করলেও, সৌহার্দ্দের অভাব তাঁদের কখনো ঘটেনি। সমালোচনার সম্মুখীন হবার মত ঔদার্য্য উভয় পক্ষেরই ছিল। একথা বলা প্রয়োজন মনে করলাম এই জন্য যে, আমাদের দেশে তখনকার দিনে স্বনামধন্য সাহিত্যিকরা সমালোচনাকে সাহিত্য বলে গ্রহণ তো করতেনই না বরং অখ্যাতিই মনে করে ক্রুদ্ধ হতেন।

রসারোডের বাড়ীতে সঙ্গীত ও সাহিত্যের কত বৈঠকই না আমরা দেখেছি। রবীন্দ্রনাথ ও মেজ পিসিমা যখন একসঙ্গে, নাটোরের স্বর্গীয় মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ রায়ের পাখোয়াজ সঙ্গতের সঙ্গে গান করতেন, তখন এক অপূর্ব ভাবের উদয় হতো সে গান শেষ হলে তার রেশ ঘরের কাচের দরজা জানলায় ঝম্ ঝম্ করতো। সরলা দেবী কখনো কখনো গানের সঙ্গে অর্গান্ বাজাতেন। ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, প্রিয়ম্বদা দেবীও মাঝে মাঝে উপস্থিত থাকতেন। সেই সব সঙ্গীত ও কাব্য আলোচনার কথা এখন স্বপ্ন বলেই মনে হয়।

পূর্ব্বেই বলেছি পিতৃদেব সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। শুধু অনুরাগী বললে ভুল হবে সাহিত্য সম্রাটের মাতৃ-মন্ত্রে নিজেকে তিনি দীক্ষিত করে ছিলেন। কবি হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের—

"কৃষ্ণবর্ণ বলি তুচ্ছ নাহি করো।
নহে তুচ্ছ কীট এদের অন্তর"।

যখন তিনি পড়তেন তখন মনে হতো ঘৃণায়, রাগে, দুঃখেই তিনি কাঁদছেন। নবীন চন্দ্র সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ' যখন আবৃত্তি করতেন— তখন সিরাজের দুঃখে আমাদের চোখে জল আসতো। তাঁর কবিতাতেও বাবা বিশেষ আনন্দ পেতেন।

বঙ্কিম-সাহিত্য এবং বৈষ্ণব পদাবলীতেই পিতৃদেব খুবই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এবং এর ভেতর দিয়েই তাঁর পরবর্ত্তী জীবন

ফুঠে উঠেছিল। পাশ্চাত্য কবি সেক্সপীয়ার, ব্রাউনিং, কীটস্, শেলী, সুইনবার্ণ, ওয়ার্ডস ওয়ার্থের কবিতা তিনি খুব পছন্দ করতেন। টমাস হুডের "ব্রীজ অফ সাইজ্" এবং এমারসনের 'ফ্রেণ্ডসিপ' প্রবন্ধটি তার মর্ম্ম স্পর্শ করেছিল।

আমরা ভাই বোনেরা তাঁর পড়া খুব উপভোগ করতাম। অর্থ সব তখন না বুঝলেও তাঁর বিশেষ পড়ার ভঙ্গীটি, প্রকাশ-ভঙ্গী বোঝাবার শক্তির মধ্যে মাদকতা ছিল। তিনি যখন 'হ্যামলেট' পড়তেন, মনে হতো বুঝিবা পাগল হয়ে গিয়েছেন। 'ব্রীজ অফ সাইজ' পড়তে পড়তে দুঃখে ভেঙ্গে মুসড়ে পরতেন, আবার 'ওয়ান ওয়ার্ড মোর' যখন পড়তেন, বিশ্বের সমস্ত ব্যাকুলতা যেন তাঁর মধ্যে মূর্ত্ত হয়ে উঠতো। কিন্তু সব কিছু সত্ত্বেও তিনি নিজেকে হারিয়ে ফেলতেন 'আনন্দ মঠে'। বারে বারে শুনেছি বাবারই মুখে, তবু যেন শোনার সে অতৃপ্ত আকাঙ্খা আজও জেগে রয়েছে।

পিতৃদেবের শোবার ঘরের মধ্যেই এক পাশে একটি বসবার জায়গার মত ছিল। আমাদের নিয়ে বাবা এখানেই পড়াশোনা ও পারিবারিক সাহিত্যের আসর বসাতেন। তাঁর পড়বার কোন বাঁধাধরা নিয়ম ছিলনা, খেয়ালমত যেদিন যা খুসী তাই পড়তেন। আমরা সাহিত্য, কাব্য ও সঙ্গীতের দিকে তাঁর এই পড়া ও সান্ধ্য বৈঠক দ্বারাই আকৃষ্ট হয়েছিলাম।

এই সব পারিবারিক সম্মিলনে শুধুই যে সাহিত্য ও কাব্য আলোচনাই হতো তা নয়, কত রকম হাস্য কৌতুকই যে করতেন তা বলে শেষ করা যায় না। জীবনটাকে সকলে মিলে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করাই তাঁর লক্ষ্য ছিল।

কচুর ডাঁটা দিয়ে কান চুলকান বাবার একটা অভ্যাস ছিল। কান চুলকাতে চুলকাতে তিনি একটি শ্লোক বলতেন।

"কানে কচু নাকে তেল,
তার বাড়ী বৈদ্য না গেল ॥"

বাঁ কানে তিনি একেবারেই শুনতে পেতেন না। একদিন সাহিত্য বৈঠকে বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর একটি লেখা পড়েছিলেন, তা শুনতে শুনতে বাবা আরাম করে ডান কানে কচুর ডাটার স্পর্শ অনুভব করছিলেন। বিপিনবাবুও খুব ভাবের সঙ্গে পড়ে যাচ্চেন। আমরা বুঝেছিলাম যে বাবা কেমন শুনছেন। কোন সমর্থন না পেয়েই বোধ করি পড়া থামিয়ে বিপিনবাবু বল্লেন, "বুঝেছ চিত্ত ?" বাবা কচুর ডগার স্পর্শে নির্ব্বাক, আমরা সজোরে হেসে উঠলাম। আমাদের অবস্থা দেখে কান হতে কচুর ডগা নামিয়ে বাবা বল্লেন, "কেন, সব চুপ কেন ?" ব্যাপার না বুঝে বিপিনবাবু তো রেগেই আগুন; বল্লেন "আমার লেখা কি এতই নিকৃষ্ট যে তোমার কানেই যাচ্ছে না ?" ব্যাপারটি তখন বুঝে বাবা কচুর ডগা দেখিয়ে বল্লেন "এই প্রকৃষ্ট ডাঁটাটিই সব অনর্থের মূল।" বিপিনবাবু তখনই জানতে পারলেন তাঁর কানের অবস্থা। এরপর যখনই পড়তেন প্রথমেই তিনি দেখে নিতেন বাবার কোন কানে কচুর ডগা রয়েছে। একহাতে কচুর ডাঁটা আর এক হাতে হুকোঁর নল, এ না থাকলে যেন বাবাকে মানাতোই না।

পিতৃদেব খুব সঙ্গীত-প্রিয় ছিলেন। রাগপ্রধান-সঙ্গীত বিশেষ করে 'মেঘমল্লার' সুর তিনি খুব পছন্দ করতেন। তাঁর এ সুরের পিপাসা মিটেছিল ভোম্বলের বউ সুজাতা এলে। বাংলার কীর্ত্তন তাঁর প্রাণ স্পর্শ করেছিল। সর্ব্বদাই বলতেন "এমন মনপ্রাণ আকুল-করা গান আর নেই।" তাঁর জীবিত-কালে 'রং'এর কীর্ত্তনই আমি করতাম। "মরিব মরিব সখি, নিশ্চয় মরিব", দম-দেওয়া গ্রামোফোনের মতই গাইতে হতো। 'কেবা শুনাইল শ্যাম নাম' শুনতে শুনতে চোখের জলে তাঁর বুক ভেসে যেত। গানের পর

বাংলার কবি, বাঙ্গালীর কবি চণ্ডীদাসের উদ্দেশ্যে তিনি প্রণাম জানাতেন। ঠাকুরমার শ্রাদ্ধের সময় "মাধব বহুত মিনতি করু তোয়" গানটি শুনে তিনি মোহিত হয়েছিলেন। পরবর্ত্তী কালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় যখন তিনি ক্লান্ত হয়ে আসতেন—ঘরের সব বাতি নিবিয়ে এ গানটি তাঁকে শোনাতে হতো। তাঁর মৃত্যুর পর যখন বিশুদ্ধ কীর্ত্তনের সুরে ৺নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী মহাশয়ের কাছে এ গানটি শিখেছিলাম,—তখন এ সুরে বাবাকে শোনাতে পারিনি বলে, খুবই দুঃখ হয়েছিল। পিতৃদেবের মৃত্যুর পর হতে আজ পর্য্যন্ত নানা স্মৃতি-সভাতে এ গানটি গাইতে গাইতে বাবার কথা মনে হলে চোখ জলে ভরে আসে। ব্রজমাধুরী সঙ্ঘের কীর্ত্তন তাকে না শোনাতে পারার দুঃখ আমার মরলেও যাবে না।

১০ই নভেম্বর, ১৯১৩ সালে রাস-পূর্ণিমার দিন ঠাকুরমা পুরুলিয়ায় দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুর ৮।৯ মাস পূর্ব্বে তাঁকে পুরুলিয়ায় নিয়ে যাওয়া হয়। হাইকোর্টের সারা বৎসরের অত্যধিক পরিশ্রমে বাবার সবচেয়ে উপকার হতো সাগর ভ্রমণে। এবার বিলাত যেতে বাবা ইতস্ততঃ করলেন ঠাকুরমার শারীরিক অবস্থার জন্য। ঠাকুরমা জোর করে লিখিয়েই বাবাকে বিলেত পাঠালেন। তিনি বলতেন, "ওর জীবনটা গেল, আমরা সারাজীবন ওকে শুধু কষ্টই দিলাম; শরীর সুস্থ করে ও ফিরে আসুক।" বিলেত যাবার সময় বাবা পুরুলিয়াতে ঠাকুরমাকে দেখে গেলেন। এই দেখাই তাঁর শেষ দেখা।

ঠাকুরমার শরীরের অবস্থা শুনে কলিকাতায় যে যেখানে ছিল, পুরুলিয়ায় এসে জমা হতে লাগল। বাবার ফিরে আসার দিন দশেক আগে ঠাকুরমার অবস্থা আরো খারাপের দিকে গেল। কিন্তু পিতৃদেবকে দেখবার আগ্রহে তিনি বলতেন "ওর না আসা পর্য্যন্ত আমাকে থাকতেই হবে।"

১২ই নভেম্বর—ঠাকুরমার মৃত্যুর আগের দিন তিনি তাঁর তিপ্পান্ন বৎসরের বিবাহিত জীবনের সঙ্গীকে ডাকলেন—শেষ বিদায় নিতে। দাদামণিকে ডেকে ঠাকুরমা অশ্রুসজল চোখে বল্লেন, "তোমাকে অনেক যন্ত্রণা দিয়েছি—অনেক কটু কথা বলেছি, তার জন্য তুমি আমাকে ক্ষমা করো কিন্তু?" পায়ের ধূলো নিয়ে বল্লেন, "যাবার সময় এই কামনা নিয়েই যাচ্ছি যে যদি আবার জন্ম হয় তোমাকেই যেন স্বামী বলে পাই, আর—আর—চিত্তকেই যেন ছেলে বলে পাই।"

পিতৃদেবকে দেখবার আকুল আগ্রহ নিয়েই ১৩ই নভেম্বর ঠাকুরমা বার বার বাবার কথা বলতে লাগলেন। তিনি মনে করে ছিলেন বাবা এসেছেন কিন্তু দুর্ব্বল প্রাণে সহ্য করতে পারবেন না বলেই হয়তো সকলে তাঁকে সামনে আসতে দিচ্ছেন না। তাই সকলের কাছে অনুনয় করতে লাগলেন "আমার কিছু হবে না, চিত্তকে ঘরে আসতে দাও।" কিছুতেই তিনি বিশ্বাস করলেন না যে বাবা এসে পোঁছান নি। রাত্রে আবার বল্লেন, "চিত্ত এসেছে আমি জানি, আমায় 'মা' বলে ডাকল আমি শুনেছি।" তারপর তাঁর বালিশের নীচে সযত্নে রক্ষিত, বাবার দেওয়া উপহার 'সাগর সঙ্গীত' খানি নিয়ে পরম স্নেহভরে হাত বুলিয়ে দিয়ে তিনি যেন বাবাকেই আদর করলেন। তারপর আমার হাতখানি বুকের উপর রেখে, 'সাগর সঙ্গীত' খানি দিয়ে বল্লেন "চিত্তকে তোর হাতেই দিয়ে গেলাম।" চোখের জলে ভেসে তাঁর শেষ স্নেহের দান আমি বুকে জড়িয়ে ধরলাম। ১৩ই নভেম্বর ঠাকুরমা ব্রাহ্মমুহুর্ত্তে নারীর চির-বাঞ্ছিত সতী, স্বর্গলোকে চলে গেলেন। দাদামণি প্রাণহীন মর্ম্মর মূর্ত্তির মত তাঁর জীবন-সঙ্গিনীর শিয়রে বসে রইলেন।

আমাদের বাড়ীর ভিতরেই বাম পার্শ্বের ফলের বাগানের একাংশে তাঁর চিতাশয্যা রচিত হলো। চন্দন কাঠে সুসজ্জিত চিতার উপর ঠাকুরমার পুণ্যদেহ স্থাপন করে ছোটদাদু কাকাকে দিয়ে মুখাগ্নি করালেন। এই প্রথম শ্মশানের অভিজ্ঞতা হলো আমাদের। গগন-স্পর্শী লেলিহান সে অগ্নিশিখার সিঁড়ি দিয়েই যেন ঠাকুরমা স্বর্গে উঠে গেলেন।

পিতৃদেবকে নিয়ে জাহাজ এই ১৩ই নভেম্বর বোম্বাই এসে পৌছায়। তাঁকে ঠাকুরমার মৃত্যু খবর না দিয়ে সোজা পুরুলিয়া আসবার জন্য 'তার' করা হলো। কথা হলো, ছোটদাদু আসানসোল গিয়ে বাবার সঙ্গে আসবেন। ছোটদাদু ভাবছিলেন কেমন করে এ দুঃসংবাদ বাবাকে দেবেন, কিন্তু আসানসোলে ছোটদাদুকে দেখেই বাবা বলে উঠলেন "আমি জানি—মা নেই"। পরে বাবা বলেছিলেন যে ঠাকুরমার জন্য তার মন খুব অস্থির হয়েছিল—১৩ই তারিখে। জাহাজে ভোরবেলা তন্দ্রার মধ্যে বাবার যেন মনে হলো ঠাকুরমা এসে বল্লেন "চিত্ত"—সঙ্গে সঙ্গেই বাবা উঠে বসলেন—এবং তখনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর মা তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে গেলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে ঠাকুরমার অন্তরের আকুলতার তরঙ্গ কি বাবার অন্তরে আছড়ে পরেছিল?

১৫ই নভেম্বর পিতৃদেব পুরুলিয়া এসে পৌছালেন। বাড়ী-পৌছেই বাবা দাদামণির কাছে এসে দাঁড়ালেন। পিতাপুত্র দুজনেই স্থির—বাবা জিজ্ঞেস করলেন, "মা কোথায়?" বলেই আবেগভরে কেঁদে ফেল্লেন। ছোটদাদু বাবাকে ঠাকুরমার চিতার কাছে নিয়ে গেলেন। চিতা পার্শ্বে গিয়ে প্রথমেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন "মার পা কোন দিকে ছিল"? সে দিক দেখিয়ে দেওয়াতে বাবা মাটির উপর পরে চোখের জলে ভেসে গেলেন। একবার শুধু বল্লেন "আমার মা।"

১৩ দিনের দিন পুরুলিয়াতেই ঠাকুরমার আদ্য শ্রাদ্ধ বাবা বৈদিকমতে করলেন। এই সময় রামদাস বাবাজীর নাম কীর্ত্তন আমরা প্রথম শুনি। পয়সা নিয়ে কীর্ত্তন তিনি করতেন না। বাবার অন্তরের আকুলতা দেখেই তিনি আমাদের বাড়ী এসেছিলেন। এমন ভক্তিরসাপ্লুত নাম কীর্ত্তন আর কখনো আগে শুনিনি, কখনো শুনব কি না জানিনা। তাঁর মুখেই প্রথম "মাধব বহুত মিনতি করু তোয়" শুনেছিলুম। এ পদটি বাবার বিশেষ প্রিয় ছিল।

ঠাকুরমার শ্রাদ্ধোপলক্ষে দাদামণি সেখানকার গরীব দুঃখীদের খাওয়াতে চাইলেন। ঠাকুরমা এদের বড় ভালবাসতেন, প্রতিদিনই তিনি এরকম সেখানকার বহু দীনদুঃখীকে যত্ন করে খাওয়াতেন। তাই দাদামণির তাদের কথাই প্রথম মনে হয়েছিল। বাবা দাদামণির সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হলেন। এই ব্যাপার নিয়ে বাবা একদিন সেখানকার একজন ভদ্রলোকের উপর বেশ বিরক্তই হয়েছিলেন। ভদ্রলোক এসব লোকেদের খাওয়ানর কথা শুনে বলেছিলেন "এসব গরীবদের প্রচুর পরিমাণে চিড়া-দই দিলেই যথেষ্ট—ওরা এই পেলেই বর্ত্তে যাবে"। বাবা বল্লেন, "ওঃ তাই নাকি! আপনার বাড়ীতে দেখেছি নিমন্ত্রণ হলে আমার যাওয়া হবেনা, লোকেদের বর্ত্তে যাবার জন্যই তাহলে খাওয়ান নাকি? আমি লোক নিমন্ত্রণ করলে নিজে বর্ত্তে যাই তাঁরা দয়া করে এলে। নিমন্ত্রণ করে তাঁদের বর্ত্তে যাবার জন্য একেবারেই ডাকি না। আমার মায়ের আত্মার তৃপ্তির জন্য এদের আমি খেতে বলব এবং মা যা দিয়ে খাইয়ে তৃপ্ত হতেন, এদের সে ভাবে খাওয়াবার ব্যবস্থাই আমি করতে চাই"। ভদ্রলোক খুব অপ্রস্তুত হলেন বলাই বাহুল্য। ঠাকুরমার আত্মার তৃপ্তির জন্য বাবা সেদিন গরীব দুঃখীদের তৃপ্ত করেই খাইয়েছিলেন এবং নিজেও—পরম তৃপ্ত

হয়েছিলেন তাদের সঙ্গে একসঙ্গে বসে খেয়ে। সেদিন মানুষ চিত্তরঞ্জন দেশের মানুষের সঙ্গে এক হয়ে মিশে গিয়েছিলেন। "সবার উপরে মানুষ সত্য" উপলব্ধি করলাম আমরা।

(—:::—)

পিতৃ-বিয়োগ (১৯১৪)

ঠাকুরমার মৃত্যুর পর পুরুলিয়া থেকে তাঁর শ্রাদ্ধের পরেই সকলে কলিকাতা চলে এলাম। আমরা কলিকাতা আসবার মাস খানেক আগে আমার স্বামী বাবার জুনীয়ার হয়ে তাঁর কাছে কাজ শিখ্‌তে এলেন। ইনি ছাড়া বাবার আরো ৪।৫ জন জুনীয়ার ছিল। সে সময় বিকালে আমরা টেনিস খেলতাম্‌। বাবাও মাঝে মাঝে খেলতেন। বাবা একদিন আমার স্বামীকে নিয়ে টেনিস কোর্টে উপস্থিত হলেন। আরও অনেক জুনীয়ার ব্যারিষ্টার ও আমাদের বান্ধবীরাও খেলতে আসতো। দাদামণি উপরে তাঁর শোবার ঘরের জানলার কাছে বসে খেলা দেখতেন, আর আমি উপরে এলেই বিয়ের সম্ভাবনা নিয়ে ঠাট্টা করতেন। দাদামণির মৃত্যুর পরই আমাদের বিয়ে স্থির হলেও রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের পিতামাতা তাঁদের একমাত্র পুত্রের এই অসবর্ণ-বিবাহ সম্বন্ধ অনুমোদন করলেন না। তাই তাঁদের অনুমতির জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল ১৯১৬ সাল পর্য্যন্ত। ১৯১৪ সাল ২১শে জুন, বেবীর জন্মদিনের দিন, দাদামণি জন্মের মত আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন।

•

কলিকাতা এসেই দাদামণি শয্যাশায়ী হলেন। শুয়ে শুয়ে তিনি কেবল ঠাকুরমার কথা বলতেন। দাদামণির চিকিৎসায় যাতে অর্থের অপ্রতুল না হয়—সেই জন্য বাবা উপার্জ্জনে মন প্রাণ ঢেলে দিলেন। শুধু বলতেন, "বাবা যেন শেষ সময় দৈহিক সুখ থেকে বঞ্চিত না হন—এটুকু স্বাচ্ছন্দ্য তাকে যেন দিতে পারি।" তাই পর্য্যাপ্ত পারিশ্রমিকে এসময় জটিল মোকর্দ্দমা নিয়ে তিনি মফঃস্বলে চলে গেলেন। "বাবার প্রতি যেমন আমার কর্ত্তব্য রয়েছে, তেমনি যাদের কাজ নিয়ে যাচ্ছি তাদের প্রতিও আমার কর্ত্তব্য কম নেই—তাই এর

মধ্যে বাবার যদি কিছু হয়েও যায়, তবুও আমাকে তোমরা কখনো খবর দিও না—তাহলে আমার ওখানকার কর্ত্তব্যের অবহেলা হবে।" ঠাকুরমার মৃত্যু সময় বাবা তাঁকে দেখতে পাননি, তাই করুণাময় ঠাকুর বাবাকে সে দুঃখের থেকে এবার নিষ্কৃতি দিলেন। দাদামণির মৃত্যুর আগেই তিনি কাজ শেষ করে ফিরে আসতে পেরেছিলেন।

দাদামণিকে আমরা পালা করে দিন রাত্রি সেবা করতাম। মৃত্যুর ২।৩ দিন আগে গভীর রাত্রে একদিন বলে উঠলেন "দরজার চৌকাঠে বসে আছ কেন? ভিতরে এসে বোস না।" আমায় বল্লেন পরে "তোর ঠাকুরমা দরজার গোড়ায় বসে আছে।" মা ও মেজপিসিমাকেও একথা তিনি একদিন বলেছিলেন। আমরা সকলেই বুঝলাম ঠাকুরমা তাঁকে নিতে এসেছেন। নিতে সত্যই কেউ আসে কিনা জানিনা—তবে আমাদের বাড়ীতে যত মৃত্যু হয়েছে—প্রত্যেকেই কিন্তু পরলোক-গত কারো না কারো কথা বলেই চলে গিয়েছেন দেখেছি। এ রহস্য নিজের মৃত্যু না হওয়া পর্য্যন্ত অজ্ঞাতই থেকে যাবে।

অসহ্য রোগ যন্ত্রণা শান্তভাবে গ্রহণ করে, ২১শে জুন বাবার ক্লার্ক ললিতবাবুর বুকে মাথা রেখে দাদামণি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

ললিতবাবুর বুকে মাথা রেখে দাদামণির প্রাণত্যাগের কথা বাবা কোনদিনই ভোলেননি। প্রায়ই তাঁকে বলতেন "ললিত, আমি বাবার ছেলে সত্য—কিন্তু বাবার যে শুশ্রূষা তুমি করেছ—তার একশো ভাগের এক ভাগও আমি করতে পারিনি—একথা চিরদিন আমার মনে থাকবে।"

বাবা যে আত্মীয়, অনাত্মীয়, ধনী, দরিদ্রের কত প্রিয় ছিলেন, দাদামণির শবযাত্রায় তা বুঝতে পারলাম। রসারোডের বাড়ী জনসমাগমে পূর্ণ হোল। দাদামণির মৃত্যুতেই আমরা বাড়ীর মেয়েরা প্রথম কেওড়াতলার শ্মশান দেখি। কালীমোহন, দুর্গামোহনের চিতাতেই তাঁকে দাহ করা হলো।

ঠাকুরমার মৃত্যুর পর আমাদের বাড়ীতে পদাবলীর কীর্ত্তন প্রায়ই হতো। প্রত্যেক শুক্র বা শনিবার বিখ্যাত কীর্ত্তনীয়াদের সুমধুর কীর্ত্তনে মুগ্ধ হতাম। দাদামণির মৃত্যুর পর বাবা সে রসে ডুবে গেলেন বল্লেও হয়। শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত ১৩ দিনে অষ্টপ্রহর কীর্ত্তন-রোলে রসারোডের বাড়ী মুখরিত হয়ে উঠেছিল। গণেশ কীর্ত্তনীয়ার গান বাবা খুব পছন্দ করতেন; বলতেন, "কীর্ত্তনের আখরে গণেশের কবিত্ব প্রতিভা অতুলনীয়।" কণ্ঠস্বরও তার অতি সুমিষ্ট ছিল এবং ভক্তিভাব প্রকট হয়ে উঠতো তাঁর কীর্ত্তনে। তখনকার দিনের বিখ্যাত কীর্ত্তন-গায়িকা পান্নাবাইর ঢপ কীর্ত্তনও বাবার ভাল লাগতো। পান্নাবাইর কীর্ত্তন বাবা খুব পছন্দ করতেন; অপূর্ব্ব ছিল তাঁর কণ্ঠস্বর এবং ভাবে বিভোর হয়েই গাইতেন তিনি। কীর্ত্তন-বিশেষজ্ঞ ময়নাডালের রাসবিহারী মিত্র ঠাকুর ও অন্যতম মনোহরসাহী কীর্ত্তন-বিশারদ অবধূত বন্দোপাধ্যায়ের গানও বাবা শুনেছিলেন। কলিকাতার বিখ্যাত কীর্ত্তন গায়িকাদের কীর্ত্তন তো হয়েইছিল—তখনকার পেশাদার কীর্ত্তন গায়ক গায়িকা সকলের গানই শুনেছিলাম। দাদামণির শ্রাদ্ধোপলক্ষে বাংলাদেশের কোন কীর্ত্তনীয়াই বোধহয় বাদ পরেন নি।

ঠাকুরমার মৃত্যুর পর আমাদের বাড়ীতে কীর্ত্তনের কুলু কুলু ধ্বনি, দাদামণির মৃত্যুর পর কলনাদে পরিণত হয়ে, পরবর্ত্তী

জীবনে কীর্ত্তনের দুর্ব্বার স্রোতে বাবাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল; তাই আমাদের মনেও এই বৈষ্ণব সাহিত্য ও কীর্ত্তনের গভীর রেখাপাত আজও রয়েছে।

দাদামণির শ্রাদ্ধোপলক্ষে বাবা যে ভাবে দরিদ্রনারায়ণ-সেবা করেছিলেন তা বাস্তবিকই অপূর্ব্ব। তিনি প্রথমেই বলেছিলেন যে "এদের খাওয়ানোতে যেন কোন রকম অশ্রদ্ধার ভাব না থাকে।" বিরাট দরিদ্রনারায়ণ-উৎসবের শেষ অতিথিটির খাওয়া না হওয়া পর্য্যন্ত বাড়ীর কেউ খায়নি। বাবা বলেছিলেন "অতিথি নারায়ণ! তাদের খাওয়া না হলে কারো আগে খাওয়া উচিত নয়।"

সম্পূর্ণ হিন্দু শাস্ত্রানুসারেই বাবা ব্রাহ্ম পিতার শ্রাদ্ধ করলেন। দাদামণির শিক্ষা সার্থক হলো।

দাদামণির মৃত্যুর কয়েক মাস পরেই আমার বিয়ে ঠিক হয়ে যায়। সেই বৎসরেই পূজাবকাশে আমরা নৈনীতাল গিয়েছিলাম। বাবা, মা ও আমাদের তিন ভাই বোনের যাওয়া ঠিক হ'লে, কাকা সুধীরঞ্জন ও ছোটমামা সতীন্দ্রনাথ হালদার, পরে এসে আমাদের সঙ্গী হলেন।

আমরা সকলেই হাওড়া থেকে রওনা হলাম। এবারই প্রথম ঠাকুরমা ও দাদামণিকে প্রণাম করতে পেলাম না। তাঁদের অভাব খুবই বোধ করেছিলাম।

পিতৃদেবের একটি অভ্যাস ছিল, তিনি ডাইনিং কারে গিয়ে খেতে বিশেষ চাইতেন না। তাই ইক্‌মিক্ কুকারে আমাদের গাড়ীতেই রান্নার ব্যবস্থা হতো। কাঠের একটি বাক্সে রাঁধবার সব উপকরণ মা সাজিয়ে নিতেন বাড়ী থেকে। শুধু সকলের প্রাতরাশ এবং বিকালের চা আসত ডাইনিং কার থেকে।

কুলীদের মালপত্র বহনের জন্য টাকা দিতে দরদাম করলে বাবা ভীষণ বিরক্ত হোতেন, বলতেন, "আমরা নিজেরা বেড়াতে যাবার জন্য এত খরচ করি তাতে আমাদের গায়ে লাগেনা। আর যত দরদাম কি ও বেচারীদের দুটো পয়সা দেবার বেলায়"? এর জন্য তাঁর বেহারা বদরীকে খুব বকাবকি করলেন। কুলীদের বকশিস্ দেবার সময় চারগুণ বকশিস্ দিতেন। কারো কথাই শুনতেন না, বলতেন, "আমাদের মতই ওরা উপার্জ্জনের জন্য পরিশ্রম করে, শুধু কি আমাদের খাটুনিরই মূল্য আছে, ওদের নেই? এই ওরাই যদি আজ প্যাণ্ট আর সার্ট পরতো, তবে ওদেরই দু আনার জায়গায় দুটাকা দিতে কেউ দুবারও ভাবত না—আজ ওরা দুর্ব্বল, দুঃখী বলেই না আমরা ওদের পরিশ্রমের মূল্য চুরি করতে যাই"? এর পর আর কারও কিছু বলবার থাকতো না। গরীব দুঃখীর ব্যথা তিনি এভাবেই মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করতেন।

রেল ভ্রমণে আর একটি বিলাসিতা ছিল তাঁর গোটা গাড়ীখানা রিজার্ভ করা। তাঁর শোবার জায়গার উপর আর কারো বার্থ খোলা থাকবে, এ তিনি সহ্য করতে পারতেন না। কাজেই গোটা গাড়ী রিজার্ভ করলে সে হাঙ্গামা থাকতো না। বাড়ীতে যেমন করে বিছানা করা হতো, রেলেও তাকে ঠিক সেভাবেই বিছানা করে দিতে হতো—নাহলে তাঁর তৃপ্তি হতো না। অথচ অসহযোগ-আন্দোলনের সময় সেই বাবাই স্বেচ্ছায় মনের আনন্দে এক গাড়ী লোকের সঙ্গে তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করেছেন। তখন কোথায় বা ছিল তাঁর তামাক আর সৌখীন শয্যা! বাবার ভৃত্যদের দৈহিক কষ্ট বরং তাঁর চেয়ে বেশী হতো।

বড় বড় ষ্টেশনে গাড়ী থামলে, আমাদের গাড়ী অতিক্রম করে কোন ফলওয়ালার চলে যাবার উপায় ছিল না। ঝুড়ি ঝুড়ি ফল

মার কিনতে হতো বাবার জন্য। ভিখারীরা পয়সার সঙ্গে ফলমূল পেয়ে মনের আনন্দে আশীর্ব্বাদ করতো। বাবা নিজেও এতে খুব আনন্দ পেতেন।

দুপুরে রেল গাড়ীতে গরমে আমরা অস্থির হয়ে যেতাম। তখনকার দিনে 'এয়ার কন্‌ডিসনের' কথা তো চিন্তার বাইরেই ছিল। মস্ত মস্ত বরফের চাঁই কিনে গাড়ীর মাঝখানে রেখে, দরজা জানালা বন্ধ করে দিয়েও আমরা গরমে অস্থির হয়ে উঠতাম। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের দেখে বাবা দুঃখে বিগলিত হতেন। তিনি বলতেন "ওদের জন্যই রেল কোম্পানীর সব চেয়ে বেশী আয়, আর ওদেরই গরু ভেড়ার মত যাতায়াত করতে হয়। এই অবিচার আমরা মুখ বুজেই সহ্য করি।" উচ্চ শ্রেণীতে থেকে তিনি যেন নিজেকে অপরাধীই মনে করতেন।

তৃতীয় দিনে আমরা কাঠগুদামে এসে পৌছলাম। সেখান থেকে টঙ্গা করে ব্রুয়ারী পর্য্যন্ত গিয়ে তারপর ডাণ্ডী কি ঘোড়া করে উঠতে হয়েছিল তখন। যতই আমরা পাহাড়ের উপর উঠতে লাগলাম, দেখি, কাকা সুধীরঞ্জন ততই মুসড়ে যাচ্ছে এর কারণ যাত্রার সময় "সব ব্যবস্থা করেছি" বার বার বলা সত্ত্বেও সে গরম কাপড় চোপড়ের কোন ব্যবস্থাই না করে চলে এসেছিল। বাবা তার দুরবস্থা দেখে নিজের ওভার কোটটি তার গায়ে চাপিয়ে দিলেন। কাকা এখনো সেই ওভার কোটটি অতি যত্ন করে রেখে দিয়েছেন।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে নৈনীতাল সত্যই মনোহর। ৮।১০ হাজার ফুট উপরে বিশাল হ্রদ দেখে আমরা আশ্চর্য্য হয়েছিলাম। হ্রদটি বেষ্টন করে আছে হিমালয়—শিরে তার শুভ্র তুষার মুকুট—অতি সুন্দর দেখতে। প্রকাণ্ড হ্রদের চারকোণায় চারটি

ধর্ম্মমন্দির। একেকোনায় নয়নাদেবীর মন্দির; কথিত আছে সতীদেহ স্কন্ধে নিয়ে মহাদেব যখন পাগলের মত ঘুরছিলেন, তখন বিষ্ণুর চক্রে দেবীর নয়ন এখানে পতিত হয়। তাল অর্থ হ্রদ, সেজন্য এজায়গার নাম নয়নাতাল। অন্য কোনে একটি মসজিদ। অপর তীরে এক-কোনে গির্জ্জা ও অন্যকোনে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাগৃহ। হ্রদটির চারপাশে পাইনবৃক্ষ-শোভিত প্রশস্ত রাজপথ। সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ের এই সুন্দর স্থানটি পিতৃদেবের খুব পছন্দ হয়েছিল আর আমাদের সকলের আরও বেশী আনন্দ হোল চীনা পাহাড়ের উপর চীনাপার্ক বাড়ীখানি দেখে—সাজানগোছানো ছবির মতই ছিল বাড়ীটি। এখানে বাবার পরিচিত বন্ধুবান্ধব অনেকে ছিলেন। স্যার অতুল চ্যাটার্জ্জি ও বেনারসের মহারাজা প্রায়ই আমাদের বাড়ীতে আসতেন।

কাকা সুধীরঞ্জনের সেবার থার্ড ইয়ারের পরীক্ষা। সামনের দিকের একখানা ছোট ঘর তার পড়ার জন্য নির্দ্দিষ্ট হলো। পড়াশুনা যা হতো ভগবানই জানেন, আমার বান্ধবী বুবু (পরে সুধীরঞ্জনের পত্নী স্বপণা দেবী) যাঁকে কাকা একটু বিশেষ নজরে দেখতেন, তার কথাই দিনরাত্রি আমরা আলোচনা করতাম। বাবা পাশের শোবার ঘর থেকে মাঝে মাঝে টিপ্পনী কাটতেন। একদিন বলে উঠলেন, "প্রেমটা কইমাছের মত জীইয়ে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ, এখন প্রেমটা পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে হওয়াই তো ভালো।" এভাবের কথা আমাদের বলতে তিনি একটুও দ্বিধা করতেন না। সেজন্য তাঁকে সর্ব্বদাই আমরা আমাদেরই একজন বলে মনে করতাম।

নৈনীতালে আমরা রোজ হ্রদের চারপাশ ঘুরে বেড়াতাম। একদিন এখানে একটি পাহাড়ে জঙ্গলের পায়েহাটা পথ দিয়ে আমরা অনেক দূর বেড়াতে বেড়াতে চলে গিয়েছিলাম। সামনেই সুন্দর

ঝরণা দেখে আমরা মহাখুসী—খুসীর আবেগ উড়ে গেল যখন এক পাহাড়ীর মুখে শুনলাম, রোজ 'শের' এখানে জলপান করতে আসে। খুব ছোটবেলায় দাদামশায়ের 'বিজনী'তে ব্যাঘ্রের গর্জ্জনের কথা মনে হতেই তাড়াতাড়ি ফেরবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। বাড়ী ফিরে শীতে জড়সড় হয়ে গেলাম। বাবা হঠাৎ বললেন, 'পোলকা নাচ' করলে শীতের বাবাও কাছে আসতে পারে না, এই বলে অঙ্গভঙ্গী করে তিনি এমন লাফাতে সুরু করলেন যে হাসির চোটে, আনন্দে আমাদের সত্যই শীত অনেক কমে গেল।

তাসের 'গ্রাবু' খেলতে বাবা খুব ভালবাসতেন। মা যখন তাঁর বিপক্ষে বসতেন তিনি আগে থেকেই খেউরিকে দু'একটা তাসের ভাষা বুঝিয়ে দিতেন। যেমন হাতে 'গোলাম' থাকলে তিনি কবিতায় বলতেন "গোলামের জাতি শিখেছি গোলামী," 'চৌদ্দ' থাকলে বলতেন "চৌদ্দ ভুবন ঘুরে আশা কি সহজ কথা।" মা রাগে তাস ফেলে দিতেন। বোম ছক্কা ধরলে 'বোম্' বলে এমন চীৎকার করতেন যে মনে হতো বাড়ীই বুঝি ভেঙ্গে গেল। তখন একবারও মনে হোত না যে একজন বিচক্ষণ আইনবিদ্ আমাদের সামনে বসে আছেন।

মাঝে মাঝে বাবা, বারান্দায় বসে হিমালয়ের ধ্যানে মগ্ন হতেন। তিনি যে তাঁর শেষ শয্যা এই হিমালয়ের বুকেই রচনা করবার অভিলাষ করেছিলেন, একথা তখন কে ভাবতো? তাঁর এই ধ্যানমগ্ন মূর্ত্তি দেখে মনে হতো—কোলাহলময় পৃথিবী হতে তিনি যেন কোথায় চলে গিয়েছেন—আর আস্বাদন করছেন এক অনাস্বাদিত অমৃতকে।

সমগ্র জীবন ভরে পিতৃদেবের কত রকম রূপই না দেখেছি আমরা, শুধু দেখি নাই, দেখে আনন্দে, কখনো বিস্ময়ে হতবাক হয়েছি।

কখনো ঘোর আইনে মগ্ন, তখন আইন ছাড়া যেন জীবনে আর কিছুই নেই। কখনো দরদী কবি, সমস্ত জীবন-খানিই যেন কাব্য, স্রোতে কোথায় ভেসে চলেছে! হাল নেই, দাঁড় নেই, সে কাব্য-নৌকায় পিতৃদেব ভাবময়, ধ্যানমগ্ন। ভোগী, যোগী, স্নেহময় পিতা, প্রেমময় স্বামী, পিতৃমাতৃগত-প্রাণ পুত্র, দরদী ভ্রাতা, করুণাময় প্রভু, স্বজাতি-বৎসল, দেশপ্রেমিক রূপে পিতৃদেব নানারূপে নানাভাবে সম্মুখে উপস্থিত ছিলেন। তাই তাঁরই লেখা—

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার
কোথা তুমি খুঁজিছ ঈশ্বর?"

আজ বার বার মনে জাগে।

কাব্য ও সাহিত্য

পিতৃদেবের অবিনশ্বর সাহিত্য-সাধনা ফলে ফুলে রূপ পেল, যখন পূজাবকাশের পর ফিরে এসে ১৯১৪ সালে তিনি "নারায়ণ" মাসিক-পত্রিকা প্রকাশ করলেন।

এই পত্রিকার মাধ্যমেই আমাদের দেশের নাটক, কাব্য, ধর্ম্ম, সঙ্গীত, চারুকলা, সংস্কৃতি, অনুবাদ সাহিত্য ও সমালোচনা সাহিত্য জাতির সামনে এক নূতন দৃষ্টিতে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছিলেন তিনি। জীবনের বিশিষ্ট অনুভূতির সত্য-রূপকে আবেগহীন অথচ দৃঢ় ভাষায় তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন এই পত্রিকার মধ্য দিয়ে। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বিশদ করে বলতে গিয়ে বলেছেন "এই সমগ্র জীবনের অনুভূতিই সাহিত্য এবং তার জীবন্ত জ্বলন্ত প্রকাশই শ্রেষ্ঠ শিল্পকলা, সেই অনুভূতিই সাহিত্যের রস।"

আশৈশব সাহিত্যসেবায় পিতৃদেবের একটা আকুলতা থাকলেও ঘটনাচক্রে তা আর হয়ে ওঠেনি। দেশমাতৃকার আকুল আহ্বানে তিনি "পুঁথিতে বাঁধেন ডোর অশ্রুসিক্ত হইয়া"। মুসলমান প্লাবন রোধ করতে যেমন মহাপ্রভু ভুবাহু তুলে এগিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর অতি প্রিয় অধ্যাপনা ত্যাগ করে, তেমনই পিতৃদেবকে বড় কষ্টেই সাহিত্যসাধনা ত্যাগ করতে হয়েছিল দেশমাতৃকার মুক্তি-রণে পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজাবার আহ্বানে। এ সত্ত্বেও জাতির সাহিত্য-ভাণ্ডারে তিনি যা দান করে গিয়েছেন তাঁর কর্ম্মবহুল রাজনৈতিক জীবনের ফাঁকে ফাঁকে তা বড় কম নয়। পিতৃদেবের ঘটনাবহুল জীবন হতে যদি সঙ্গীত ও

সাহিত্য-সেবাকে আলাদা করে নেওয়া হয় তবে যে গভীর শূন্যস্থান দেখা যাবে তাহা অপূরণীয়।

তাঁর অন্তরের বিভিন্ন ভাব-তরঙ্গ কবিতাতেই প্রথমে আত্ম-প্রকাশ করে। এই প্রকাশ প্রথম মূর্ত্ত হয়েছিল তাঁর অপরিণত বয়সে রচিত পদ্য সমূহে। ১৮৮৫ সালে তাঁর রচিত অপ্রকাশিত "কেন কাঁদ হৃদয়" কবিতায় অন্তরের আকুলতায় এক আশার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাই কিশোর কবি প্রশ্ন করলেন—

"দুর্ব্বল শিশুর মত ভাসিবি কি অবিরত
মিছে আশা বুকে করে?"

আর যদি সে আশা পূর্ণ না হয়? তারজন্য কি শুধুই অশ্রুসম্বল করব? তাই বল্লেন তিনি,

"মোছ অশ্রুজল
কাঁদিয়ে বল কি ফল
কাঁদিবি কাহার তরে"?

ক্রন্দনই কি অন্তরের আশা পূর্ণ করবার অথবা আশা ভঙ্গের সান্ত্বনার একমাত্র পথ? তাতো নয়, কিশোর কবি সাহসে ভর করে তাই বললেন;—

"সাহসে করিয়া ভর
আনিয়া হৃদয়ে বল
দাও তরী ভাসাইয়া,
যদি বা গরজে ঘন
উঠিঝড় করে রণ
দেয় তরী ডুবাইয়া!
কিভয় কিভয়? তোর!
ওরে হৃদয় আমার।
উঠিবিরে সাঁতারিয়া"॥

কিশোর অন্তরের দুর্ণিবার আশা সফল করবার বাসনা ফুটে উঠেছিল তাঁর দুর্ব্বল ছন্দে, এই অপরিণত বয়সের ভাবধারার মধ্যে। উত্তাল সমুদ্রে পরবর্ত্তী জীবনে তরী ভাসিয়েছিলেন তিনি এবং 'সাঁতারিয়া' তীরে উঠতেই হবে এই দৃঢ় সংকল্প যে তখন থেকেই তাঁর হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়েছিল তাতে আর সন্দেহ কি?

১৮৯৭ সালে তাঁর রচিত কবিতা রাজেন্দ্র নারায়ণ কাব্যবিনোদ সম্পাদিত "নির্ম্মাল্য" মাসিক পত্রিকায় প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। এর পরে তাঁর তরুণ যৌবনে সাহিত্যের তপোবনে তিনি সাধনা আরম্ভ করেছিলেন। এসময় সুরেশ চন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত "সাহিত্যে"র অঙ্কে তাঁর রচিত কবিতা মাঝে মাঝে প্রকাশিত হতো। দেশমাতৃকার ভবিষ্য সাধকপুত্র তখন দেশজননীর উদ্দেশ্যে পূজার অর্ঘ্য নিবেদন করেছিলেন। হৃদয়গ্রাহী সে নিবেদনে তাঁর প্রাণের আকাঙ্ক্ষার রূপ ফুটিয়ে বেদনাতুর কণ্ঠে তিনি বলে উঠলেন।

"ভক্তি পুষ্প দিয়ে মাগো, গাথিয়াছি হৃদিহার,
বড়সাধ দিব তুলে, ওই চরণে তোমার।
ব্যথা মোর স্মরি যত, দহে হৃদি দহে তত,
আশা কত হয় হত, বহে আঁখি নীর ধার।
তুমি যদি আলো করে, থাকো মা হৃদয় পরে,
দুঃখ মোর সুখ হবে ঘুচে যাবে অন্ধকার"।

এ কবিতাটিতে তাঁর আশাহত মন ক্রন্দনে ভরপূর। তাঁর প্রাণের এই যে আকুতি তা কবিতার মানযন্ত্রে পূর্ণতা লাভ না করলেও, উত্তরকালে দেশভক্ত সন্তানের অন্তরের ভাবটি আমাদের প্রাণ স্পর্শ করে। এ কবিতায় তাঁর দেশাত্মবোধের উন্মেষ লক্ষিত হয়।

মাতৃপ্রেমের যে দীপশিখায় তাঁর কিশোর মন প্রথম আলোকিত হয়েছিল, সেই প্রেমালোক ছড়িয়ে পরেছিল যৌবনে তাঁর কাব্যের ছন্দে ছন্দে। পিতৃদেবের জীবনের তরুণ প্রভাতে যে সুর ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল, জীবনের অপরাহ্নে সেই একই সুর বিপুল উচ্ছ্বাসে ঝঙ্কৃত হলো।

কবি যদি তিনি হয়ে থাকেন, তবে তিনি ছিলেন বাংলার কবি, বাঙ্গালীর নিজস্ব কবি। বাংলার প্রাণ স্পন্দনের অনুভূতি শুধু তাঁর কাব্যেই নয়, সাহিত্য সাধনায়ও তা জেগে উঠেছিল। বাঙ্গালী জাতির মধ্যে বিরাট একটা সম্ভাবনা সুপ্ত রয়েছে বুঝেই রাজনৈতিক ক্ষেত্রের পুরোভাগে তাকে টেনে নিয়ে গেলেন তিনি। মর্ম্মে মর্ম্মে তা উপলব্ধি করেছিলেন বলেই বাংলার বিশেষ রূপের মধ্যেই বিশ্বরূপ তিনি দর্শন করেছিলেন। তাই শত সমালোচনাতেও তিনি বল্লেন,—

"আমার বাংলা সেই রূপের মূর্ত্তি। যখন জাগিলাম, মা আমার আপন গৌরবে তাহার বিশ্বরূপ দেখাইয়া দিলেন। সে রূপে প্রাণ ভরিয়া গেল, দেখিলাম সে রূপ বিশিষ্ট, সে রূপ অনন্ত! তোমরা হিসাব করিতে চাও কর, তর্ক করিতে চাও কর, আমি সে রূপের বালাই লইয়া মরি।" এইভাবে ভাবসাগরে ডুবেই বাংলার প্রাণধারার সঙ্গে সর্ব্বাঙ্গীন রূপে তিনি নিজপ্রাণধারা মিশিয়ে দিয়েছিলেন। তারই বিকাশ আমরা দেখতে পাই তাঁর কাব্যে, তাঁর সাহিত্যে, তাঁর সমগ্র জীবনে।

পিতৃদেবের পরবর্ত্তী জীবনে সাহিত্য সাধনায় বাধা এলেও কাব্য ও সাহিত্য থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব। যে বৈষ্ণব কাব্য তাঁর জীবনকে প্রভাবান্বিত করেছিল—পরবর্ত্তী জীবনে সেই

বৈষ্ণব-ভক্তিরসে সিঞ্চিত হয়েই তিনি মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে সর্ব্বত্যাগী হতে পেরেছিলেন। তাই

"সব সমর্পিয়া একমন হৈয়া
নিশ্চয়ই হইলাম দাসী"। বলে তনু-মন-প্রাণ দেশ-মাতৃকার সেবায় তিনি সমর্পন করলেন। সাহিত্যিক জীবনের সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক জীবনকে এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ করে তিনি সাহিত্য সাধনাকে গৌণ করে মাতৃসেবায় অগ্রসর হলেন। নতুবা রাজনৈতিক সাধনা তাঁর সাহিত্য সাধনার বাধাস্বরূপ হলে, তিনি সম্পূর্ণভাবে দেশ সেবায় জড়িয়ে পরতে কখনই পারতেন না।

যৌবন কাল থেকেই তাঁর হৃদ্-"মালঞ্চে" যে ভাব-রূপ ফুল ফুটে উঠেছিল, তাই নিয়েই তিনি বাণীর চরণে অঞ্জলি দিলেন। ১৮৯৬ সালে তাঁর এই অর্ঘ্য "মালঞ্চ" নামেই প্রথম প্রকাশিত হয়, এবং তা নিঃশেষিত হবার পর পুনরায় ১৯০৫ সালে ৺সুরেশচন্দ্র সমাজপতি তা প্রকাশিত করেন। 'মালঞ্চের' তরুণ মালাকার প্রাণ-বসন্তের হিল্লোলে উচ্ছসিত হয়েই প্রেমের সঙ্গীত গেয়ে উঠল। "তোমার প্রেম" কবিতায় তরুণ কবি স্বাভাবিক ভাবেই ব্যাকুল হলেন, এই প্রেমের স্বরূপ জানতে। কেমন সে প্রেম? —তার মনের প্রশ্ন কবিতায় রূপ পেল।

"তোমার ও প্রেম সখি শানিত কৃপাণ!
দিবানিশি করিতেছে হৃদিরক্ত পান!
নিত্য নব সুখ ভারে,
ঝলসিছে রবি করে;
রজনীর অন্ধকারে সে আলো নির্ব্বাণ"।

এ যেন "নিতি সুখের" প্রেম, আবার বুঝি "নিতি দুঃখের"ও প্রেম। বিভিন্ন ভাবের নবানুভূতিতে তরুণ হৃদয় কোন অজ্ঞাত পুলকে পুলকিত হয়ে উঠলো! কেমন এ প্রেম? কি তার রূপ, তার "রীত", তার ধারা? সে প্রেম কি অমর জীবনের মত 'শান্তিরূপী'? এ প্রেমানলে কি হৃদয়ের ফুলবন দগ্ধ হয়ে যায়, না শ্রান্ত জীবনে শান্তির আবরণ এ প্রেম? তিনি এগিয়ে গেলেন, আশা নিরাশার দোলায় দোলায়মান হয়ে, বলে উঠলেন—

"তোমার ও প্রেম সখি! অমর জীবন
শান্তিরূপী নন্দনের চির আরাধন
অসার স্বপন লয়ে
থাকিলে নিদ্রিত হয়ে
ধূলাভরা ধরণীর ধূলি নিমগন"।

ঠিক তুলনা বুঝি মিলল না। অবশেষে অশান্ত মন শান্ত হলো এই বলে,—

"তোমার ও প্রেম সখি! তোমারি মতন,
অনন্ত রহস্যময় সৌন্দর্য্যে মগন
অধর প্রশান্ত ধীর,
আঁখি কৃষ্ণ সুগভীর,
পুষ্পিত হৃদয় তীর, সৌরভ স্বপন।
এই কাছে এসে যাও,
ঐ দূরে চলে যাও,
এ সকল ক্ষণিকের অর্দ্ধ আলিঙ্গন।
সমস্ত হৃদয় তব
অজানিত নিত্য নব
বিশাল ধরণী আর অনন্ত গগন।
তোমার ও প্রেম সখি! তোমারি মতন।

প্রেমের স্বরূপ বুঝতে গিয়ে পিতৃদেবের হৃদয় অশান্ত হয়েছিল। কোন রূপেই তাকে রূপ দিয়ে তিনি সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস ও পরবর্ত্তী বৈষ্ণব কবিদের ভাবধারায় পিতৃদেব প্রভাবান্বিত হলেও তাঁর চিন্তা ধারা ভিন্নপথে গতি নিয়েছিল সন্দেহ নেই। তিনি এখানে প্রেমকে এক বিরাট আসনে বসিয়ে পাদ্য-অর্ঘ্য নিবেদন করলেন। সমস্ত আকুল প্রশ্নের সমাধান করে দিয়ে কবি-চিত্ত পরম তৃপ্ত হলো।

'মালঞ্চে' প্রকাশিত 'ঈশ্বর' কবিতাটি নিয়ে পিতৃদেবের বিবাহের সময় ব্রাহ্ম সমাজে বেশ গোলযোগের সৃষ্টি হয়েছিল। চিত্তরঞ্জন 'ঈশ্বর বিদ্রোহী',—'নাস্তিক' এই আখ্যা দিয়ে ছিলেন ব্রাহ্ম সমাজের নিষ্ঠাবান ঈশ্বরের সেবকেরা তাঁকে।

জীবনের আলো-অন্ধকারে তরুণ প্রাণের আশা তিনি ঈশ্বরের চরণে নিবেদন করলেন, কিন্তু যাকে নিবেদন করছেন তাকে উপলব্ধি করবার বাসনা তার মনে জেগে উঠা খুবই স্বাভাবিক। বারংবার আবেদনের উত্তর না পেয়ে সন্দেহের ঘাত-প্রতিঘাতে অভিমানে কবি-মন বিদ্রোহী হয়ে উঠলো। সে বিদ্রোহ-ভাব অতি স্বাভাবিক, তাই বল্লেন তিনি,

"ঈশ্বর! ঈশ্বর! বলি অবোধ ক্রন্দন
প্রচণ্ড ঝটিকা বহি গগন ভরিয়া
আমাদের সুখশান্তি নিতেছে হরিয়া
বাড়াইয়া আমাদের বিজন বেদন!"

ধরণীর সুখ দুঃখই কবির সহানুভূতির বস্তু! পাপ-পুণ্যে-ভরা মানুষই তাঁর প্রিয়, তাই ধরণীর আর্ত্তনাদ না শুনে, মানুষকে অবজ্ঞা করে, এ কোন ঈশ্বরকে উর্দ্ধ মুখে চেয়ে আমরা ডাকি? তাই পিতৃদেব সুখ-দুঃখ-ভরা, অন্ধকার এই পৃথিবীর অবজ্ঞাত জন-

সাধারণের মধ্যে নেমে এসে নিজেকে মিলিয়ে দিয়ে কল্পিত ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস-হীন হয়ে বলে উঠলেন।

"হায়! হায়! মিথ্যাকথা ঈশ্বর! ঈশ্বর!
করুণ ক্রন্দন উঠে অনন্ত গগনে
ঠেলে ফেলি জীবনের বিনীত নির্ভর
ধরণীর আর্ত্তনাদ শুনিনা শ্রবণে।
উর্দ্ধমুখে চেয়ে থাকি ডাকি নিরন্তর
শতবার প্রতারিত কাঁদি মনে মনে।"

ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য্যদের সংকীর্ণ মতবাদই তাঁকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিদ্রোহী করে দিয়েছিল, সে সময়। এই বিরুদ্ধমত তিনি অন্তরে পোষণ না করে প্রকাশ করলেন নানা ভাবে নানা কবিতায়। তৎকালীন ব্রাহ্ম সমাজের প্রচারকদের একটি অংশ মুখে ধর্ম্ম এবং উদারতার মাহাত্ম্য প্রচার করলেও অন্তরে তাঁরা বিপরীত ছিলেন; তাই সমাজের এই কপটতার মুখোস পিতৃদেব ছিঁড়ে ফেলে দিলেন তাঁর 'সোহং' কবিতায়, -

"অসার সকল জ্ঞান, ওহে ব্রহ্মজ্ঞানী
তবে তুমি কার কর এত অহঙ্কার?
আপনারি উচ্চারিত মেঘমন্দ্র বাণী,
আপনার মনে আনে মোহ অন্ধকার;
ক্ষুদ্র তুমি, ক্ষীণ প্রাণে কেমনে ধরিবে
অসীম অনন্ত শক্তি মহাদেবতার,
এ পূর্ণ বিশ্বের বক্ষে কাহারে বরিবে
বৃথা বহ আপনার পুষ্প অর্ঘ্য ভার"?

তিনি আর 'শতবার প্রতারিত' হতে চাইলেন না। অন্যায় ও অসঙ্গতির বিরুদ্ধে বাবা আজীবন যুদ্ধ করে গিয়েছেন। ধর্ম্ম প্রচারকদের কপটতায় ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি তাঁর 'ধার্ম্মিক' কবিতায় বিদ্রূপ ভরে বল্লেন,

"সুধাও ধর্ম্মের কথা দিবস রজনী
সাক্ষী দিয়া ঈশ্বরের কথায় কথায়।
বক্তৃতা শুনিয়া শুধু স্তম্ভিত অবনী
আহা! আহা! বলি তব চরণে লুটায়
ধরণীর সুখ দুঃখ অবহেলা করি,
আঁকিছ স্বর্গের ছবি নাসিকা কুঞ্চিয়া
নিমেষে নিঃশ্বাস ফেলি ভগবানে স্মরি'
মানবের শত পাপ দাও দেখাইয়া"

এখানে পিতৃদেব কবি আকাঙ্খিত কল্পনার রাজ্য ছেড়ে বাস্তব জগতে আসন বিছালেন। তথাকথিত 'ঈশ্বর'কে নিজের রূপে ঢেলে সাজিয়ে মান-অভিমানের অবতারণা করে বল্লেন,

"তুমি যাও, আমি থাকি আপনারে লয়ে
ডুবিয়া হৃদয় তলে গভীর—গভীর!
আমারি নন্দন আমি করি আবিষ্কার
মধুর সুন্দর এক অপূর্ব্ব নন্দন।
তারপরে' শেষে আনন্দ উজ্জ্বল করে,
করুণা মলিন করে; সর্ব্বপ্রাণ ভরে,
যত্ন করে গড়ে তুলি আমার ঈশ্বর।
আকুল পরাণ লয়ে, ব্যাকুল নয়নে
তোমার চরণ তলে আসিব না আর।

ভক্তই ভগবানকে অভিমান ভরে এমন কথা বলতে পারেন! তিনি বিদ্রোহ করেছিলেন ধর্ম্মপ্রচারকদের কল্পিত এক শ্রেণীর নির্দ্দিষ্ট ঈশ্বরের বিরুদ্ধে, ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বের বিরুদ্ধে নয়। তাই মানব-প্রেমিক পিতৃদেব বৈষ্ণব মহাজনদের "নব বৃন্দাবনে ঈশ্বরে মানুষে

মিলিত হইয়া রয়" এই বাক্য মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে মানুষের মধ্যে-ই ঈশ্বরকে উপলব্ধি করে মিনতি ভরা কণ্ঠে বল্লেন,

"এস এস কাছে লয়ে মানুষের প্রাণ
কাজ কি এ মিথ্যা ভরা দেবতার ভাণ।"

এ ভাবে যিনি নিজের ঈশ্বর গড়ে তুলতে পারেন তাঁকে বিদ্রোহী বা 'নাস্তিক' বলা অসার চিন্তা শক্তির পরিচয় ছাড়া আর কি বলবো?

'মালঞ্চে' আর একখানি প্রসিদ্ধ কবিতা "বার বিলাসিনী"। পিতৃদেবের বিবাহে কোন কোন ব্রাহ্ম প্রচারকগণের অনুপস্থিতির অন্য একটি কারণ তাঁর এ কবিতাটিও। অভিশপ্তা নারীর অন্তরের জ্বালা যেন প্রাণে প্রাণে অনুভব করলেন পিতৃদেব। চির—লাঞ্ছিতার করুণ জীবনের কাহিনী তাঁর সমস্ত হৃদয় মথিত করল। পুরুষের অন্যায়ে নিপীড়িতা, সমাজ-পরিত্যক্তা,উপেক্ষিতা বার বিলাসিনীর অস্ফুট ক্রন্দন এ কবিতাতে মুখর হয়ে উঠেছে। ছন্দে ও ভাব-মাধুর্য্যে 'বার বিলাসিনী' রবীন্দ্রনাথের 'পতিতা'র পাশেই স্থান করে নিল।

আমি যেন চিরদিন ঋণী!
অপার ঐশ্বর্য্য লয়ে
বিলাই ভিখারী হয়ে
বাসনা বিহীন উদাসিনী।
লালসা উল্লাসহীন, পূর্ণ উদাসিনী—
কে করেছে মোরে চির ঋণী!
ওগো আমি যৌবনে যোগিনী!
এ লালসা ছাই
সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া তাই
চলিয়াছি কলঙ্ক বাহিনী
ধর্ম্মহীন কর্ম্মহীন কলঙ্ক বাহিনী

চিরদিন যৌবনে যোগিনী !
কার অভিশাপে নাহি জানি !
কোন মহাপ্রাণে ব্যথা
দিয়াছিনু, তাই হেথা
প্রাণহীন প্রেম বিলাসিনী
সবারে বিলাসি তাই বার বিলাসিনী
তারি শাপে চির কলঙ্কিনী।

পিতৃদেব আমাদের পারিবারিক সাহিত্য-বাসরে 'Thom 'Hood এর Bridge of Sighs' কবিতাটি প্রায়ই পড়তেন। এই করুণ রসের চিত্রটি তাঁর হৃদয় এতই স্পর্শ করেছিল যে হয়তো তার ফলেই তিনি বার বিলাসিনীর অন্তরের করুণ ক্রন্দন এমন মধুর করে ব্যক্ত করতে পেরেছিলেন। মালঞ্চে 'অভিশাপ' কবিতাটিতে পিতৃদেবের প্রাণের সম্পূর্ণ পরিচয় আমরা পাই।

তিনি বল্লেন ;—"স্বর্গে সহচরগণ ! আজি হতে আমি হব
ধরণীর প্রাণ,
বাজিবে আমারি মর্ম্মে জগতের দীর্ঘ শ্বাস
শত দুঃখ তান !
চির অশ্রু জল চোখে জাগিয়া বহিব লয়ে
পূর্ণ পরিতাপ
বক্ষেতে বিধিয়া রবে শানিত কৃপাণ সম
এই অভিশাপ।"

অন্তর-মথিত করা তাঁর এই বাণী স্বর্ণ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত সুরপতির মোহ চূর্ণ করে দিল। অবহেলিত জনগণের তীব্র আর্ত্তনাদ শক্তিশেল সম বিদ্ধ হয়ে রইল তাঁর হৃদয়ে। প্রকাশ্য রাজনীতিতে নেমে যাওয়ার একটা সূত্র খুঁজে পাওয়া যায় এখানে।

১৯০২ সালে 'মালা' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। 'মালা'র প্রেম বিষয়ক কবিতা সমূহ যেন আরো গভীর। এখানে কবি-প্রতিভা মধ্যাহ্ন-ভাস্কর দীপ্তিতে গম্ভীর। 'মালঞ্চে' যে আকুল অস্থিরতা প্রকাশ পেয়েছিল তা এখানে যৌবন-মধ্যাহ্নে স্থির। "সে কি শুধু ভালবাসা"য় ?

"কেমন সে ভালবাসা ? বলা কিগো যায় ?
সকল জীবন আর সব স্বপ্ন গায়
তোমারি তোমারি গীতি ! স্রোতস্বতী যথা
সমুদ্রের গান গাহে, তারি পানে ধায়
আকুল আশায়।"

সংযত, গভীর ভাবে ভরা এ কবিতাটি।

এখানে একটা পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায়। কবির জীবনে ক্ষীণ অবিশ্বাসের অন্ধকার দূর করে 'মালা' যেন তাঁকে নিয়ে চলেছে জীবনের নূতন আলোর পথ ধরে—কোথায় ? 'প্রেমও প্রদীপে' স্পষ্টই দেখতে পাই তিনি ঈশ্বরের সন্ধান করেছেন। "সত্য বলে পূজা করি অলীক স্বপন" ভাবটি যেন ক্রমে ক্রমে বিদূরিত হচ্ছে। কবি কাতর হয়ে বল্লেন,—

"আজি এ সন্ধ্যার মাঝে তব বাতায়ণে
কেন রাখিয়াছ ওগো ! প্রদীপ জ্বালিয়া ?
তোমার ও প্রদীপের কনক কিরণে
আমার সকল মন উঠে উজলিয়া।"

তুমি সোহাগ করে প্রদীপ জ্বেলে রেখেছ, কিন্তু কেন ? পারব কি আমি তোমার কনক কিরণোজ্জ্বল প্রদীপের আলোতে জীবনের পথ খুঁজে নিতে ? এই ঘন সন্ধ্যায় কেন তুমি প্রদীপ জ্বালালে ? কবি প্রশ্ন করলেন—কারণ, তাঁর প্রাণদীপ তো তিনি জ্বালেন নি।

"কেন গো এমন করে ডাকিছ আমারে
সমস্ত পরাণ ভরে পরাণ মাঝারে।
আমি অশ্রুজল লয়ে শুধু চেয়ে থাকি
আমি তো জ্বালিনি দীপ, কি করিয়া ডাকি?"

তার পর চল্লেন তিনি ঐ আলো লক্ষ্য করে, বল্লেন, "কোথায় তুমি? আমি যে তোমাকে চাই! আমার সকল সুখের মাঝে, আমার সর্ব্ব বেদনার মাঝে"—

"আমি যে তোমারে চাই সন্ধ্যার মাঝারে
তোমার ঐ প্রদীপের আলো অন্ধকারে
সকল সুখের মাঝে সর্ব্ব বেদনায়
কর্ম্মক্লান্ত-দিবাশেষে চিত্ত ছুটে যায়
ওই তব প্রদীপের আলো অন্ধকারে
কোথা তুমি লুকাইয়া, তাই খুঁজিবারে।
হে মোর লুকান ধন! হে রহস্যময়ী
আজি জীবনের শেষে—আজো তুমি জয়ী।"

অন্ধকারে খুঁজে কবি নিরাশ হননি। আশার আলোরূপে ঐ যে তোমার প্রদীপখানি,—

"হাসি বহে প্রদীপ তোমার
আমি আছি, কোথা অন্ধকার?"

এখন কবি উপলব্ধি করলেন, যা মিথ্যা বলে ক্ষণিকের কল্পনা ছিল একদিন, আজ তা—

"সত্যরূপে উজ্জলি উঠেছে ওই
তোমার প্রদীপ খানি।"

এই প্রেমের প্রদীপে অন্তর আলোকিত করে তিনি বল্লেন ;—

ওগো প্রিয়, তুমি মোর সর্ব্বজীবনের
চির প্রেমার্জ্জিত শত তপস্যার ফল ('তুমি')

তাঁর আগমনের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। যদি তিনি কখনো আসেন তবে—

"খুলিয়া হৃদয়দ্বার আমি বিছাইব
যত না সৌন্দর্য্য আছে যত না স্বপন ;
সর্ব্ব কোমলতা মোর আমি পেতে দিব
তুমি কর ওগো কর আমার জীবন
তোমার চরণ ভূমি !" ('তুমি')

তারপর ?

"তুমি আমি কাছে তবু দূরে দূরে থাকি
দুজনার মাঝে এক দীপ জ্বেলে রাখি।"

কাছে থেকেও দূরে ? তাই আকুল "প্রার্থনা" জানালেন,

"ভরি দিও শূন্য প্রাণ তব পূর্ণতায় !
মহান করিয়া দিও তব মহিমায় !
আমারে জড়ায়ে নিও
আমারে ঢাকিয়া দিও
ওগো মহা আবরণ ! তুমি যে আমার
দিবসের দিনমণি, নিশার আঁধার !"

আবার বল্লেন,—

"জাগরণে কর্ম্মভূমি
শয়নের স্বপ্ন তুমি
ওগো সর্ব্বময় ! তুমি যে আমার।"

প্রাণে প্রাণে এই মিলনের জন্য আকুল হলো তার অন্তর। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় যে ক্রমে ক্রমে তিনি নিজেকে পরিবর্ত্তন করে ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে চললেন। সে মিলনের ব্যবধান যতই কমে আসতে লাগল, একাত্ম মিলনের জন্য ততই প্রাণ আকুল হয়ে উঠল। তিনি ঈশ্বরের অনুভূতি লাভ করতে লাগলেন। তাঁর আকাঙ্খাই তাঁকে এই অনুভূতি লাভে সাহায্য করেছিল।

"আমার পরাণ ভরে উঠে যত গান
তোমার পরাণ হতে পায় যেন প্রাণ।"

এরপর আত্ম-সমর্পণ,—

"ওগো প্রাণস্পর্শী! করহ পরশ মোরে
তোমার অনন্ত গানে প্রাণ যাক ভরে।"

* * * * *

আমারে ভাসায়ে রাখ পরাণ পরশে
আমারে ডুবায়ে দাও পরশ হরষে।

* *

সকল ঐশ্বর্য্যে আমি সাজায়েছি ডালি
পরিপূর্ণ প্রাণ মোর করিয়াছি খালি,
আরো যে চাহিছ তুমি কি দিব গো আমি
চাও যদি লয়ে যাও শূন্য প্রাণখানি। ('শূন্যপ্রাণ')

ঈশ্বর-বিদ্রোহী কবি ঈশ্বরের সান্নিধ্যে এসে পড়লেন। শূন্য প্রাণখানি পরমতৃপ্ত ভরেই তিনি অর্পণ করলেন শ্রীভগবানের চরণে। এই শূন্য প্রাণখানিকে মানবপ্রেমে পূর্ণ দেখে রবীন্দ্রনাথ বল্লেন—

"এনেছিলে সাথে করে
মৃত্যুহীন প্রাণ

মরণে তাহাই তুমি
করে গেলে দান।"

'মালা'র পর ১৯১০ সালে পিতৃদেব 'সাগরসঙ্গীত' লিখেছিলেন, এবং ১৯১৩ সলে গ্রন্থাকারে তা প্রকাশিত করেন।

পিতৃদেব যেমন হিমালয়ের গভীরতায় ধ্যানমগ্ন হতেন, তেমনি সীমাহীন সমুদ্রের রূপের প্রতিও তাঁর একটা আন্তরিক আকর্ষণ ছিল। তাই বার বার তিনি ছুটে গিয়েছেন সাগরের আহ্বানে,—প্রাণ ভরে আদিঅন্তহীন বিশাল নীলাম্বুর বিভিন্ন রূপের তরঙ্গভঙ্গীতে মুগ্ধ হয়ে সেই অসীম রূপকেই তিনি 'সাগর সঙ্গীতে'র ছন্দে বেঁধে রাখলেন। আদিঅন্তহীন বিশাল জলধির সঙ্গে অনন্ত নীলাকাশের যে মিলন, সে মিলনে সাগরের উচ্ছল নৃত্য তাঁর অন্তর স্পর্শ করলো। প্রকৃতির সেই মহান রূপকে তিনি লক্ষ্য করে বল্লেন,—

আজিকে পাতিয়া কান,
শুনেছি তোমার গান,
হে অর্ণব আলোঘেরা প্রভাতের মাঝে ;
একি কথা ! একি সুর !
বুঝিতে পারিনা তবু কি জানি কি কাজে
তব গীত মুখরিত প্রভাতের মাঝে।

প্রভাতেই সাগরের সঙ্গীতের আহ্বানে পুলকিত অন্তরে, মোহাবিষ্ট কবি গাইলেন—

উড়িয়া বেড়ায় মোর হৃদয় আকাশে
প্রেমের তরঙ্গে আর বসন্ত বাতাসে।

কিন্তু তিনি সচেতন হয়ে উঠলেন রূপ-বিন্যাসের সে ভাষায়, তাই দৈন্যতা স্বীকার করে ক্ষমা ভিক্ষা করে বললেন।

"জানিনা কথার মোহ, ভাষার বিন্যাস
জানিনা গানের সুর, তান লয় মান।"

তাই কবি আপন সত্তাকে সাগরের কাছে বিলিয়ে দিলেন। চন্দ্র যেমন সূর্য্যের মহিমায় আলোকিত তেমনি তিনি নিজেকে সাগরের হাতে সমর্পণ করেই যেন বল্লেন "কোথা তুমি নিয়ে যাবে নিয়ে চল"। এখানে পিতৃদেব আত্ম-সমর্পণের মহিমায় মহিমান্বিত।

তিনি বললেন—

"আমি যে হয়েছি তব হাতের বিষাণ!
আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী!"

অতএব এবার—"বাজাও আমারে
দিবস রজনী ভরে আলোকে আঁধারে,
বাজাও নির্জ্জন তীরে, বিজন আকাশে,
ওগো যন্ত্রি! আমি যন্ত্র বাজাও আমারে
তোমার অপূর্ব্ব এই আলো অন্ধকারে"!

প্রেমসাগরের এই আকুতি মহাসাগর বুঝি আর উপেক্ষা করতে পারল না; তাই কবি-হৃদয়ের দুই কূল প্লাবিত মথিত করে মহাসাগরের আহ্বান এলো, অন্তরের পারাপার নিশ্চিহ্ন হয়ে 'একাকার' হয়ে গেল। মহাসাগরের বক্ষে কবি-মন লীন হয়ে গেল। অসীমের সঙ্গে মিলনের আকুলতা শান্ত হয়ে এল পরিপূর্ণ নির্ভরতা। কবি বলে উঠলেন,

'সকল প্রকৃতি আজ পদ্ম হয়ে ভাসে জলে
মহাকাল থেমে গেছে তোমার চরণ তলে।
আমার বক্ষের পরে যোগাসনে যোগীবর
নিবিড় নিঃশ্বাস-হীন ধীর স্থির আঁখি কর

পেয়েছি আভাষ আমি পাইনি সন্ধান তার
যুক্ত করে বসে আছি কর মোরে একাকার।'

অন্তরে প্রেমাস্পদের আহ্বান শুনেও বহিঃপ্রকৃতিতে প্রাণের ধনের আভাষ পেলেন মাত্র, তাই কোন্ সাধনে সেই বহিঃপ্রকৃতির দ্বারাই তিনি অন্তরেব নিধি প্রাপ্ত হবেন? তাই সাধনার মন্ত্র তিনি চাইলেন মহার্ণবের কাছে। গুরুব আসনে তাকে বরণ করে বললেন,

"দীক্ষা দাও ওগো গুরু মন্ত্র দাও মোরে,
পূজার সঙ্গীতে তব প্রাণ দাও ভরে"।

কামনা করলেন তিনি যে অসীমেব সাধন-ভজনে অভাজন যেন বঞ্চিত না থাকে। চিরকাল যেন কবি প্রকৃতির এই জয়গানে মুখরিত থাকেন। তাই অনুনয় করে বল্লেন,

'সঙ্গে রেখ চিরকাল সাধন ভজনে তব।'

অসীম পারাবারে অন্তর ভাসিয়ে দিয়েও তো কোন কূল পেলেন না! "অকুলেতে না পড়িলে কুলে কি গোবিন্দ মিলে", বৈষ্ণব সাধকের এই ভাবে অনুবঞ্চিত হয়ে মিলনের সম্পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষায় ক্লান্ত কবি বললেন;

"পরাণ ভরিয়া গেছে কূল নাহি পাই
তোমার অকুল বিনা কোথা তার ঠাঁই?"

চারিদিকে অন্ধকারে প্রাণের মাঝে যেন কোন সাড়া আর পাচ্ছেন না। নীরব ক্রন্দনে-ভরা অন্তর; কিন্তু চোখে জল কই? যার জন্য পরাণ 'পাগলপারা', তাঁকে কত রঙ্গের মাঝে, কত গীত-ধ্বনির মাঝে, আলো-অন্ধকারে, প্রতিদিন, প্রতিরাত্রি খুঁজেও তো পেলেন না—তাই শ্রান্ত হয়ে আত্মসমর্পণ করে কবি বল্লেন;

'হে মোর আজন্ম সখা! কাণ্ডারী আমার
আজ মোরে লয়ে যাও অপারে তোমার।'

পিতৃদেব প্রকৃতির লীলানিকেতন অসীম সাগরের মধ্যে খুঁজে বেড়ালেন রবীন্দ্রনাথের চির আরাধ্য 'জীবনদেবতাকে'। এই জীবন-দেবতাকে, খুঁজে বার করতে 'মালঞ্চের' ঈশ্বর-বিদ্রোহী কবি 'মালায়' ঈশ্বর-সান্নিধ্যে এসে মহাসাগরের মহান ঐশ্বরিক গীতিময় রূপে ডুবে গেলেন।

১৯১৪ সালে পিতৃদেবের 'অন্তর্য্যামী' প্রকাশিত হয়। 'অন্তর্য্যামী'তে সমস্ত হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠলো দেবালয়ে দেবতার আরতির জন্য। 'অন্তর্য্যামী' ভগবদ্ভক্তির পরিচায়ক কাব্যগ্রন্থ। এক কথায় পিতৃদেবের ধর্ম্ম জীবনের চিত্র একে বল্লেও চলে। এখানে শুধু তিনি আর তাঁর অন্তরের দেবতা বিরাজিত। আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলনের তীব্র ব্যাকুলতাই এখানে অনুভূত হয়। বৈষ্ণব পদাবলীর ভাব দৃষ্ট হয় এই কাব্যে। 'যাঁহা যাঁহা দৃষ্টি পড়ে 'তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে" এই ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েই "অন্তর্য্যামী'র কবি বল্লেন,—

'সকল দরশ মাঝে তুমি উঠ ভেসে!
সকল গগন মাঝে তুমি উঠ হেসে।
সকল গণনা মাঝে তোমারেই গুণি!
সকল গানের মাঝে তব গান শুনি!
ওগো তুমি মালাকর মন-মালিকার!
সাথী তুমি সাক্ষী তুমি সব সাধনার।

'মালঞ্চে' কবি যে ফুল দিয়ে 'মালা' গেঁথেছিলেন, সে 'মালা' প্রেম-অশ্রুতে সিঞ্চিত করে 'অন্তর্য্যামী'তে নিবেদিত হোল। বৈষ্ণব-দর্শনে

ভক্তির চরম ও পরম পথ আত্মনিবেদনে। 'অন্তর্য্যামীতে' তাই পিতৃদেব নিবেদিত-প্রাণ, তাঁর কাম্য বস্তুকে লাভ করবার আশায় উৎসুক। 'আমার সকলি তুমি,' এই বলেই যেন পূর্ব্বের সেই সন্দেহ-কুল অস্থিরতা হতে কবি এখন পরম নির্ভরতার শান্তি পেলেন; এই শান্তি এক আশার আলো ছড়িয়ে দিয়ে বাঙ্গালীর স্বভাবধর্ম্মের অন্ত-র্মুখীন সাধনার বার্ত্তা বাঙ্গালী-অনুভূতিকে জাগিয়ে দিল। প্রেম, ভক্তি ও ত্যাগ মার্গের পথিক হয়ে, পথ চলতে চলতে তাঁর অভিলষিত স্থানে এসে ভবানন্দে বিভোর হয়ে কবি আবেগ ভরে গেয়ে উঠলেন,

> "বাজারে বাজারে তবে বাজা জয়ডঙ্কা,
> নাহি লাজ নাহি ভয় নাহি কোন শঙ্কা—"

জীবনের কণ্টকিত পথের মধ্য দিয়ে আত্মত্যাগে ক্ষতবিক্ষত চরণে শ্রান্ত দেহে তিনি লাভ করলেন পরম বস্তুকে— যুগে যুগে যার উদ্দেশ্যে মানব যাত্রী প্রার্থনা করে গিয়েছে 'দেহি পদ পল্লবমুদারম্'

পিতৃদেবের 'কিশোর কিশোরী' ১৯১৫ সালে নিজ-সম্পাদিত 'নারায়ণে' প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। পরে ইহা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

'কিশোর কিশোরীতে' এক নূতন সুরের গুঞ্জন আমরা শুনতে পাই অথবা চিরপুরাতন সুরই কি কবি চিরনূতন করে শোনালেন? না তা নয়, কেননা বহু পথে বহু মতে মানুষ চালিত হয় তার চরম লভ্য বস্তুর দিকে। এ পিতৃদেবের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু-লাভের আর এক নূতন পথ। মন পাওয়ার উল্লাসে ভরা আবার নূতন যাত্রার প্রারম্ভ পথে কিঞ্চিৎ দোলায়মান। 'কিশোর

কিশোরী' সম্বন্ধে আমার এই মতের কারণ বিশ্লেষণে আমার মনে পড়ে যায় বৈষ্ণব মহাজনদের গীতিময় পদাবলীর কথা, যাহা প্রতিফলিত হয়েছিল তখন কবি 'মনমুকুরে'। তাই বিচিত্র রহস্যময় সাধকের ধর্ম্মজীবনের অভিজ্ঞতা অবলম্বনে বৈষ্ণব মহাজনগণের ভাবপ্রবাহকে সুস্পষ্ট রূপেই যেন কবি কাব্যের রূপান্তরে পৌঁছে দিলেন। কিশোর-কিশোরীর অপূর্ব্ব মিলন ঘটালেন, কিন্তু এ মিলন 'মালঞ্চের' ভাবরসে সিঞ্চিত নয়,—আদিরসের অতি উর্দ্ধে কামগন্ধ-হীন দেহাতীত যে প্রেমের অনাবিল ধারা বৈষ্ণব-সাহিত্যে প্রবাহিত ছিল তারই নূতন পরিবেশন। 'কিশোর-কিশোরীতে' কবি যে প্রেমের চিত্র এঁকেছেন তাতে ধরার পঙ্কিলতা স্পর্শ করতে পারে নাই। সে 'প্রেম নিকষিত হেম, কামগন্ধ নাহি তায়।' এখানে পাওয়ার ব্যাকুলতা নেই তাই নিবেদনেও সঙ্কোচ নেই। কিশোর গেয়ে উঠলো,

> 'কাছে কাছে নাইবা এলে, তফাৎ থেকে বাসব ভাল
> দুটি প্রাণে আঁধার মাঝে প্রাণে প্রাণে পিদীম জ্বাল !
> এপার থেকে গাইব গান, ওপার থেকে শুনবে বলে ;
> মাঝের যত গণ্ডগোল ডুবিয়ে দেব গানের রোলে।'

যৌবনে চিরসুন্দরকে কাছে পাবার ব্যাকুলতার কঠিন অন্তর্দাহের আঘাতে যে আনন্দ হতে তিনি নিজেকে বঞ্চিত করেছিলেন আত্মত্যাগের মধ্যে—সেই আনন্দ আজ কানায় কানায় উথলে পড়তে লাগলো। নিজে উর্দ্ধাতীত এই পথের নায়ক তিনি নন, দর্শক মাত্র—দর্শনেই আনন্দ।

> "প্রথম সাক্ষাতে, সাঁঝের আঁধারে
> ধূসর গগন তলে
> নবশ্যাম দূর্ব্বাদলে"।

দুজনে দুজনের মন অধিকার করলো ;

"অখণ্ড সুন্দর তনু মধুর গম্ভীর,
রূপ রস গন্ধ ভরা আত্মার মন্দির !
পদতলে কলকলে কল উর্ম্মিমালা।'
শিরে কোন দেবতার নিত্য দীপ জ্বালা !"

কিন্তু কিশোরীর মুখে হাসি ! সে কি সন্দেহের ? না, এখানে সন্দেহের কোন প্রশ্নই আসতে পারে না, বিশ্বাস। তাই বৈষ্ণবের মূলমন্ত্র 'বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ'। অহর্নিশি সে মূরতি স্রোতে ভেসে ভেসে দিশাহারা কিশোর-রূপী কবিমন বলে উঠল ; আমাকে বিশ্বাস কর। সন্দেহের হাসিতে আর আমাকে বিদ্ধ করো না, আমি জানি ;—'নহ মিথ্যা সত্য তুমি ! সত্যরূপাধার।' কবির অন্তরে যেন অখণ্ড রূপের পরমানুভূতি ! এতো শুধু নয়নগ্রাহ্য পার্থিব রূপ নয় ! এ রূপ ভক্তই ভগবানে উপলব্ধি করেন। হৃদয়ের ভালবাসার এ রূপ নয় ; ভক্ত ও ভগবানের একাত্মতার এ রূপ ! যে মোহন মুরতি হেরি বিহ্বল বাসনা জাগিয়ে দেয়, এ তা নয় ; তবে কি এ ?

"সেই সেই তরঙ্গিত পরাণ মুরতি
সকল চাঞ্চল্য ভরা অচঞ্চল গতি !
সকল লাবণ্য গড়া রূপে ঢল ঢল,
পরাণ তরঙ্গে সেই স্থির শতদল।
সঘন গগনে থির চপলার মত
উজলি জীবন মোর জ্বলে অবিরত !
সকল করম মাঝে সব কামনায়
সকল ভাবের মাঝে সব ভাবনায়।"

এ সেই রূপ যা সকল ভাবের মাঝে সব ভাবনায় ওতঃপ্রোত

ভাবে মিশিয়ে আছে। তখন সেখানে আর দুই নেই, ভক্ত অন্তর্লোকে তখন ভগবানে বিলীন!

তারপরই কবি গেয়ে চলেছেন যুগ যুগান্তের প্রেম-সঙ্গীত। সন্ধ্যাকাশ তলে দোঁহার মিলন, সেকি শুধু মুহূর্তের লীলা? এর জন্য কি সমগ্র জীবন-লীলায় জন্ম জন্মান্তর ধরে আয়োজন করতে হয়নি? ফুল যেমন তার ভরা রূপের ডালি নিয়ে একদিনেই ফুটে ওঠে না! তার ফোটবার জন্য যে বহু আয়োজনের প্রয়োজন। কবি তাই নিজ জীবনের বিবর্ত্তন ও বিকাশই যেন বিবৃত করে বল্লেন;

"কেমনে উঠিবে ফুটি শুধু একদিনে
আরে আরে ফুল যবে হেসে ফুটে ওঠে
শ্যাম পল্লবের বুকে, সুখ সূর্য্য করে
একটি প্রভাত লাগি, এক নিমেষের
মাঝে, সে কি শুধু সেই মুহূর্ত্তের লীলা?
তার তরে করেনি কি আয়োজন
সমগ্র জীবন লীলা যুগ যুগান্তর,
জন্ম জন্মান্তর ধরে? অনন্তাকাশের
শুভ সঙ্গীতের মাঝে উঠে সে ফুটিয়া,
ফুটে না ফুটে না ফুল শুধু একদিনে।"

ইহা সেই চিরনূতন রসোল্লাসের কথা। জন্মজন্মান্তর ধরে যুগে যুগে পরাণ বধুকে বুকে রেখেও তো প্রাণ জুড়াল না! নয়নের তৃষা মিটিল না, জন্ম জন্মান্তরে কত রূপে কতবার দেখেও তো পরিচয় হলো না! আকাঙ্খার বস্তুকে পেয়েও প্রাণ তৃপ্ত হলো না কেন? প্রেয়র মধ্যে শুধু ডুবে থাকলে তো শ্রেয়কে পাওয়া যায় না! যুগ যুগান্তরের পাওয়া তো তখনি সার্থক হয়ে উঠবে, যখন প্রেয়র মধ্যে

শ্রেয়কে পাব। তাই কবি তাঁর মর্ম্মবীণায় সেই আসল সুরটির ঝঙ্কার তুললেন ঃ--

"ওরে দেখ্ দেখ্ দেখ্ কি ধুম লেগেছে
পরাণ কমল মাঝে কে জানি জেগেছে !"

তারপর ?

"যুগে যুগে পাওয়া না পাওয়া মিলন
যেন রে সার্থক হ'ল ! পুরিল জীবন।"

এ পাওয়ার আনন্দ আর ধরে না ! আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার এ মধু মিলনে উল্লসিত প্রাণের গান কবি ছড়িয়ে দিলেন বিশ্বের সবাকার মাঝে ; প্রাণে গেয়ে উঠলেন ;

"ওগো ফুল ওগো মিষ্টি
ধন্য ধন্য সব সৃষ্টি !
ধন্য আমি ধন্য তুমি
পুণ্য সে মিলন ভূমি !
কে বলেরে ধন্য ধন্য ?
কে দেয়রে করতালি ?
তোমার আমার মাঝে
অপর কেহ কি আছে ?
কে বলেরে ধন্য ধন্য
এ কার নুপুর বাজে ?
কার পদ রজঃ
পরাণ পঙ্কজ
শোভা করে ? হে মিলিত ! হে মধু মিলন
হে পূর্ণ অপূর্ণ তুমি ! ধন্য এ জীবন।"

এই পাঁচখানি কাব্য গ্রন্থ ছাড়াও পিতৃদেবের বহু কবিতা "নারায়ণে" এবং তার পূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর বহু কবিতা এখনো অপ্রকাশিত রয়েছে। 'কিশোর-কিশোরী' প্রকাশিত হবার পর তাঁর আর কোন কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। এইখানেই তাঁর কাব্য জীবনের পরিসমাপ্তি এবং রাজনৈতিক জীবনের আরম্ভ। যে চিন্তাধারা তিনি ছন্দে প্রকাশ করেছিলেন, তাই রূপান্তরিত হলো তাঁর কার্য্যে। 'অন্তর্য্যামী'র অন্তরের বৈরাগ্য পরবর্ত্তী জীবনে তাঁকে দেশের জন্য সন্ন্যাসী সাজিয়েছিল। তাঁর অন্তরের গভীর প্রেমই তাঁর হৃদয়ে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে দেশমাতৃকাকে মুক্ত করবার বাসনা জাগিয়ে দিয়েছিল, ভাবের রাজ্য থেকে তিনি কর্ম্মের রাজ্যে চলে এলেন। জীবনে কাব্যের যে সুরটিতে তিনি বিভোর হয়েছিলেন, একনিষ্ঠ ভাবে কাব্য সাধনা করতে পেলে হয়তো সে সুরের মধুর মূর্চ্ছনায় কাব্য জগতেও, তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারতেন। তাই সাহিত্যের মধ্য দিয়েও তাঁর জীবনী আমাদের অবশ্য আলোচনীয়।

১৯১৪ সালে দাদামণির মৃত্যুর পর পিতৃদেব প্রথম "নারায়ণ" পত্রিকা প্রকাশিত করেন। বাঙ্গলার প্রাণ ধারার সন্ধান নেবার এবং দেবার উদ্দেশ্য নিয়েই এ পত্রিকা প্রকাশিত হয়। আমাদের তথাকথিত ইংরাজী শিক্ষিত সমাজে তখন বাংলার সংস্কৃতির আদর ছিলনা ; বিশেষ করে দেশের সংস্কৃতির দিকে এ সমাজের তেমন দৃষ্টি ছিল না বল্লেও চলে। তাই বাবা 'নারায়ণ' পত্রিকা বার করে সমাজের এ অংশটিকে সচেতন করবার এবং সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলা সাহিত্যকে একটা নূতন রূপ দিয়ে তার হৃতমান পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়াস পান।

এই 'নারায়ণে' বহু লব্ধ-প্রতিষ্ঠ লেখক ও লেখিকারা গল্প, প্রবন্ধ,

কবিতা ইত্যাদি লিখতেন। তাঁদের মধ্যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ব্রজেন্দ্র নাথ শীল, বিপিন চন্দ্র পাল, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, জলধর সেন, পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্র নাথ গুপ্ত, গিরিজা শঙ্কর রায় চৌধুরী, গিরিন্দ্র মোহিনী দাসী, জগদম্বা দেবী, সুরেশ চন্দ্র সমাজপতি, নাটোরের স্বর্গীয় মহারাজা জগদীন্দ্র নাথ রায়, প্রিয়ম্বদা দেবী, ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী, কবিশেখর কালিদাস রায়, কিরণ শঙ্কর রায়, হেমন্ত কুমার সরকার, সুকুমার রঞ্জন দাস, হেমেন্দ্র নাথ দাসগুপ্ত এবং আরো অন্যান্য বহু লব্ধ-প্রতিষ্ঠ লেখক 'নারায়ণে' তখন লিখতেন।

সকলের নাম আমার ঠিক মনে নেই এবং সত্যই দুঃখের কথা যে আজ এই অমূল্য মাসিক পত্রিকার পুরাণ সব সংখ্যা আমাদের কাছেও নেই। পিতৃদেবের মৃত্যুর পর আমাদের কাছ থেকে পড়তে নিয়ে গিয়ে অনেকেই সে সব আর ফিরিয়ে দেন নি।

পিতৃদেবের রচিত কয়েকটি গীত "আজিকে বঁধু থেকনা দূরে," "মিটাও না এই পিপাসা", "মেঘের মাঝে ওই যে ভাসে, নীল সাগরের নীলমণি," "দাও দাও প্রাণের নিধি," "এই সে তমাল তলে" প্রভৃতি 'নারায়ণে' প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর কাব্য 'অন্তর্য্যামী,' 'কিশোর-কিশোরী'. 'ডালিম' ও 'প্রাণ-প্রতিষ্ঠা' নামে দুটি গল্পও এতে প্রকাশিত হয়ে ছিল।

তিনি প্রথম বর্ষের 'নারায়ণে' (১৩২১-ফাল্গুন) চণ্ডীদাস থেকে কৃষ্ণকমল গোস্বামী পর্য্যন্ত সমগ্র কবিতার যে একটি অক্ষুণ্ণ ধারা প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে, "বাঙ্গলা কবিতার প্রাণ-ধারা" নামে প্রকাশিত করেছিলেন।

বিষয়টি সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন; "আমাদের প্রত্যেক প্রত্যক্ষের, প্রত্যেক ভাবের, প্রত্যেক সম্বন্ধের একটা অন্তঃ-প্রকৃতি

আছে। সকল বহিরাবরণের মধ্যে এই অন্তঃ-প্রকৃতির অনুসন্ধানই মনুষ্য-জীবন। সকলেই সেই একই অনুসন্ধান করিতেছে। আমরা সকলেই সেই অন্তঃ-প্রকৃতির, সেই প্রাণের খোঁজে ব্যস্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াই। যাহাকে জীবনের অনন্ত মুহূর্ত্ত বলি, সেই অনন্ত মুহূর্ত্তে সেই প্রাণেরই সাক্ষাত লাভ হয়। আর সেই মুহূর্ত্তেই আমাদের হৃদয় মন রসোচ্ছাসে অধীর হইয়া পড়ে। তখনই কবিতার সৃষ্টি হয়। এই যে অপূর্ব্ব মিলন, জীবন তাহার মহামন্দির। ইহাই কবিতার রাজ্য। এ মিলন-মন্দির সত্য। সত্যকে ছাড়িয়া দিলে কোন কবিতাই সম্ভব হয় না। সে মন্দিরে যে সঙ্গীত-স্রোত চিরকাল প্রবাহিত হইতেছে, তাহাতে অবগাহন করা চাই।"

পিতৃদেব বৈষ্ণবমহাজন কবি চণ্ডীদাসের অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন। চণ্ডীদাসের পদাবলী তাঁকে অভিভূত করেছিল। তিনি 'নারায়ণে' প্রকাশিত তাঁর 'বাংলার গীতি কবিতা'য় বলেছিলেন, "চণ্ডীদাসকে আমি সর্ব্বপ্রধান কবি বলে মনে করি। চণ্ডীদাসের লিখিত যে গীতিকাব্য, ইহাই বাঙ্গালার যথার্থ গীতিকাব্য; এই কবিতাগুলির মধ্যে যে প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়, তাহাই বাঙ্গলা-গীতি-কবিতার প্রাণ। প্রাণের সঙ্গে, মর্ম্মের সঙ্গে, ভাষার সঙ্গে, ভাবের সঙ্গে, কর্ম্মের সঙ্গে, ধর্ম্মের সঙ্গে,—জীবনের সঙ্গে বাহিরের ও ভিতরেব এমনই—প্রাণস্পর্শী মিলন। বাঙ্গালী জানুক আর নাই জানুক, বুঝুক আর নাই বুঝুক, আমার বাঙ্গলার প্রাণ সে মহামিলনে ভোর হইয়া আছে। সেই মহামিলন মন্দিরে পূজা যে নিয়ত চলিতেছে; বাংলার গান, তাহার আরত্রিক--বাংলার ভাষা, তার মন্ত্র। সেই বাংলার কবি চণ্ডীদাস। সেই কবিতা বাঙ্গালীর কবিতা।" তিনি প্রায়ই বলতেন, 'বাঙ্গলার মাটির অন্তরের খাঁটি রসের সন্ধান দিয়েছেন আমাদের চণ্ডীদাস।' তাই হয়তো

তিনি চণ্ডীদাসকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। 'চণ্ডীদাস প্রেমের কবি' এ কথা প্রায়ই তিনি বলতেন। তাঁর মতে জীবনের বহিরাবরণ ভেদ করে যে অন্তঃপ্রকৃতির সন্ধান পায়, সে-ই কবিতা-রাজ্যে প্রকৃত প্রবেশাধিকারী। সে জন্যই তাঁর মতে চণ্ডীদাস ছিল তাঁর কাছে বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ কবি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি বলেছিলেন, 'কৃষ্ণপ্রেমে মজিয়া যখন রাধিকা কুলমানের কথা ভাবিয়া আক্ষেপ করিতেছেন'—

"অন্তরে বাহিরে কুটু কুটু করি
সুখে দুখ দিল বিধি।"

চণ্ডীদাসের কবিমন তখন একেবারে মনের বাহিরাবরণ ভেদ করে সেই মিলন-মন্দিরে প্রবেশ করলো—

'কহে চণ্ডীদাস শুন বিনোদিনী
সুখ দুখ দুটি ভাই
সুখের লাগিয়া যে করে পিরীতি
দুখ যায় তারি ঠাঞি।'

পিতৃদেব বিষাদ করুণসুরে বলতেন 'আজকাল এমন কবিতা শুনতে পাইনা। আর কি কখনো শুনতে পাব না?' চণ্ডীদাসের 'সই, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম' শুনলে বাবা অস্থির হয়ে যেতেন, বলতেন তিনি 'এই তো সে মহামিলন মন্দিরের গীতধ্বনি, জীবনের সকল গীতই এই মিলন মন্দিরে নিরন্তর ধ্বনিত হয়, তাই এত শতাব্দীর পরও গানটি পড়িলেই মনে হয়,'—

'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।'

এ সুর কোন ভাষায়, কোন সাহিত্যে পাওয়া যায়?"

১৯১৭ সালে বাঁকীপুর বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে বাবা সাহিত্য-শাখার সভাপতি রূপে 'বাঙ্গালার গীতি কবিতা' সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ পাঠ করেন, 'নারায়ণে' তা প্রকাশিত হয়। তাতে তিনি বৈষ্ণব কবিতাকে বাংলার প্রাণের অভিব্যক্তি বলে, বলেছিলেন; -

"কেহ কেহ বলেন বৈষ্ণব-পদাবলী-সাহিত্য রূপক। মানুষের নিজের, অর্থাৎ বৈষ্ণব কবিগণের নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা ও সত্যের উপরে নাকি তাহার প্রতিষ্ঠা নহে। কোনটা সত্য, কোনটা মিথ্যা, তাহাকে কল্পনা করিয়া লইয়া ও ইউরোপীয় সাহিত্যের অভিজ্ঞতাকে সেই কল্পনার সাহায্যে আপনার অভিজ্ঞতা মনে করিয়া লইয়া সেই অভিজ্ঞতা দিয়া বৈষ্ণব সাহিত্য ও বৈষ্ণব কবিতা বুঝিতে গেলে, বোধহয় রূপকের আবশ্যক হয়। কিন্তু বৈষ্ণব কবিদিগের প্রত্যেক অনুভূতি যে তাঁহাদের হৃদয় ও প্রাণের পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতার উপরেই স্বাধিষ্ঠিত। বৈষ্ণব কবিতার মধ্যে প্রাণের সাড়া পাই। বৈষ্ণব কবিদের শ্রীকৃষ্ণ কাল্পনিক নহে। বৈষ্ণবের শ্রীরাধা তাঁহাদের জীবনের, প্রাণের, মর্ম্মের শতদলের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। এই যুগল, সভ্যতা সাধনা, শিক্ষা, দীক্ষার মধ্যে শত শত বিচিত্র রূপ প্রকাশিত করিয়াছে।' তিনি আরো বলেছিলেন 'চণ্ডীদাসের কবিতাই বৈষ্ণব কবিদের ভাব মাধুর্য্যের আদর্শ।"

'নারায়ণে' প্রকাশিত পিতৃদেবের আর একটি প্রবন্ধ 'রূপান্তরের কথা'। তাতে একস্থানে তিনি বলেছিলেন; —'রূপে ধরা দিবার জন্যই ভাব প্রাণের অন্তরে অন্তরে গুমরিয়া উঠে। ভাব যতই রূপের ভিতর দিয়া স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে, ততই তাহার সৌন্দর্য্য বাড়ে। ভাব যখন সত্য সত্যই রূপের কাছে ধরা দেয় তখনই

তাহা মধুর ও সুন্দর। সত্য যখন মানবমনে প্রতিভাত হয়, ভাব যখন সেই আকারে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে, তখন সে ভাব কাল্পনিক নহে, সত্যের আভাষ নয়, তাহা রূপ, তাহাই সত্যস্বরূপ। সত্যের রাজ্যে নিত্য যে লীলা চলিয়াছে তাহাতে ভাব ও আকারে পার্থক্য নাই। সে লীলা কাব্যলোকের নিভৃত মিলন কেন্দ্র।" 'রূপান্তরের' উপসংহারে তিনি বলেছিলেন -'আমি বলতে চাই যে একমাত্র চণ্ডীদাসের গান ছাড়া বাংলা গীতি-কবিতাব শেষযুগে রাম প্রসাদের গানে সেই রূপান্তর হইয়াছে। চণ্ডীদাসের প্রাণের যে সৌন্দর্য্য তাহার কল্পকলার যে সৃষ্টি, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি মহাপ্রভুর জীবনে হইয়াছিল। মহাপ্রভুর জীবনের মত এত বড় কাব্য আর কখনো রচিত হয় নাই। সাধক রামপ্রসাদ যে রসের আদর্শ আনিয়া দিয়াছিলেন, তাহার সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি কাহার জীবনে যে ফুটিয়াছে, একথা এখন নাই বলিলাম। চণ্ডীদাসের জীবনে রূপান্তর হইয়াছিল; তাঁহার সৃষ্টিই তাহার প্রমাণ। রামপ্রসাদের জীবনেও রূপান্তর হইয়াছিল, তাঁহার সৃষ্টিও তাহারই প্রমাণ।'

এই সব প্রবন্ধ ছাড়া 'নারায়ণে' বাবার দুটি গল্পও প্রকাশিত হয়, একটি 'প্রাণ প্রতিষ্ঠা' ও অন্যটি 'ডালিম'। প্রসিদ্ধ কথাশিল্পী শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দুটি গল্পেই মুগ্ধ হয়েছিলেন। এই 'নারায়ণের' যুগেই বাবার সঙ্গে তাঁর বিশেষ সৌহার্দ্দ হয়। 'ডালিম' প্রকাশিত হলে শরৎবাবু একদিন তাঁকে বল্লেন "আপনি যে ছোট গল্পও লেখেন, তাতো জানা ছিল না"? বাবা হেসে বল্লেন, "দেখছেন তো! আমার দুঃসাহসের অন্ত নেই!" শরৎবাবু তখন বলেছিলেন "আপনার এই দুঃসাহসের জন্য আমার অন্তরের অভিনন্দন জানাচ্ছি।"

সমাজ-পরিত্যক্তা অভাগিনী ডালিম প্রেমাস্পদের জন্য দৈহিক

ভালবাসা অতিক্রম করে, প্রেমিকের প্রেমমাত্র হৃদয়ে সম্বল করে তার ঐহিক সুখ ঐশ্বর্য্য সব কিছু ত্যাগ করে, প্রেমের যে দীপটি জ্বালিয়ে দিল, পিতৃদেব এই কলঙ্কিতার সে নির্ম্মল প্রেমের কাহিনী করুণ রসে সিক্ত করে তার জীবন্ত চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরেছিলেন। ডালিমের ব্যথাতুর প্রাণের লিপি -'এ জন্মে হইলনা, জন্মান্তরে যেন তোমার দেখা পাই' আমাদের মর্ম্ম স্পর্শ করে। পতিতা রমণীর যে হৃদয় আছে, সে হৃদয়ে নিঃস্বার্থ প্রেমও যে স্থান পেতে পারে এবং সে প্রেমের মর্য্যাদা রক্ষা কল্লে তারাও যে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করতে পারে; এটা দেখানই বোধ হয় পিতৃদেবের উদ্দেশ্য। আর হৃদয়ধর্ম্মের কাছে ছোট বড়, উচ্চ নীচ, সতী অসতীর তারতম্য নেই; নির্ম্মল, শুদ্ধ প্রেমদীপে সবাকারই হৃদয় সম-আলোকিত হয়, এও বোঝাতে চেয়েছিলেন তিনি।

এর পর তিনি 'নারায়ণে' 'প্রাণপ্রতিষ্ঠা' গল্প লিখেছিলেন। ডালিমের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-জনিত যে প্রেম অতীন্দ্রিয়ের দিকে প্রসারিত হয়েছিল, সে প্রেমই পূর্ণ পরিণতি লাভ করে 'প্রাণ-প্রতিষ্ঠায়।'

'প্রাণ-প্রতিষ্ঠায়' বালবিধবা আশালতা তার দূরসম্পর্কীয় তুলিদাদাকে ভালবাসত, তুলিদাদারও ধ্যান ছিল এই 'লতা। তার মনে কোন কুভাব ছিলনা। লতা যেন তার আরাধ্যা দেবী। অন্তরের অন্তস্তলেই সে তার আরাধ্যা দেবীকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এভাবে যেন প্রাণ-প্রতিমারই পূজা করে যেত সে। আশালতা তার 'তুলি' দাদার কাছেই লেখাপড়া শিখতো; প্রত্যহ পরস্পরের এই সহচর্য্যে একদিন মুহূর্ত্তের ভুলে তারা বুঝল যে তাদের প্রেম-পূজার মন্দির ভেঙ্গে গিয়েছে। আর্ত্তকণ্ঠে 'তুলি' বলে উঠল, "একি করলে প্রাণ সুন্দর! বাসনা কি এমন অন্তঃসলিলা হইয়া লুকাইয়া থাকে?"

প্রেমিক উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে পালাল। কিন্তু সে পালালেও লতার চিন্তা তাকে ত্যাগ করলো না। সে বুঝে উঠতে পারলো না যে এত বাসনা, এত লালসা কেমন করে তার প্রাণের মধ্যে লুকিয়েছিল। 'তুলি' দাদা মুখে যতই 'নিবৃত্তি, নিবৃত্তি' বলুক 'প্রবৃত্তি' তাকে সাপের মতই জড়িয়ে ধরল। তাই তার মুখের ডাক 'দেবতা', মনে প্রতি-ধ্বনি তুললো 'লতা'; এই অন্তর্দ্বন্দ্বে 'তুলি' যখন যমুনায় দগ্ধপ্রাণ শীতল করতে চল্ল তখন কে যেন পেছন থেকে বলে উঠলো 'পাগল'! 'পাইয়া ছাড়িতেছিস? লতা যে সত্য সত্যই প্রাণসুন্দরের বিগ্রহ! সে যে তোর ইষ্টমন্ত্র! ফের্, ফের্, জপ কর, ধ্যান কর্' মন্ত্র জপ করতে করতে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড টলমল করে উঠলো, অন্তরে তখন 'আমি' নেই 'তুমি' নেই, সেখানে তখন শুধু প্রেম বিরাজিত। তুলি দা, অনুভব করলো যে "লতা তাহার প্রাণসুন্দরের জাগ্রত বিগ্রহ।" পিতৃদেবের শিল্পী মনে চণ্ডীদাস ও রামীর লীলাই কি রূপান্তরিত হলো "প্রাণপ্রতিষ্ঠার" নায়ক নায়িকার জীবনে?

কথাশিল্পে 'নারায়ণ' নূতন পথেরই সন্ধান দিল। সাহিত্যে, গল্পে, কবিতায়, প্রবন্ধে, ধর্ম্মে, দেশাত্মবোধে, সবদিক থেকেই এক নূতন যুগের সূচনা করেছিল। অনেকের মতে, রবীন্দ্রনাথের অত কঠোর সমালোচনা না থাকলে 'নারায়ণ' সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হতো। কিন্তু একথা সত্য যে সব যুগে, সব মনিষীদেরই সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। রবীন্দ্র-লেখনী ও আশীর্ব্বাদপুষ্ট 'সবুজ পত্রে পিতৃদেবও কঠোর ভাবে সমালোচিত হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, সমগ্র জীবনভরেই সে আঘাতে জর্জ্জরিত হয়েছিলেন তিনি। পিতৃদেব যখন 'রবিদ্বেষী' বলে সমালোচিত হলেন, তখন তিনি বল্লেন "কথাটা ঠিক হলো না, আমি রবিদ্বেষী একেবারেই নই, তাঁর অলৌকিক প্রতিভা আমি কখনো অস্বীকার করি না, তবে

তাঁর সব লেখাই যে আমার ভাল লাগে তা বলতে পারি না।" তিনি রবিদ্বেষী হলে 'মালঞ্চে' লিখতে পারতেন না "এ নহে রবির লেখা সুন্দরী সনেট।" রবি-বিদ্বেষী তিনি কখনো ছিলেন না, তবে একথাও সত্য রবীন্দ্রনাথের সব লেখারই অন্ধ স্তাবক ছিলেন না তিনি।

অজিত চক্রবর্ত্তীর লেখা 'মহর্ষির জীবন চরিতে'র ধারাবাহিক সমালোচনা 'নারায়ণে' প্রকাশিত হয়েছিল। অনেকে ইহাকে রবি-বিদ্বেষপ্রসূত বলে মনে করেছিল। বাবা শুনে বলেছিলেন, "লোকের মনে করার উপর আমার কোন হাত নেই, তবে অজিত চক্রবর্ত্তীর বইতে যে ভুল রয়েছে তার সংশোধন হওয়া দরকার মনে করেই এ সমালোচনা প্রকাশ করতে দ্বিধা করিনি।" বিদ্বেষ-বশে কোন কিছু তিনি জীবনে কখনো করেন নি।

পিতৃদেবের সম্পাদনায় ৩।৪ বৎসর 'নারায়ণ' পত্রিকা অব্যাহত ভাবে চলেছিল; আইনসংক্রান্ত শত কাজে লিপ্ত থেকেও তিনি নারায়-ণের মাধ্যমে বহু তথ্যপূর্ণ কথা শোনাতে পেরেছিলেন। নলিনী ভট্টশালীর "মধুসূদনের নাট্যপ্রতিভা," হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর "বৌদ্ধধর্ম্ম" প্রবন্ধ ব্যতীত তাঁর "বঙ্কিম বাবু ও উত্তরচরিত" "কালিদাসের মেয়ে দেখান," "দুর্গোৎসব" "নব পত্রিকা", "সীতার স্বপ্ন" ও "শকুন্তলার মা" প্রভৃতি, হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষের "ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র", উপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের "দীপান্তর", বারীন্দ্রনাথ ঘোষের "নির্ব্বাসিতের আত্ম-কথা", বিপিনচন্দ্র পালের "শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব", "মৃণালের কথা" স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের "মাইকেল মধুসূদন ও বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ" কালীপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়ের "চলিত ভাষা ও সাধুভাষা", "সেকালের বসনভূষণ", যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের "চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশ", কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের গল্প "স্বামী", সরোজ নাথ ঘোষের

"ছোট গল্প", সত্যেন্দ্রনাথ গুপ্তের "কমলের দুঃখ", গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরীর "মডেল নায়িকা", "দোসরা নম্বর", রহস্যপূর্ণ প্রবন্ধ, গিরিন্দ্র মোহিনী দাসী, সরলাবালা দাসী ও প্রিয়ম্বদা দেবীর কবিতা সমূহ, এছাড়া নারায়ণ ভট্টাচার্য্য, মানিক বন্দোপাধ্যায় এবং আরো অনেক প্রবীন ও নবীন লেখকেরা তাঁদের লেখা দিতেন "নারায়ণে।"

"নারায়ণের বঙ্কিম সংখ্যা" অতুলনীয় হয়েছিল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ক্ষীরোদ বিদ্যাবিনোদ প্রমূখ বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণের সঙ্গে পরামর্শ করে ১৩২২ বঙ্গাব্দে বৈশাখ মাসে 'নারায়ণ বঙ্কিম সংখ্যা' প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে বাবা বলতেন 'বঙ্কিমচন্দ্র একজন ব্যক্তি নহেন, তিনি একটি যুগ।" সেই যুগ-পুরুষকে পিতৃদেব অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন 'নারায়ণ বঙ্কিম সংখ্যা'তে বঙ্কিমের অসংখ্য ভক্তবৃন্দের নৈবেদ্য সাজিয়ে।

তরুণ লেখকদের তিনি প্রচুর উৎসাহিত করে, দেশের সাহিত্যিকদের মর্য্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। 'নারায়ণ' পত্রিকার লেখক লেখিকাগণ তাঁদের পরিশ্রমের উচিত মর্য্যাদা সর্ব্বদা পেতেন। এই সূত্রে ভোম্বল এবং আমাকে তিনি 'নারায়ণ' সেবার সুযোগ দিয়েছিলেন, এবং তাও দিয়েছিলেন, পিতা হয়ে পুত্র কন্যাকে নয়, সহানুভূতিশীল, উৎসাহদাতা সম্পাদক হয়ে তরুণ লেখক ও লেখিকাকে।

মাসিক পত্রিকায় বাংলা ভাষার গাম্ভীর্য্য এবং সাবলীলতা নষ্ট হবার উপক্রম দেখে 'নারায়ণ' তীব্র প্রতিবাদ করে। বঙ্কিমচন্দ্রই চল্‌তি ভাষা ও গুরুগম্ভীর ভাষার মিলন করিয়ে দিয়ে বঙ্গভাষার এক অশেষ কল্যাণময় যুগের সূচনা করে গিয়েছিলেন। উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনীর সভাপতিরূপে প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের অভিভাষণ

'সবুজপত্রে' প্রকাশিত হয়, তাতে তিনি বলেছিলেন, "আমরা মৌখিক ভাষাকে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাই, কারণ সে ভাষা সহজ, সরল, সুঠাম এবং সুস্পষ্ট। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কথোপকথনের ভাষাই প্রকৃত সাধুভাষা।" 'নারায়ণে'র প্রসিদ্ধ লেখক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহামহোপাধ্যায় মহাশয় বর্দ্ধমান সাহিত্য সম্মিলনে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কথিত ভাষার একটু নমুনা দিলেন—"আমি ল্যাণ্ডো গাড়ীতে ড্রাইভ করতে করতে ষ্টেশনে পৌঁছে বেনারসের জন্য বুক করলাম, ফার্ষ্ট ক্লাসে লোয়ার বার্থ ভেকেন্ট ছিলনা, তাই আপার বার্থে বেডটা স্প্রেড করে একটু সর্ট ন্যাস নেবার চেষ্টা করছি, এমন সময় হুইসিল দিয়ে ট্রেন ষ্টার্ট কল্লে।" আবার অন্যদিকে শাস্ত্রী মহাশয় নবদ্বীপ, ভাটপাড়া, বিক্রমপুর প্রভৃতির ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের ভাষার কথা উল্লেখ করে বল্লেন, "ইহারাও তো শিক্ষিত" তাঁরা যে ভাষা ব্যবহার করেন, সাধারণ লোক তা করেনা, যেমন 'কলম' না বলে তাঁরা বলেন 'লেখনী', দোয়াত হলো 'মস্যাধার', 'আমার কপাল' না বলে বলেন 'দুরদৃষ্ট', 'ছেলেবুড়ো' না বলে বলেন 'আবালবৃদ্ধ', আদালত না বলে 'বিচারালয়' বলেন ইত্যাদি।" 'নারায়ণ' লিখলো, "ভাষা এমন হওয়া চাই, যাহা সমগ্র বাঙ্গালীজাতি ব্যবহার করিতে পারে"। এসময় ১৩২২—আষাঢ় মাসের 'নায়ায়ণে' পিতৃদেবের সহপাঠী 'ধ্রুবতারা' উপন্যাস লেখক যতীন্দ্রমোহন সিংহের "ভাষার কথা" একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। প্রবন্ধটি পিতৃদেব খুব প্রশংসা করেছিলেন। লিখিত ভাষার প্রচলনই 'নারায়ণ' অনুমোদন করে। উদাহরণস্বরূপ দেখিয়ে দিলেন পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের শিক্ষিত লোকের কথিত ভাষা একরকম নয়। যেমন লিখিত ভাষা 'আমি করিতে পারিব না'—সমস্ত বাঙ্গালীর বোধগম্য কিন্তু কথিত ভাষা হলো—

কলকাতা বলবে—"আমি কোর্ত্তে পারবো না"
যশোহর —"আমি কর্ত্তে পারব না"

ঢাকা বলবে—"আমি করতে পারুম না"
ময়মনসিংহ „ —"আমি কর্ত্তাম পার্ত্তাম না"
নোয়াখালী „ —"আমি কর্ত্তাম হার্ত্তাম না"

এইসব বাদানুবাদে 'নারায়ণের' প্রচেষ্টাই সফল হলো। শিক্ষিত লোক সহজ সরল বোধগম্য ভাষায় বাংলা লিখলে সমস্ত বাঙ্গালীর একভাষা হবে 'নারায়ণের' এই সিদ্ধান্ত সকলে অনুমোদন করলেন।

'নারায়ণের' সঙ্গে পিতৃদেবের জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ জড়িত ছিল এবং সাহিত্য সাধনার ছেদ পরার সঙ্গে সঙ্গেই একটা বিরাট অংশের পরিসমাপ্তি ঘটে।

"ভাবনা ছাড়িনু তবে ; এই দাঁড়াইনু আমি
যেপথে লইতে চাও লয়ে যাও অন্তর্য্যামী।" বলে তিনি স্বরাজ-সংগ্রামের পথে অগ্রসর হলেন। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে রচিত হলো নূতন অধ্যায়। পিতৃদেবের শিরে ভারতের ভাগ্যবিধাতা পরায়ে দিলেন দুঃখের মণিমুকুট। ইংরেজের কারাগার তাঁকে অভ্যর্থনা জানালো।

"নারায়ণের" প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায় এই সময়। এর পর পিতৃদেবের সম্পাদনায় 'বাংলার কথা' সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পরে মাতৃদেবীর সম্পাদনায় কিছুদিন তা প্রকাশিত হ'বার পর 'বাংলার কথা' আবার বন্ধ হ'য়ে যায়।

—*::)(*)(::*—

ভাগলপুর ও মায়াবতী

১৯১৫ সালে লছমীপুরের বাণীকুসুম কুমারীর মোকর্দ্দমায় বাবার ভাগলপুর যেতে হয়েছিল। বহুদিন ধরে এ মোকর্দ্দমা চলবে জেনে বাবার সঙ্গে আমরাও গিয়েছিলাম।

গঙ্গার ধারেই দীপ নারায়ণ সিং এর বাড়ী আমাদের জন্য ঠিক করা হয়েছিল---বাবা উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন গঙ্গার শোভা দেখে। কবি মন তাঁর এ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ডুবে গেল। এই বাড়ীতে পিছন দিকের ছাতে আমরা কত সন্ধ্যাই না কাটিয়েছি পিতৃদেবের সঙ্গে। প্রতি রাত্রেই বাবার মোকর্দ্দমার কাজের অন্তে এখানে ছোট খাট একটি সাহিত্য ও সঙ্গীতের সভা বসতো বল্লেও চলে। ভাগলপুরের এডভোকেট ও বাঙ্গলার বিশিষ্ট সাহিত্যিক শ্রীউপেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে বাবা এখানেই বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হন। তিনি সুগায়কও ছিলেন—এবং এখানেই বাবার লেখা অনেক গানে তিনি সুর দিয়েছিলেন। তাঁর আবেগ পূর্ণ গান বাবা বড়ই ভালবাসতেন। এত মোকর্দ্দমার কাজের চাপেও বাবা কিন্তু তাঁর সাহিত্য সেবা ত্যাগ করেননি। এখানেই তিনি 'প্রাণ প্রতিষ্ঠা' গল্প লিখতে আরম্ভ করেন। প্রতিদিনকার সাহিত্য ও সঙ্গীতের আসরে ভাগলপুরের বহু লোকের সমাগম হোত আমাদের বাড়ীতে। এ সময় তাঁকে দেখলে মনেও হোত না যে এ লোকই আইনের কুট তর্কে সারাদিন লিপ্ত থাকতেন। 'কথকতা' শুনতে তিনি খুব ভালবাসতেন—এসময় ভাগলপুরে শান্তিপুরের মোহনলাল গোস্বামী এসেছিলেন 'কথকতা' করতে—বাবা 'কথকতা'

শুনতে ভালবাসতেন জেনে উপেন বাবু তাঁকে আমাদের বাড়ীতে একদিন এনেছিলেন। বাবা বলতেন "কীর্ত্তন কথকতা ও যাত্রা বাঙ্গলার নিজস্ব সম্পদ— বাংলার প্রাণ, বাংলার ভাব সম্পদ মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে এর মধ্য দিয়ে—এ ভাবধারাকে বাঁচিয়ে রাখা বাঙ্গালীর অবশ্য কর্ত্তব্য"।

পূজার সময় আদালত বন্ধ হলে—মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম থেকে স্বামী প্রজ্ঞানন্দের নিমন্ত্রণ লিপি নিয়ে ব্রহ্মচারী গণেন মহারাজ ভাগলপুর এলেন। মায়াবতী যাবার বাসনা পিতৃদেবের বহুদিন থেকেই ছিল। তাই বহু সাধকের পূণ্যপদস্পর্শধন্য—বিশেষ করে স্বামী বিবেকানন্দের পূত সাধনভূমি—এ পবিত্র স্থান দেখবার এই সুযোগ পেয়ে বাবা উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। তাঁর কথায় গণেন মহারাজ উপেনবাবুকেও যাবার জন্য সাদর নিমন্ত্রণ জানালেন।

যথাসময়ে অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে আমরা মায়াবতী যাবার জন্য রওনা হলাম। আমাদের যাত্রা পথে ছোটমামা সতীন্দ্র নাথ হালদার, বাবার লাইব্রেরীর ক্লার্ক ললিত সেন ও উপেনবাবু সঙ্গী হলেন।

৯০ মাইল পায়ে-চলা পথে পিতৃদেবের সঙ্গে হিমালয় ভ্রমণ কখনো ভুলতে পারবনা—ভুলবার নয়। ভীমতাল, রামগড়, পিউড়া, লামগড়, ময়ূরনালা, দেবীধূরা, ধূণাঘাট, খেতিখানা অতিক্রম করে গৌরচুঙ্গির নিবিড় অরণ্য ভেদ করে আমাদের মায়াবতী যেতে হয়েছিল। শুভ্র-তুষার-মণ্ডিত গিরিরাজের মহান রূপে বাবা তন্ময় হয়েই চলেছিলেন। হিমালয়ের সঙ্গে তাঁর অন্তরের নিবিড় যোগ ছিল বলেই হয়তো তাঁর জীবনের পথ চলার সমাপ্তি হোল হিমালয়েরই বুকে।

মায়াবতী অদ্বৈতআশ্রমে মিসেস্ সেভিয়ার্স বাঙ্গলোতে এসে আমরা উঠলাম। স্বামী প্রজ্ঞানন্দ, সত্যেন মহারাজ, ভরত

মহারাজ, গণেন মহারাজ, এবং আশ্রমবাসী অন্যান্য ব্রহ্মচারীদের যত্ন ও আতিথেয়তা দেখে বাবা মুগ্ধ হয়েছিলেন।

প্রত্যহ সন্ধ্যেবেলা যথারীতি সাহিত্য ও সঙ্গীতের আসরে অদ্বৈতআশ্রমের ব্রহ্মচারী ভ্রাতৃবৃন্দসহ স্বামী প্রজ্ঞানন্দ প্রায়ই উপস্থিত থাকতেন। বাবার সঙ্গে স্বামী প্রজ্ঞানন্দ পরমহংসদেব ও বিবেকানন্দের সম্বন্ধে কত আলোচনাই না শুনে ধন্য হলাম আমরা! মাঝে মাঝে স্বামীজীর সঙ্গে বাঙ্গালার অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের কথা আলোচনা-কালে তাদের স্বদেশপ্রেমের কথা বলতে বলতে বাবার দুনয়নে ধারা বইত। তিনি বলতেন 'পথ তাদের যাই হোক কিন্তু তাদের অন্তরের জ্বলন্ত একনিষ্ঠ দেশপ্রেম, দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের প্রেরণায় তাদের আত্মত্যাগকে আমি শ্রদ্ধা করি—প্রণাম করি' একথা বলার সময় তাঁর সে দীপ্ত আনন যেন আজও চোখের সামনে দেখতে পাই।

এখানে পিতৃদেবের সঙ্গে সকাল-সন্ধ্যা বেড়ানতেই ছিল আমাদের আনন্দ। বেড়াতে বেড়াতে সেই নির্জ্জন বনে মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ভূষিত স্বামী বিবেকানন্দের ভজন গুহার সামনে এসে অন্তর-বৈরাগী পিতৃদেব আত্মসমাহিত হয়ে যেতেন—নির্ব্বাক হয়ে আমরা অনুভব করতাম ভোগীর যোগীতে রূপান্তর।

"তোমার চরণে শরণাগত রাইকিশোরী"

বলেই যেন পিতৃদেব মায়াবতীতে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চরণে নিজেকে সমর্পণ করলেন। মায়াবতীই কি তাঁকে সংসার-মায়া-মুক্ত হবার পথের সন্ধান দিয়েছিল?

— :)**::**(: —

হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী অসবর্ণ বিবাহ

১৯১৬ সালে ১১ই আগষ্ট (২৬শে শ্রাবণ—১৩২৩) শুক্রবার বিক্রমপুর অন্তর্গত হাসাড়া নিবাসী ৺শ্রীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের পুত্র ৺সুধীর চন্দ্র রায়ের (ব্যারিষ্টার) সহিত আমার বিবাহ হয়।

আমার বিয়ে হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী প্রথম অসবর্ণ বিয়ে। অনেকেরই ধারণা যে আমার বিয়েতে রেজিষ্ট্রেশন হয়েছিল, কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। কারণ তখন রেজিষ্ট্রেশনে 'আমি হিন্দু নই' একথা বলতে হতো বলে আমাদের বিবাহে রেজিষ্ট্রেশন হয়নি।

আমি জন্মাবার পর পিতৃদেব মাকে বলেছিলেন 'আমার মেয়েকে বিয়ের সময় 'আমি হিন্দু নই' একথা যেন বলতে না হয়।' নিজের বিবাহে সে কথা বলে তিনি সারাজীবন মর্ম্মে মর্ম্মে ব্যথা অনুভব করেছিলেন। আমার বিবাহ হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী শালগ্রাম শিলার সম্মুখে দিয়ে, মর্ম্মের সে ব্যথা তিনি জুড়িয়েছিলেন।

এই বিবাহ নিয়ে হিন্দু ও ব্রাহ্ম উভয় সমাজে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি হয় এবং উভয় পক্ষের বাদপ্রতিবাদে তখনকার সংবাদপত্র মুখরিত হয়ে উঠে। প্রথম অসবর্ণ বিবাহ বলে আমার বিবাহে প্রায় 'নারদের' নিমন্ত্রণই হয়েছিল, সাধারণ, আদি ও নববিধান ব্রাহ্ম সমাজের সকলেরই নিমন্ত্রণ ছিল, আবার নবদ্বীপ, ভাটপাড়া, কাশী থেকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা অনেকেই এসেছিলেন নিমন্ত্রিত হয়ে। হাইকোর্ট মহল, সাহিত্যিক দল, আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব কোন দিকেই কেউ বাদ পড়েননি। স্যার আশুতোষ

মুখোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, হরিদেব শাস্ত্রী, যাদবেশ্বর তর্কভূষণ, প্রমথ নাথ তর্কভূষণ, যাদবেশ্বর তর্করত্ন, রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, তারাপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন, পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, জলধর সেন, দ্বিজেন্দ্র লাল রায়, হরিদাস হালদার, নাটোরের স্বর্গীয় মহারাজা সপরিবারে সকলেই বিবাহ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত ছিলেন। ব্রাহ্ম সমাজের উদারনৈতিক নেতৃবৃন্দের অধিকাংশই এ বিবাহ সমর্থন করলেন না। কেবল সমাজের উদারনৈতিকতার সম্মান রাখলেন সপরিবারে স্যার নীলরতন সরকার, নিশীথ চন্দ্র সেন ও ফনীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, হিমাংশু মোহন বসু (ব্যারিষ্টার), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লর্ড সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এবং নবীন ব্রাহ্ম যুবক সম্প্রদায়ের সুকুমার রায়চৌধুরী, প্রশান্ত মহলানবীশ, ও ডাক্তার দ্বারিকানাথ গাঙ্গুলীর পুত্রেরা। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য, কৃষ্ণকুমার মিত্র, বিপিনচন্দ্র পাল, হেরম্ব চন্দ্র মৈত্র, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ ও দুর্গামোহনের কন্যা জামাতারা সকলেই এবিবাহে অনুপস্থিত ছিলেন। শুধু দুর্গামোহনের পুত্র সস্ত্রীক কাকা-সাহেব (সতীশ রঞ্জন দাস) ও জ্যেঠিমা (দুর্গামোহনের পুত্র ৺সত্যরঞ্জণ দাসের স্ত্রী) সারাদিনই ছিলেন।

বিয়ের কয়েকদিন আগেই ব্রাহ্মসমাজ থেকে ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য, শশীভূষণ দত্ত এবং হেরম্ব চন্দ্র মৈত্র সমাজের সব সভ্যদের কাছে পোষ্টকার্ড ছাপিয়ে নিবেদন করেছিলেন যে, সমাজের এই অপমানকর বিবাহে যেন কোন সৎ ব্রাহ্ম না যান। নবীন ব্রাহ্ম যুবকেরা সমাজের এ সঙ্কীর্ণতা সহ্য করলেন না। তাঁরা দলবেঁধে সকলেই উপস্থিত ছিলেন। দৈনিক কাগজে উঠলো “এতদিন হিন্দু সমাজ ব্রাহ্মদের একঘরে করেছে, এবার ব্রাহ্ম সমাজের পালা।”

"ব্রাহ্ম সমাজে চিত্তরঞ্জন একঘরে।" 'নাটক' লিখলেন "কোলে তুলে লও মা", আবার কেউ লিখলেন, "ব্রাহ্ম সমাজে হিন্দু বিবাহ, ভবদেবের জয়জয়কার," এরকম অসংখ্য লেখা রোজ কাগজে প্রকাশিত হতে লাগলো।

আমার বিয়ের কথা উঠলে প্রথমে স্থির হয় যে বিপিন চন্দ্র পাল পৌরোহিত্য করবেন; কিন্তু তিনি পৌরোহিত্য করলে শালগ্রামশিলার কি হবে? পিতৃদেব চিন্তিত হলেন। আবার বল্লেন "আমি যখন জাত মানিনা, তখন নাইবা বিপিন বাবু ব্রাহ্মণ হলেন! তাতে কি? তাঁকেই বলব বিয়ে দিতে, তিনি কখনো এতে আপত্তি করবেন না।" মা সব শুনে ধীর শান্ত ভাবে বল্লেন, "আমার মনে হয় না যে বিপিন বাবু শালগ্রাম-শিলা নিয়ে বিয়ে দিতে রাজী হবেন, আর যদিও বা তা হন, তোমার সব দিক দেখে, ভেবে চিন্তেই সব স্থির করতে হবে। হয়তো বিপিন বাবু অরাজী হলেও তুমি টাকার জোরে একাজে লোক পাবে; কিন্তু ভেবে দেখো, তোমার টাকার গরম দেখিয়ে কি একাজ করা ভাল হবে? এই প্রথম তুমি রেজিষ্ট্রি না করে হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী মেয়ের অসবর্ণ বিয়ে দিচ্ছ, এতেই কত আলোচনা হবে, এর উপর টাকার জোরে অব্রাহ্মণ দিয়ে যদি একাজ করাও তবে হিন্দু সমাজেরও সমর্থন তুমি পাবে না। হিন্দু সমাজ অসবর্ণ বিবাহ ও অব্রাহ্মণ পুরোহিত একসঙ্গে এ দুটো সহ্য করবে না। আমি বলি, আজ অসবর্ণ বিয়ে এখন চলুক, এর পরে দেখবে ধীরে সুস্থে কালের প্রভাবে ব্রাহ্মণ পুরোহিত ছাড়াও একাজ সমাজে চল হয় যাবে।" খানিক্ষ চুপ করে থেকে পিতৃদেব বল্লেন, "তুমি ঠিকই বলেছ তোমার কথাই রাখব, আজ আমি খুব শান্তি পেলাম।"

বিপিনবাবু ক্ষুন্ন হয়ে আমাদের বিয়েতে অনুপস্থিত রইলেন। এই ব্যাপার হতে বাবা ও বিপিনবাবু একটু দূরে সরে গেলেন, এ দূরত্ব

আরও বেশী হয়েছিল বরিশাল কনফারেন্সের পর- সে কথা যথাসময়ে আলোচনা করবো। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মার একথা খুব সুযুক্তিপূর্ণ বলে বাবাকে বলেছিলেন।

বিয়ের দিন সকালের দিকে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় এলেন আমাদের বাড়ী। বাবাকে বল্লেন "চিত্ত! তোমাকে এখনো ভেবে দেখতে বলি, ভুবনমোহন কত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে যা সত্য বলে বুঝেছিলেন, তা রাখবার জন্যই এ সমাজে এসেছিলেন, আর তুমি তাঁরই পুত্র, একথাই শুধু তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।" শুনে পিতৃদেব বল্লেন, "শাস্ত্রী মহাশয়! আমার পিতাও কি সত্য বলে জেনে তাঁর পিতার ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করে ব্রাহ্ম হননি? তখন তো ব্রাহ্ম সমাজ একবারও মনে করেনি যে তাঁরা তাঁদের পিতৃধর্ম্ম পরিত্যাগ করে এসেছিলেন? তাই আমিও আজ সেই পিতারই পুত্র বলে আমার বিবেকের পথে, সত্যের পথে চল্‌ছি, এতে আমার বাবার আশীর্ব্বাদ থেকে আমি কখনোই বঞ্চিত হব না।" শাস্ত্রী মহাশয় বাবাকে জড়িয়ে ধরে বল্লেন, "এরপর আমার আর বলবার কিছু নেই।" আমাকে ডেকে একখানি ব্রহ্ম-সঙ্গীত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করে তিনি চলে গেলেন।

হিন্দু শাস্ত্রানুসারে প্রথম অসবর্ণ বিবাহ বলে আমার বিবাহে সমারোহ একটু অতিরিক্তই হয়েছিল। ধনী-দরিদ্র-নির্ব্বিশেষে আমন্ত্রণ লিপি পাঠাতে বাবা কাহাকেও ভোলেননি, এমনকি আমাদের তেলীরবাগ গ্রামের ধোবা, নাপিত, শিকদার সকলকেই পিতৃদেব কলিকাতা আনিয়েছিলেন।

দাদামণির বাড়ীতে এই প্রথম আবার হিন্দু-বিবাহের অনুষ্ঠানে জ্ঞাতিবর্গ অত্যন্ত আনন্দিত হয়েই যোগ দিয়েছিলেন। আমার ছোড়-

দিদিমা ও পিতৃকুলের জ্ঞাতি-ঠাকুরমারা সকলেই এসে মাঙ্গলিক স্ত্রীআচার বংশের রীতি অনুযায়ী সবই করিয়েছিলেন। এই সব স্ত্রীআচারের মধ্যে বিয়ের দিনে কন্যার শ্বশ্রূকুলের সকলের 'সোহাগ'-মাপা' মাবাবার অন্তর স্পর্শ করেছিল—একটি জলপূর্ণ চিত্রিত হাড়ীতে বেতের ছোট টুকনী দিয়ে কন্যাকে শ্বশ্রূকুলের নাম করে বলতে হয় 'শ্বশুরের সোহাগ পাই', 'শাশুরীর সোহাগ চাই' ইত্যাদি। বাবা বললেন "এ অপূর্ব্ব মনোভাব এদেশেই সম্ভব —মেয়ে অপরিচিত অজানায় গিয়ে আশ্রয় নেবে, তাই মা বাবার শঙ্কাহত চিত্তের কামনা, কন্যা সকলের সোহাগী হোক—কি সুন্দর ভাবেই না ফুটে উঠেছে এই 'সোহাগ-মাপার' মধ্যে।"

বিয়ের দিন সকালে 'দধিমঙ্গল' হয়ে যেতেই আমি বাবার পাশে গিয়ে শুয়ে পরলাম। প্রাণ আকুল হয়ে উঠল তাঁদের স্নেহনীড় ছেড়ে যেতে। পিতৃদেব আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে অশ্রুবর্ষণ করতে লাগলেন। সে সময়কার তাঁর উপদেশ বাণী আজও যেন শুনতে পাই। মার প্রতি তাঁর অন্তরের কি অসীম শ্রদ্ধা ও গর্ব্ব ছিল সেদিন তা ভাল করেই উপলব্ধি করলাম। বল্লেন, "নবজীবনে আজ প্রবেশ করছিস্—তোর মার মত হবি। যে স্ত্রী স্বার্থশূন্য হয়ে স্বামীর সংসারের সেবায় তনুমন ঢেলে দেয়, সংসারকে শ্রীমণ্ডিত ও ধন্য করে সেই। তোর মা তাই করেছে, সেই মায়েরই মেয়ে তুই, একথা কখনো ভুলিস্ না।" এই বলে পত্নীগর্ব্বে যেন উচ্ছসিত হয়ে উঠলেন তিনি। তারপর বল্লেন, "মনে রাখিস্, বাপমায়ের একমাত্র ছেলের জীবন-সঙ্গিনী হয়ে আজ তাদের গৃহে প্রবেশ করতে যাচ্ছিস্, তোর আচরণে কোনদিন যেন আমাদের শুনতে না হয় যে ব্রাহ্ম-সমাজ-মার্কা মেয়ের জন্য তাঁদের ছেলে পর হয়ে গিয়েছে।" আবার বল্লেন, "ভুলিস্ না তোর দাদামণি আদর্শ ব্রাহ্ম ছিলেন,

তাঁর বড় আদরের তুই, তোকে দিয়ে যেন ব্রাহ্ম-সমাজের কলঙ্ক না হয়।' আর একটিকথা বলেছিলেন যে, "প্রার্থী যেন তোর দুয়ার থেকে শূন্য হাতে ফিরে না যায়, তোর স্বামীর ক্ষমতা অনুসারেই অবশ্য দিবি; প্রার্থীরূপে নারায়ণ আসেন, মানুষের সেবাই নারায়ণের পূজা, একথা কখনো ভুলিস্ না, এতে নারায়ণের আশীর্ব্বাদই তুই পাবি।" জীবনের বিশিষ্ট দিনটিতে বাবার এই উপদেশ ভুলবার নয়।

এইসব কথাবার্ত্তার মধ্যে তুমুল কোলাহল করতে করতে বেবী, ভোম্বল এসে বল্ল, "বাবা, জান কি হয়েছে? বাড়ী সাজাবার লোকেরা বাড়ীর মাথায় এক প্রকাণ্ড ইলেক্‌ট্রীকের ক্রাউন বসিয়েছে।" পিতৃদেব ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে বল্লেন, "সর্ব্বনাশ! ক্রাউন কেন? খুলে ফেলতে বলো শিগগীর! আমরা যে পরাধীন সেটা কি আলো দিয়ে মাথার উপর না লিখলেই নয়? যতসব কাণ্ড।" পিতৃদেব বলেছিলেন, "আমার মেয়ের বিয়েতে ব্রাহ্মণদের বিবাহে যা করণীয় তার একটাও বাদ দিলে চলবে না।" তা বাদ পড়েওনি। কারণ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বিশুদ্ধ মতে আমার বিবাহের পদ্ধতি করে দিলেন; এবং বিয়ের আগের দিন এসে সংসারের প্রতি পদ বিক্ষেপের বিবাহের প্রত্যেকটি মন্ত্র তিনি আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। এমন অপূর্ব্ব বিবাহের মন্ত্র আর কোন দেশে আছে কিনা জানি না। হিন্দু বিবাহকে মরণ ও ছিন্ন করতে পারে না; 'Till death do us part' আমাদের মন্ত্রে নেই। জীবনে মরণে, জনমে জনমে, হিন্দু স্বামী স্ত্রী এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ।

দুঃখেরবিষয় যে অধিকাংশ হিন্দু স্ত্রীই এই বাক্য মনে-প্রাণে গ্রহণ করলেও, তাঁদের স্বামীগণ অনেকাংশেই সে কথা মনে প্রাণে হয়তো গ্রহণ করেননি; সেজন্যে আজ জনমে মরণে অচ্ছেদ্য-এই-বিবাহ বন্ধনকে ছিন্ন করবার পথ-দেখাবার জন্য অনেকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েছেন।

বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হতে পারে এই পরদেশ-নীতি অনুসরণ করবার যে প্রয়াস আজ চলেছে, তার জন্য আমার মতে দায়ী হিন্দু-স্বামীগণ। তাঁরা যদি শাস্ত্রের আচরণীয় সব ব্যবস্থাই স্ত্রীদেরই একমাত্র পালনীয় না করে, নিজেরাও যদি তাঁদের আচরণীয় সব কাজ ন্যায়ভাবে পালন করতেন, তবে আজ বোধহয় বিবাহ-বিচ্ছেদ-আইনের প্রয়োজন হতো না। এ বিষয়ে আরো একটি কথা মনে জাগে। আমাদের জীবনের প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত শাস্ত্রকারেরা কি অপূর্ব্ব শিক্ষনীয় মন্ত্রেই না লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। এমন যে মন্ত্র তাকে শুদ্ধ করে বলবার বা বোঝাবার জন্য পুরোহিত সম্প্রদায়কে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হয় না কেন? আমার মনে হয় আমাদের জাতীয় বিদ্যালয়ে বর্ণ নির্ব্বিশেষে এই সব ধর্ম্মের শিক্ষা প্রবর্ত্তন করলে সমাজের প্রভূত উন্নতি সাধিত হবে। বি-এ, বি-টি পাশ না করলে যেমন বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিতে পারে না, সেইরকম এ শাস্ত্রে পাশ না করলে সে পুরোহিত হতে পারবে না। এই পুরোহিত পদ আবদ্ধ থাকবে শিক্ষার মধ্যে, বর্ণের মধ্যে নয়। আমাদের দেশে একটি প্রবাদ আছে যে "অরাঁধুনীর হাতে পড়ে কই মাছ কাঁদে"। সেরকম শাস্ত্র-জ্ঞানহীন মূর্খ পুরোহিতদের হাতে পড়েও আমাদের শাস্ত্রও কাঁদছে সন্দেহ নেই। আমি এখানে সমগ্র পুরোহিত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বলছি না, বলছি শুধু সেই শাস্ত্রজ্ঞানহীন শিক্ষাহীনদের কথা যারা পৈতৃক সম্পত্তির মত এই বৃত্তিকে অধিকার করে রেখেছে।

আইনে বাবার যেমন প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল, সাংসারিক জ্ঞান তাঁর তেমনি একেবারেই ছিল না। তিনি 'আইন অনভিজ্ঞ' একথা কেউ বল্লে হয়তো তাঁর সেটা সহ্য হোত—কিন্তু সাংসারিক কাজের বাইরে তিনি এর আভাষও কেউ দিলে তিনি তা একেবারেই অস্বীকার করতেন। তাই আমার বিয়ের সময় তাঁর

সাংসারিক কার্য্যে কুশলতা প্রমাণ করবার জন্য তিনি পিসিমাদের বলেছিলেন, "বিয়ের খাওয়া দাওয়ার তরকারী কোটবার ব্যাপারে তোদের কিছু করতে হবে না, আমি তার সব ব্যবস্থাই করেছি ; আমি একটি বিশিষ্ট যুবক সম্প্রদায়ের উপর সব ভার দিয়েছি, তারাই সব করবে।" মেজ পিসিমা শুনে বল্লেন, "সেকি দাদা! তুমি আবার এ বিষয়ে কি জান যে সব ব্যবস্থা করবার ভার তুমি অন্যকে বুঝিয়েছ? বাড়ীতে বিয়ে! মেয়েরা কেউ তরকারী কুটবে না, খাওয়াবার ফর্দ্দ করবে না, রান্নার ব্যাপারে থাকবে না এ কেমন করে হয়? আমাদের বাড়ীর খাওয়াবার রীতি বাইরের লোকে কি জানবে? এ কখনো হতে পারে না।" বাবা বল্লেন, "নারে! এ বিয়েতে খুব লোক হবে, সব করতে হলে বড় কষ্ট হবে, তাই আমি এ ব্যবস্থা করেছি, তোদের কিছু ভাবতে হবে না"। মা পিসিমারা কিন্তু এতে নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। তবুও মেজপিসিমা তাঁর দাদা কি ব্যবস্থা করেছেন, তার ফল দেখবার জন্য উৎসুক হয়ে রইলেন এবং বেশী দেরীও হলো না তা ফলতে। অল্পকাল মধ্যেই নিমন্ত্রণ রন্ধনকারী জগদীশ ঠাকুর হন্তদন্ত হয়ে এসে মেজপিসিমাকে বল্লে, "সর্ব্বনাশ হয়েছে পিসিমা, রান্নার মাংস চুরি গিয়েছে"। মেজপিসিমা বল্লেন, "তাই নাকি? তা কত মাংস চুরি গেছে?" জগদীশ তখন বিনয়নম্র বদনে বল্লে—"তা মণ খানেক মণ দুই তো হবেই"। পিতৃদেবের কানে একথা গেলে তিনি কিন্তু খুব সহজভাবেই তার সমাধান করে দিলেন ; বল্লেন "মাংস চুরি গিয়েছে তো কি হয়েছে? বাজারে কি আর মাংস নেই?" মেজপিসিমা মাকে বল্লেন, "খুব ভাল ব্যবস্থাই হলো, বৌঠান কি বল?" আরো ভাল ব্যবস্থার ফল মা, পিসিমাকে সামলাতে হলো, যখন দেখা গেল রাত্রে, অনিমন্ত্রিতেরা খাবার প্রায় শেষ করে ফেলেছে, এবং নিমন্ত্রিতের সংখ্যা তখনো অনেক বাকী। তখন কিন্তু বাবার ব্যবস্থাকারীদের

খুঁজে মেলা ভার হলো, এবং তার তাল সামলাতে হলো মা পিসিমাদেরই। পিতৃদেব তবুও হঠবার পাত্র নন। তিনি বল্লেন, 'এতে এতো ব্যস্ত হবার কি হয়েছে? যাঁদের নিমন্ত্রণ করবার সুযোগ পাইনি, তাঁরা নিজেরা এসে আমার মেয়ের বিয়েতে খেয়ে গেলেন! এতো বরং আনন্দেরই কথা! এতে আমার ব্যবস্থার নিন্দে করবার কি আছে? না হয় একবারের জায়গায় দুইবার রাঁধতে হবে। ঠাকুর-চাকরদের একটু মিষ্টি মুখে কথা বলে তাদের ভাল করে বকসিস্ দিলেই তো হয়ে যাবে।' এর উপর আর কে কি বলতে পারে? কিন্তু বাবার এহেন সুব্যবস্থায় মা ওঁদের 'তিন-অবস্থা' হয়েছিল সেদিন।

১৯১৬ সালে বাংলা দেশে হিন্দু-শাস্ত্রানুযায়ী অসবর্ণ বিবাহ প্রথম প্রচলিত হোল এবং তার প্রথম প্রবর্ত্তক হয়ে রইলেন পিতৃদেব।

—✻):×:×:(✻—

দেশাত্ম-বোধ

পিতৃদেব শুধু 'দেশপ্রেম' 'দেশপ্রেম' বলেই ক্ষান্ত হননি, দেশের সাহিত্য, দেশের প্রাণ-ধর্ম্ম, দেশের কাব্য, সংস্কৃতি সব কিছুই প্রকাশ পেয়েছিল তাঁর দেশ-প্রেমের মধ্যে।

সাহিত্য ও পিতৃদেবের বিবিধ বক্তৃতাবলীব থেকে তাঁর কয়েকটি বাণী এখানে দিলে হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

১৯১৬ সালে ২রা অক্টোবর কলিকাতা মেছুয়াবাজারে আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের অন্তরীণের বিরুদ্ধে তিনি বলেছিলেন:—

১। "আমরা চাহি স্বায়ত্ত-শাসন; দেশের জনসাধারণের দ্বারাই তাহা পরিচালিত হইবে। দেশবাসীর মঙ্গলের জন্য জনসাধারণই দেশকে শাসন করিবে। ইহাই আমার মনের কথা। দরিদ্রতম প্রজা হইতে ঐশ্বর্য্যশালী, প্রতাপান্বিত জমিদার সকলেই তাহার ন্যায়-সঙ্গত অধিকার ভোগ করিতে পাইবে। সে শাসন-কার্য্যে প্রত্যেকেরই কথা কহিবার অধিকার থাকিবে।"

২। 'বাংলার কথা'য় তিনি লিখেছিলেন,—

"আমরা যে শিক্ষিত বলিয়া অহঙ্কার করি, সেই আমরা দেশের কতটুকু স্থান অধিকার করিয়া থাকি? দেশের আপামর সাধারণের সঙ্গে আমাদের যোগ কোথায়? আমরা যাহা ভাবি, তাহারা কি তাহা ভাবে? সত্য কথা বলিতে হইলে কি স্বীকার করিবনা যে আমাদের উপর আমাদের দেশবাসীর সেরূপ আস্থা নাই, আমরা যে তাহাদিগকে ঘৃণা করি; কোন্ কাজে তাহাদের ডাকি"?

৩। ১৯১৭ সালে ১০ই অক্টোবর ময়মনসিংহে বলেছিলেন :—"দেশ বলিতে আমি ইষ্টদেবতাকেই বুঝি। পাশ্চাত্যের দার্শনিক ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া আমি জাতীয়তাকে বুঝিতে শিখি নাই। দেশকে সেবা করিলে মানব-সমাজকে সেবা করা হয়। আর মানব-সমাজের মনুষ্যত্বের সেবাতেই ভগবানের পূজা সমাপ্ত হয়।"

৪। ১৯১৮ সালে ১২ই জুন চট্টগ্রামে হোমরুল লীগ সভায় তিনি বলেছিলেন,—"এমন একদিন আসিবে, যখন ভগবানের আশীর্ব্বাদে বাঙ্গালী-জাতি সমগ্র পৃথিবীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবে ; একটা জাতি বলিয়া বিশ্ববাসীর সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিবে। আমার জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে আমি শুধু এই কামনাই করিতেছি। আমার ভিতর হইতে কে যেন আমাকে বলিয়া দিতেছে, ইহাই আমার একমাত্র কার্য্য। আমার যাহা কিছু প্রিয়, যাহা কিছু শ্রেয়, আমি এই কার্য্য-সাধনের জন্যই প্রয়োগ করিব, যদি তাহাতে আমার প্রাণ-বিয়োগ ঘটে, তাহাতে কি আসিয়া যায়? এই কাজ করিতে করিতে যদি আমার মৃত্যু হয়, আমার দৃঢ়-বিশ্বাস আছে, আমি আবার এই পৃথিবীতে এই বাঙ্গলা দেশেই জন্ম গ্রহণ করিব, আবার আমার দেশের জন্য কাজ করিব। যতদিন না আমার মনের কামনা সম্পূর্ণ হইবে, আমার আদর্শের পূর্ণ পরিণতি ঘটিবে, ততদিন এই ভাবেই এখানে কাজ করিতে আসিব।"

৫। "আনন্দের দিনে আমরা আত্মহারা হইয়া যাই, কিন্তু দুঃখের দিনে আপনাকে দেখিতে পাই ও ভগবানের বাণী শুনিতে পাই।"

৬। "দুই আর দুই যোগ করিতে পারিলেই শিক্ষা সমাপ্ত হয় না, আমাদের দেশ-জননীর সেবাই প্রকৃত শিক্ষার পরিচয়।"

৭। "অবশ্য ইউরোপীয় সভ্যতাকে আমি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকি, আমার শিক্ষা-দীক্ষার জন্য আমি এর কাছে কৃতজ্ঞ ; কিন্তু

তাহা হইলেও আমি ভুলিতে পারিনা—যে ইউরোপীয় রাজনীতির ধার-করা জিনিষ লইয়া আমাদের জাতীয়তা সন্তুষ্ট থাকিতে পারেনা।"

৮। "দেশবাসীকে বলি—প্রথমে তোমার গৃহে অযত্নে-রক্ষিত উপেক্ষিত-দীপ প্রজ্জ্বলিত কর—অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত কর, এবং অতীতের আলোকে তোমার বর্ত্তমান অবস্থা উপলব্ধি কর। তাহার পর নির্ভীক ভাবে জগতের সম্মুখীন হও; এবং বাহির হইতে যে আলোক পাইতে পার তাহা গ্রহণ কর।"

৯। দেশের জনসাধারণ যাতে, সঙ্ঘবদ্ধ হয়, এবং সমস্ত বিষয় জানতে ও বুঝতে পারে সেরূপ সঙ্ঘ করা দরকার। তাছাড়া আমি বিশ্বাস করি জগতের যে কোন দেশের চেয়ে আমাদের দেশের লোক অনেকগুণে বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত। তারা দেশের কোন্ কাজটা ভাল, কোন্ কাজটা মন্দ অনায়াসেই বুঝতে পারে। বাঙ্গলার প্রতি পল্লীতে পল্লীতে জনসাধারণ দলবদ্ধ হয়ে কাজ করলে তার শক্তি কেউ রোধ করতে পারবে না। প্রাচীন ভাবকে ভিত্তি করে নতুন করে গড়তে হবে।"

১০। "এমন একদিন আসবে যখন ভারতবর্ষের কথা বিশ্ববাসীকে কান পাতিয়া শুনিতে হইবে।"

১১। 'বাংলার কথায়' বলেছেন,

"জীবনটাকে টুকরো টুকরো করে রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, সমাজ-নীতি প্রভৃতি ভাগ করা হয়, তা আমাদের দেশীয় ভাব নয়,—ওটা একেবারে পাশ্চাত্য ভাব। সব নিয়েই আমাদের জীবন।"

১২। "দেশের কাজ আমার ধর্ম্মের অঙ্গ, উহা আমার জীবনের আদর্শ। আমার দেশের-কল্পনায় আমি ভগবানের মূর্ত্তির বিকাশ দেখতে পাই।"

১৩। "আমাদের জাতির সর্ব্বাঙ্গীন-স্বাধীনতার যে আদর্শ, তাহাই স্বরাজ।"

১৪। ১৯১৬, ২রা অক্টোবর কলিকাতা মেছুয়াবাজার সভায় বলেছেন,

"যখন আমি বলি স্বায়ত্ত-শাসন, তখন আমি একথা বলি না যে, একটা ব্যুরোক্রেশীর বদলে আর একটি ব্যুরোক্রেশীর সৃষ্টি হউক।"

১৫। ১৯১৭, কলিকাতা কংগ্রেসে বলেছেন :—

"আমরা এখন হইতে গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, ভারতবর্ষের প্রতি পল্লীতে এই কথা প্রচার করিতে থাকিব যে যতক্ষণ জনসাধারণের হস্তে দেশের শাসনভার সমর্পিত না হইতেছে ততক্ষণ আমরা কোন মতেই নিরস্ত হইব না, সন্তুষ্ট হইব না। প্রত্যেক জাতিরই তাহার জন্মগত-অধিকার অনুসারে বাঁচিতে হইবে, বড় হইতে হইবে, উন্নত হইতে হইবে। আমরা সেই অধিকারের দাবী করিতেছি।"

১৬। ১৯১৮ 'হোমরুল' অধিবেশনে বলেছেন :—

"দেশের আপামর জনসাধারণ, প্রজা ও কৃষক যাহাতে স্বায়ত্ত-শাসনের সুধাময় আস্বাদ পায়, সমগ্র দেশবাসী যাহাতে স্বাধীনতা-সুখভোগ করিতে পারে, তাহাই আমাদের কামনা।"

১৭। ১৯১৮, ১২ই জুন চট্টগ্রামে বলেছেন :—

"কেহ যদি আমার কাছে আসিয়া বলেন, 'বাঙ্গলার জনসাধারণ কি চাহে তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই—আমি বাঙ্গলার নেতা আমি ইহা করিয়াছি—ইহাকে সমর্থন কর' ইহার উত্তরে আমি বলিব 'কে হে তুমি? গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল! কে তোমাকে চায়?' জনসাধারণের মঙ্গলের জন্যই আমাদের সর্ব্বস্ব-পণ করিয়াছি, যদি জনসাধারণের মঙ্গল হয় ভালই; নহিলে আমি কে? কেহ নই, নেতাও কিছু নহেন। আমি জাতির প্রতিনিধি মাত্র।"

১৮। ১৯১৮—চট্টগ্রামে বলেছেন :—

"হিন্দু ও মুসলমানগণ লইয়াই বাঙ্গালী-জাতি। সুদৃঢ়রূপে এই সমগ্র বাঙ্গালী-জাতি একতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া জাতীয়তার গৌরবে-মণ্ডিত হইয়া বিশ্ববাসীর সম্মুখে দাঁড়াইবে ; তাহাই আমাদের লক্ষ্য।"

১৯। "সমগ্র মানব-জাতির একটা মহা-মিলনের যে স্বপ্ন, তাহাকে আমি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি।"

২০। "মিথ্যার উপর কোন সত্য বা সত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করা যায় না।"

২১। "প্রবলের সংঘাতে দুর্ব্বলের দোষ শত গুণ বাড়িয়া যায়।"

"জনসাধারণের শক্তিবলই নেতার শক্তি, সেই শক্তির পাশে দাঁড়াও, আমি তোমাকে নেতার অর্ঘ্য প্রদান করিব। তোমাকে পূজা করিব। কিন্তু আদর্শ হইতে যদি এক চুল ভ্রষ্ট হও, তবে সেখানে আর তোমার স্থান নাই। কোন দাবী নাই। জাতির মতকে অবজ্ঞাত হইতে দেখিয়া আমি ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিতেছি না।"

১৯২২ সনে গয়া কংগ্রেসে সভাপতির ভাষণে তিনি বলেছেন :—

"যদি সত্য-ভ্রষ্ট না হয়ে যুদ্ধ-জয় করতে পারেন, তবেই জয়লক্ষ্মী করতলগত হলেও আপনাদের হাত কখনো প্রভুত্বের কালিমায় কলঙ্কিত হবে না, তবেই ভারতের প্রাসাদে ও কুটীরে সমানভাবে স্বরাজের রত্ন-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হবে।"]

পিতৃদেবের মতানুসারে আজ স্বরাজের রত্ন-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিনা দেশবাসীর আজ তাই চিন্তা করতে হবে। পিতৃদেব যে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখে গিয়েছেন, যার জন্য তিনি তাঁর অমূল্য জীবন-বিসর্জ্জনেও কুণ্ঠিত হননি, দেখতে হবে আজ দেশের আপামর জনসাধারণ প্রজা ও কৃষক তার সুধাময়-আস্বাদ পেয়েছে কিনা? সমগ্র দেশবাসী আজ তার সুখভোগ করছে কিনা?

প্রভুত্বের কালিমায় হাত কলঙ্কিত না করে ভারতের প্রাসাদে ও কুটীরে সমানভাবে স্বাধীনতার রত্ন-মন্দির সত্যিই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিনা? জাতির সর্ব্বাঙ্গীন-মুক্তির যে আদর্শ আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী-নেতৃবৃন্দ রেখে গিয়েছেন, তা লাভ করবার জন্য আমাদের যে সব তরুণ-সেবকেরা তাঁদের অমূল্য-প্রাণ তুচ্ছ করেছেন; তাঁদের সে ত্যাগ আমরা উপলব্ধি করেছি কিনা? দেশকে সর্ব্বপ্রকার-অধীনতা থেকে সত্যিই কি আজ আমরা মুক্ত করেছি?

'আমরা স্বাধীন' একথা উৎফুল্ল-চিত্তেই আমরা বলি, এবং আমাদের জাতীয় পতাকাও সে বার্ত্তাই বহন করে। আমরা সে পতাকা উত্তোলন করেই প্রমাণ করি যে আমরা স্বাধীন, এবং শাসক সম্প্রদায় প্রমাণ করেন তা রাষ্ট্রপতি ও রাজভবনে স্বাধীনতা-উৎসব-দিন পালন করে এবং প্রমাণ করেন তা তাঁদের স্বাধীন-মতবাদ দ্বারা।

পিতৃদেব তাঁর প্রত্যেক কথায় "জন-সেবাই দেশের সেবা" বলে গিয়েছেন; দেশের জন-সাধারণের দ্বারাই দেশের শাসন-ভার চালিত হবে, এই স্বপ্নই তিনি দেখে গিয়েছেন। সে কথা কি আমরা একবারও ভাবি? আজ তাঁর মত-বিরুদ্ধ "এক ব্যুরো-ক্রেশীর বদলে আর এক ব্যুরোক্রেশী"র দ্বারাই কি দেশ শাসিত হচ্ছেনা? কোন্ কাজ আজ আমরা সকলের মত নিয়ে করি? নির্ব্বাচনের সময় আমরা বলি বটে যে 'জনগণের ভোটেই আমরা নির্ব্বাচিত হয়েছি,' কিন্তু ভেবে দেখি কি যেখানে শতকরা ৮০ জনই নিরক্ষর, সেখানে প্রকৃতই ক'জনের ভোটে আমরা নির্ব্বাচিত হই? এই নির্ব্বাচন কি সত্যই আমরা জনগণের মত বলে গ্রহণ করতে পারি? বাস্তবিক পক্ষে এই ভোটের কি কোন মূল্যই আছে? ভাবের ঘরে চুরি করে মনকে চোখে ঠার দিয়েই আমরা

আত্ম-প্রসাদ লাভ করি এই বলে যে জনগণের দ্বারা আমরা নির্ব্বাচিত! "মিথ্যার উপর কোন সত্য বা সত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করা যায়না" —পিতৃদেবের এই মহান বাণী যেন আমরা ভুলে না যাই!

আমরা আজ স্বাধীন হয়ে দেশের জনমতকে পদ-দলিত করে আজ তাদেরই পূজা করছি, তাদেরই উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করছি, যারা একদিন আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, যারা বৃটিশ-রাজপুরুষদের পদ-লেহন করে সেই সংগ্রামের বীর যোদ্ধাদের বিরুদ্ধাচরণ করতেও কুণ্ঠিত হয়নি! আজ কিন্তু সেই সব ব্যক্তিরাই আমাদের স্বাধীনতার আনন্দ-উৎসবের পুরোভাগে এসে দেশপ্রেমে মাতোয়ারা হচ্ছেন! আমরাও তাদের 'স্বাগতম্' বলেই আহ্বান করছি! স্বাধীনতার বন্ধুর পথ যাঁরা একদিন হৃদয়-রক্তে রঞ্জিত করেছে, প্রাণ পর্য্যন্ত দিতেও কুণ্ঠিত হন'নি, আজ তাঁদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় শুধু কয়েকজনের নাম ছাড়া ক'জন আমরা তাঁদের আত্মদানের কথা, তাঁদের ধ্যান, ধারণা, আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন-তাঁদের কার্য্যাবলী চিন্তা করি?

আজ আমরা স্বাধীন হয়েছি! তাই জাতির-জনক মহাত্মা গান্ধী ও অন্যান্য প্রাদেশিক নেতৃবৃন্দের স্মৃতি-সৌধ, বিশ্ববাসীকে গর্ব্বের সঙ্গেই দেখাচ্ছি! মহাত্মার অমর-জীবন যেন বাঁধা পড়ে আছে শুধু ঐ রাজঘাটে! আর দেশবন্ধু অনাদৃত হয়ে বসে আছেন কেওড়াতলার শ্মশান-ভূমিতে এসব স্থানে সুযোগ-সন্ধানীর দল বাহ্যিক দেশ-প্রীতির ভান করে সন্ন্যাসী, সর্ব্বত্যাগী নেতৃবৃন্দের প্রতি শ্রদ্ধা জানায় ক্রীত ফুল দিয়ে আর সুবিধা গ্রহণ করে তাদের নামের।

তাঁদের যদি আজ আমরা সত্যিই মনে করতাম, তবে তাঁদের যা আদর্শ ছিল—আপামর জনসাধারণের সুখ-স্বাচ্ছন্দের-বিধান,

অন্নবস্ত্র-সমস্যার সুষ্ঠু-সমাধান ও প্রতিটি পল্লীর উন্নয়ন—আমরা তাঁদের এই আদর্শকে জয়যুক্ত করতে প্রাণপনে চেষ্টিত হতাম। জনসাধারণের একজন হয়ে তাদের সুখ-দুঃখের ভাগী অবশ্য হতাম। আমরা হতভাগ্য! তাই স্বর্গত নেতৃবৃন্দের আত্মার তৃপ্ত্যর্থে আমরা শুধু ঐ ফুলের তোড়াই প্রদান করি। তাঁদের আত্মা তৃপ্ত হোত নাকি যদি আমরা বাহ্যিক এই আড়ম্বরে দেশের অর্থ ব্যয় করে এইসব স্মৃতি-সৌধ বা মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা না করে তাদের স্বরাজের স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত করবার প্রয়াসে সেই অর্থের সদ্ব্যবহার করতাম?

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে আজ মহাত্মার ও অন্যান্য নেতৃবর্গের স্মারক-চিহ্ন বুকে ধরে মর্ম্মর-মুর্ত্তি, স্মৃতিসৌধ ও রাজপথের অভাব নেই। কিন্তু তাঁদের মর্ম্মবাণীর স্মৃতি এই বিরাট ভারতবর্ষে কয়টি স্থাপিত হয়েছে? কয়টি পল্লীর উন্নয়ন আমরা করেছি? কয়টি দাতব্য-ঔষধালয়, প্রসূতি-আগার, আপামর-সাধারণ-বনিয়াদি-(Basic) শিক্ষালয় স্থাপিত হয়েছে? ভারতের জনসংখ্যার অনুপাতে তা কতদূর অগ্রসর হয়েছে তা আমাদের ভাবতে হবে।

১৯৫৩ সালে ৩রা জুন চীন-প্রত্যাগত গান্ধীবাদী-নেতা-পণ্ডিত সুন্দরলাল শিলীগুড়িতে স্থানীয় শান্তি-প্রস্তুতি-কমিটির এক বিরাট সভায় দীর্ঘকালের দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত চীনদেশ তার নূতন সরকার গঠনের দুই বৎসরের মধ্যে কি ভাবে তাদের খাদ্য-সমস্যার সমাধান করতে পেরেছে তার বর্ণনা-প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'জনগণের জন্য সরকারের কাজ করবার সদিচ্ছা থাকলে তা কত শীঘ্র বাস্তবে পরিণত করা যায় তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত চীনদেশ।' দুই বৎসরের মধ্যে যদি চীন দেশ এতটা অগ্রসর হতে পেরে থাকে, তবে আমাদের পাঁচ বৎসরের পরিকল্পনা-অনুযায়ী আমরা কতদূর অগ্রসর হয়েছি তা ভাববার কথা!

স্বাধীন ভারতে আজ আমাদের অগণ্য নরনারায়ণ, লাঞ্ছিত, উপেক্ষিত; পরণে আজ তাদের কাপড় নেই, উদরে আজ তাদের অন্ন নেই, বাস্তুহারার করুণ-ক্রন্দনে আজ সমগ্র ভারত মুখরিত। শিক্ষা-দীক্ষায় এখনো তারা ঘোর তিমিরেই মগ্ন।

পিতৃদেব বলেছিলেন 'প্রথমে তোমার গৃহে অযত্নে-উপেক্ষিত দীপ প্রজ্বলিত কর; অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত কর, এবং অতীতের আলোকে তোমার বর্ত্তমান অবস্থা উপলব্ধি কর; তাহার পর নির্ভীক ভাবে জগতের সম্মুখীন হও, এবং বাহির হইতে যে আলোক পাইতে পার তাহা গ্রহণ কর।'

অতীতের এই আলোক-স্তম্ভ লক্ষ্য করে আমাদের দেশ-জননীকে যেদিন আমরা সাহিত্যে, বিজ্ঞানে দর্শনে, শিল্পে, বানিজ্যে, ধর্ম্মে, কর্ম্মে সর্ব্বৈশ্বর্য্য-শালিনী করে প্রতিষ্ঠিত করতে পারব, সেদিনই আমরা বিশ্ব-সভায় শির উন্নত করে বলতে পারব 'এই আমাদের ভারতের দীপালোক, এখন প্রয়োজন মত বাইরের আলোক গ্রহণ করতে আমরা প্রস্তুত।' সেদিনই আমরা প্রকৃত-স্বাধীন হব, এবং সেদিনই স্বাধীন-ভারতের কথা বিশ্ববাসী কান পেতেই শুনবে। নইলে সর্ব্ববিষয়ে পরাধীন হয়ে আমরা কি সত্যই স্বাধীন?

রাজনীতি

ভবানীপুর প্রাদেশিক সম্মিলন ও কলিকাতা কংগ্রেস—১৯১৭

১৯১৭ সাল পিতৃদেবের জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং ঘটনা-বহুল বৎসরের প্রারম্ভ। এবৎসরেই তিনি প্রকাশ্য রাজনীতি ক্ষেত্রে বিশিষ্ট-ভূমিকা নিয়ে প্রথম অবতীর্ণ হলেন।

এই সাল থেকে ১৯২৫ সাল পর্য্যন্ত ভারতে এগার বার কংগ্রেসের অধিবেশন, এবং বাংলাদেশে ছয় বার প্রাদেশিক সম্মিলন হয়। এই উভয় রাজনীতি ক্ষেত্রেই পিতৃদেব শুধু উপস্থিত হয়েই নয় প্রতিবারেই এইসব অধিবেশনে বিশিষ্ট অংশই গ্রহণ করেছিলেন।

পিতৃদেবের এই সব প্রাদেশিক সম্মিলন ও কংগ্রেসের ইতিহাস বাবার জীবনের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত বল্লেও চলে, তাই এই ১৯১৭ থেকে ১৯২৫ সাল পর্য্যন্ত কনফারেন্স এবং কংগ্রেসের ইতিহাস যেমন পিতৃদেবকে ছেড়ে লেখা যায় না; তেমনি তাঁর জীবনী লিখতেও এ কয় বছরের কনফারেন্স ও কংগ্রেসের কথা না লিখলে তাঁর জীবনের আলেখ্যও সম্পূর্ণভাবে অঙ্কিত করা অসম্ভব।

এখন যেমন কংগ্রেসের উপর প্রাদেশিক কনফারেন্সের কোন প্রভাবই রেখাপাত করে না, তখন কিন্তু প্রাদেশিক কনফারেন্সের আলোচিত-বিষয়গুলিই কংগ্রেসকে পরিচালিত করতো আর পিতৃদেবের সময় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্সের আলোচিত-বিষয় সমগ্র ভারতে বিস্ময় ও আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। সত্যিই

'তখন বাঙ্গালী যা ভাবতো সাতদিন পরে ভারতবাসী তাই চিন্তা করতো।' আর আজ?

১৯১৭ সালের এপ্রিল মাসে কলিকাতা ভবানীপুর প্রাদেশিক সন্মিলনে পিতৃদেবকে আমরা সভাপতিরূপে প্রকাশ্য-রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রথম দেখতে পাই। প্রকাশ্য-রাজনীতিতে এই প্রথম হলেও, পরাধীন দেশের জন্য তাঁর অন্তর্বেদনা ফল্গুস্রোতের মত বহুদিন আগেই প্রবাহিত ছিল। তার খানিক প্রকাশ ইংলণ্ডে ছাত্রাবস্থায়। আর প্রকাশ্য-রাজনীতিতে যোগদানের পূর্ব্বে সাহিত্য-সাধনার সময় তিনি পরোক্ষে রীতিমত রাজনীতি আলোচনা করতেন। রাজ-নীতি তাঁর জীবনে এত বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছিল কেন? কেন সাহিত্য-সাধনা ছেড়ে তিনি প্রকাশ্য রাজনীতিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, তা লিখতে গেলে আলাদা একটি গ্রন্থই হয়। পরে সে বিষয় লিখবার ইচ্ছা থাকলেও তা হয়ে উঠবে কিনা জানি না।

হঠাৎ একদিনেই পিতৃদেব রাজনৈতিক-নেতা রূপে আবির্ভূত হননি, সমগ্র জীবন-ভরেই যে তিনি এই অসাধারণ দায়ীত্ব গ্রহণ করবার যোগ্যতা অর্জ্জন করেছিলেন তার সন্দেহ নেই। বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়ে তাঁর বক্তব্য বলবার আগে তিনি বার বার দেশবাসীকে তাঁর অভিমত জানিয়ে এবং তাদের মত জেনে তবেই তাঁর বক্তব্য তিনি বলতেন। কনফারেন্সে অথবা কংগ্রেসে হঠাৎ উপস্থিত হয়ে নেতৃত্ব করা তার স্বভাব-বিরুদ্ধ ছিল। আজকাল যেমন প্রতিশ্রুতি দিয়ে সেটা পালন না করাই সূক্ষ্ম রাজনৈতিক লক্ষণ, পিতৃদেব তা বিশ্বাস করতেন না। সত্য ও ন্যায়ের পথেই তিনি সব কিছু সমাধান করতে চাইতেন। পরবর্ত্তী জীবনে এর ব্যতিক্রম হওয়াতে রাজনীতি ও কোন কোন সহকর্ম্মীদের প্রতি তিনি আস্থা হারিয়ে

ফেলেছিলেন। তাই ক্ষুব্ধ হয়েই তিনি বলেছিলেন "বার বৎসর ক্রিমিনাল্ প্রাকটিশ্ করে মানব চরিত্রের উপর যে বিশ্বাস আমার ছিল আট বৎসর রাজনীতি করে সে বিশ্বাস আমি হারিয়ে ফেলেছি।" রাজনীতিবিদের পক্ষে এটা খুবই সত্য কথা।

ভবানীপুর প্রাদেশিক সম্মিলনে অভিভাষণ-লেখার কথা বেশ মনে আছে। ঘরের ভিতর চারিদিক ঘুরে ঘুরে তিনি তন্ময় হয়ে তাঁর বক্তব্য বলে যেতেন, আর একজন বসে প্রতিলিপি লেখার মতই তা লিখে রাখতো; সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত মহাশয় বেশীর ভাগই এটা লিখে দিতেন। একদিন সুরেণ বাবুর আসতে বিলম্ব হওয়াতে পিতৃদেব আমাকে বল্লেন "আমাব বলবার সঙ্গে সঙ্গে তুই লিখে নিতে পারবি? কিন্তু একটা কথা, যদি আমার কোন কথা বুঝতে বা শুনতে না পাস্ তবে ফাঁকে রেখে যাবি, বলার মধ্যে আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিস্ না, তাহলে বলার ধারা হারিয়ে যাবে।" ভয়ে ভয়ে আমি লিখেছিলাম ঠিকই, তাছাড়া পিতৃদেবের বলার ভঙ্গীও খুব সুস্পষ্ট ছিল। 'বাংলার কথা' বলবার সময় তাঁর সেই প্রদীপ্ত মুখচ্ছবি আমি যেন এখনো দেখতে পাই। আমি ঐ একদিনই লিখেছিলাম, পরে সুরেণ দাসগুপ্ত মহাশয়ই লিখেছিলেন। লেখা হয়ে গেলে তাঁর এই অভিভাষণ সম্মিলনে বিতরণ করবার জন্য অনেক ছাপান হয়েছিল। ১৯১৭ সালে এপ্রিল মাসে এ অধিবেশন হয়।

সভার প্রারম্ভে স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতি-নাম প্রস্তাবকালে ওজস্বিনী-ভাষায় বক্তৃতা করেছিলেন। এমন বজ্র-কোমল কণ্ঠস্বর আমি আর কখনো শুনিনি।

এই সভায় পিতৃদেব উঠে দাঁড়িয়ে যখন তাঁর অভিভাষণ পড়তে আরম্ভ করলেন, সে দিনই ভাল করে বুঝতে পেরেছিলাম যে বাঙ্গলা

তাঁর সমগ্র হৃদয়ের কতখানি জুড়ে ছিল, জাতির-মেরুদণ্ড পল্লীর জন্য তাঁর প্রাণ কত আকুল হয়েছিল, দেশ জননীকে কতখানিই না ভাল বেসেছিলেন তিনি! পল্লীগ্রামকে সমগ্র রাজনীতির কেন্দ্র করে, সেখানে গিয়েই প্রথম স্বাধীনতার বাণী শোনাতে হবে, শুধু সহরে বক্তৃতা করলেই স্বাধীনতা আসবেনা। পল্লী-উন্নয়নের এক সুচিন্তিত ও সুস্পষ্ট প্রোগ্রাম্ তিনি বিষদ ভাবেই ব্যক্ত করেছিলেন তাঁর এই ভাষণে।

তাঁর এই ভাষণে নৈশ বিদ্যালয়-স্থাপন, সাধারণ-পাঠাগার দ্বারা পল্লীর জনগণকে দলবদ্ধ করে জনমত গঠন করা, পল্লী-সংস্কার করার কথা ইত্যাদি নানা বিষয় দেশবাসী শুনেছিল। কলকারখানাতে শ্রমিকের মনুষ্যত্ব নষ্ট হয়, তাদের নৈতিক জীবনের অধঃপতন ঘটে, এই দৃঢ়মত তিনি ব্যক্ত করেছিলেন এ বক্তৃতায়।

আমাদের শিক্ষা দীক্ষার সম্বন্ধেও তিনি তাঁর দৃঢ় মত ব্যক্ত করেছিলেন এইবলে যে শিক্ষার দ্বারা দেশবাসীকে সচেতন করে আমাদের বক্তব্য তাদের বোঝবার সুযোগ দিতে হবে, তাদের শিক্ষার সুযোগ দিয়ে তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর সমান করে তাদের একস্তরে নিয়ে আসতে হবে।

বিদেশী Industrialism এর বিরুদ্ধে এই সম্মিলনে তাঁর মত তিনি প্রকাশ করেছিলেন। তবে ব্যবসায় বানিজ্যকে তিনি একেবারে ত্যাগ করতে বলেননি। এই প্রসঙ্গে বলেছিলেন "শুধু কৃষিকার্য্যে আমাদের জীবনধারণ করা অসম্ভব; সুতরাং ব্যবসায় বাণিজ্যের উপায় অবলম্বন করিতেই হইবে। কিন্তু সে উপায় বিলাতি Industrialism নহে। আমাদের ব্যবসায় বানিজ্যের একটা বিশিষ্ট

রীতি আছে, পদ্ধতি আছে। আমাদের জাতির ইতিহাসের মধ্যে, আমাদের স্বভাব ধর্ম্ম সে রীতি, সে পদ্ধতি সৃষ্টি করিয়াছে। মোটা-মোটি ভাবে দেখিতে গেলে আমাদের ইতিহাসের ইঙ্গিতকে মানিয়া চলিলে সে পদ্ধতি সহজেই প্রকাশ হইয়া পড়ে। আমরা দেখিতে পাই আমাদের দেশের চাষী চিরকালই তাহার কৃষিকার্য্যের সঙ্গে সঙ্গেই সে আপনার আবশ্যকীয় জিনিষপত্র অর্থাৎ খাদ্য ও পরিধানের বস্ত্র আপনিই তৈয়ার করিয়া লইত। তাহার লজ্জা-নিবারণের জন্য ম্যানচেষ্টারের দিকে চাহিয়া থাকিতে হইত না।" তিনি আরো বলেছিলেন, "অর্থোপার্জ্জন যে আমাদের জীবনযাত্রার উপায় মাত্র তাহা ভুলিয়া গিয়া বিলাতি Industrialism এর নকল করিয়া অর্থ-উপার্জ্জনের জন্যই জীবনযাপন করিবার চেষ্টা করিতেছি।" পিতৃদেব তাই শিল্পে বানিজ্যে, শিক্ষা, দীক্ষায়, পল্লী-সংস্কারে এই নব-জাগরিত -জাতিকে প্রকৃত পথের সন্ধান দিয়েছিলেন, এই সম্মিলনে।

দেশের নাড়ীর সঙ্গে তাঁর নিবিড়-যোগ ছিল, তার প্রাণধারার পরিচয় তিনি পেয়েছিলেন বলেই নিজের খেয়ালমত মনগড়া একটা কিছু কার্য্য প্রণালী দেশের ঘাড়ের উপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করেন নি। বাস্তবিকই দেশ কোন্‌টি গ্রহণ করবে, কার্য্যক্ষেত্রে কোন্‌টার মধ্যে কতটুকু সম্ভাবনা রয়েছে, পিতৃদেব তার হিসেব নিয়েই কার্য্যপ্রণালী নির্ণয় করতেন। সেজন্যই তা দেশের লোকের হৃদয় স্পর্শ করতো এবং দেশবাসী ভাল করেই অনুভব করেছিল যে পিতৃদেব তাদেরই একজন। প্রকৃত পক্ষে তিনি পল্লীসমাজ সমুহের সর্ব্বতোভাবে উন্নয়ন করে সেই পল্লী সমাজের জীবন-কেন্দ্র, জিলা সহর ও রাজধানীকে বৃহৎ পল্লী-সমাজে পরিণত করে সমস্ত পল্লী সমাজ একেন্দ্র-সমাজের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়ে পল্লীসমাজ-সংস্কারের দাবী উত্থাপন করেছিলেন।

ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের অধীনে নানারকম কাজকর্ম্মে গ্রামবাসীদের জিলা-সহরে ও রাজধানীতে ছড়িয়ে পড়তে হয়েছিল, তাই যেখানে পূর্ব্বে পল্লীসমাজই জীবনের কেন্দ্র ছিল, সেখানে জিলা-সহর ও রাজধানী সেই কেন্দ্রস্থান অধিকার করাতেই পিতৃদেব মনে করেছিলেন যে সমস্ত পল্লীসমাজকে একটা বড় পল্লীসমাজ জ্ঞান করে এই কেন্দ্র-সমাজের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়াই আবশ্যক।

তাঁর সমগ্র বক্তৃতার উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে তিনি আবেদন-নীতি পরিত্যাগ করে ক্ষমতা-দাবী করার কথা এখানে বলেছিলেন। তাই তাঁর এ অভিভাষণ আমাদের নূতন সুরই শোনালো। কিন্তু বৃটিশ-শাসক-সম্প্রদায় এ পরিকল্পনাকে আদৌ সুনজরে দেখলেন না, তাঁরা মনে করলেন, দেশবাসীর হাতে এ ক্ষমতা এলে বিপ্লববাদীদের দ্বারা দেশ ভরে যাবে। কিন্তু তাঁরা ভুলে গেলেন যে সরকারের কঠোর দমন-নীতির জন্যই বিপ্লবীর সৃষ্টি হয়েছিল এবং যে কোন পথে স্বাধীনতা-লাভে তাঁরা ব্যগ্র হয়েছিলেন। অভিভাষণে একথা উল্লেখ করে তিনি বলেছিলেন, "স্বদেশী-আন্দোলনের পরে আমাদের দেশের যুবকবৃন্দের মনে ও প্রাণে দেশের জন্য কাজে লাগিবার একটা প্রবল আকাঙ্খা জগিয়াছে, অৰ্দ্ধোদয়-যোগের সময় কলিকাতা সহরে ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে তাহারা যথার্থ কার্য্য করিবার ক্ষমতার প্রমাণ দিয়াছে, তাহা আমাদের রাজকর্ম্মচারীরা পুনঃ পুনঃ স্বীকার করিয়াছেন। সেদিন যখন দামোদরের বন্যায় অনেক গ্রাম, অনেক সহর ভাসিয়া গিয়াছিল, তখন আমাদের দেশের যুবকবৃন্দ দলবদ্ধ হইয়া সেইসব বন্যাপীড়িত নিরাশ্রয় গ্রামবাসীদের যে সাহায্য করিয়াছিল, তাহাতে কি তাহাদের দেশের জন্য কার্য্য করিবার আকাঙ্খা ও ক্ষমতা প্রকাশ পায় নাই? আমার মনে হয়, এই কাজ করিবার ক্ষমতা সত্ত্বেও কাজে লাগিতে না পারায় দেশের যুবকদিগের মধ্যে

একটা অসহিষ্ণুতার ভাব, একটা নৈরাশ্যের বেদনা জাগিয়া উঠিয়াছে ; এই রাজদ্রোহিতা সেই অসহিষ্ণুতা বা সেই নৈরাশ্যেরই ফল।” তিনি বিশ্বাস করতেন যে রাজকর্ম্মচারীরা স্থায়ীভাবে এইসব যুবকদের দেশের কল্যাণের জন্য কোন কাজ করবার সুযোগ দেবেন না, এই দৃঢ় বিশ্বাস এদের মন থেকে দূর না করে দেওয়া পর্য্যন্ত রাজদ্রোহের সূচনা নির্ম্মূল করা যাবে না। গালাগালি এবং কঠোর দণ্ড দিলেই ব্যাধির আরোগ্য হয় না, এই কথাই দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করে তিনি বল্লেন ;— “দেশে রাজদ্রোহের সূচনা হইয়াছে বলিয়া দেশের লোককে দেশের কাজ করিতে না দিলে, সেই রাজদ্রোহেরই পথ প্রশস্ত হইবে।” বৃটিশ-সরকার তখন পিতৃদেবকে বিপ্লবীদের সহায়ক বলে উল্লেখ করেছিলেন। বিপ্লববাদীদের সহায়ক তিনি নিশ্চয়ই ছিলেন, কিন্তু অকারণে গুপ্তহত্যার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। তিনি সহায়ক ছিলেন তাদের দেশের কাজে লাগিবার দুর্ব্বার আকাঙ্ক্ষার, সহায়ক ছিলেন তিনি তাদের স্বদেশ-ভক্তির, এবং যাতে তারা ভুল-পথে না যায়, সেজন্যই তিনি চেয়েছিলেন তাঁর গ্রাম্য-সংস্কার-পরিকল্পনার অনুমোদন। বিপ্লবীদের হিংসামূলক কার্য্যপ্রণালী, একক হত্যায় তাঁর অনুমোদন না পেলেও, স্বদেশের জন্য তাঁদের আত্মদান, এবং দেশজননীর সেবার দুর্দ্দমনীয় বাসনা, শুধু তাঁর অনুমোদন নয়, সক্রিয় সাহায্যও পেয়েছিল। তাদের আকাঙ্খার নিকট তাঁর ভক্তিনম্র-শির শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়েছিল আলিপুরের বোমার মামলায় আসামী-পক্ষ-সমর্থনে ও গোপীনাথ সাহার আত্মদানের প্রশংসা করে।

সুরাট থেকে বোম্বাই কংগ্রেস পর্য্যন্ত (তার পূর্ব্বে কংগ্রেসে আবেদন নিবেদন ও তোষণ ছাড়া বিশেষ কিছু উল্লেখযোগ্য নেই) একদিকে কংগ্রেসের অসাড় নীতি ও অন্যদিকে ক্রমবর্দ্ধমান বৃটিশ রাজশক্তির অত্যাচারে বাংলার সন্ত্রাসবাদীদের কার্য্যকলাপ নিস্তেজ হয়ে

পড়ে। দেশের এই রাজনৈতিক-পরিস্থিতির মধ্যে ভবানীপুরের ভাষণ নানাদিক হতে উল্লেখযোগ্য। জনসাধারণ যখন কংগ্রেসের আবেদন নীতিতে আস্থা হারিয়ে জাতীয় দলে বিভক্ত হয়ে মডারেটদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে শক্তিক্ষয় ও দেশকে ভ্রান্ত পথে নিয়ে যাবার উপক্রম করেছিল ঠিক সে সময় পিতৃদেব ভবানীপুরের কন্‌ফারেন্সে জাতিকে নূতন পথের সন্ধান দিলেন।

এই ভাষণের পরই ২০শে আগষ্ট ভারতসচিব মণ্টেগু ঘোষণা করেন যে ভারতবাসীকে অধিকতর রাজনৈতিক অধিকার দেওয়া হবে, এরং ক্রমে ক্রমে এই অধিকার বৃদ্ধি করে ভারতকে স্বায়ত্ত-শাসন দেওয়াই বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য। মণ্টেগুর এই ঘোষণায় দেশে তুমুল সাড়া পড়ে গেল। ইউরোপীয়ানরা তাঁদের অধিকার ও স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবার আশঙ্কায় ভারতের রাজনৈতিক-স্বাতন্ত্র লাভের বিরুদ্ধে তুমুল প্রতিবাদ তুললো। পিতৃদেব তখন দেশবাসীকে রাজনৈতিক-চেতনায় উদ্বুদ্ধ করবার জন্য জায়গায় জায়গায় বক্তৃতা করে বেড়াতে লাগলেন। বিনা-বিচারে অন্তরীণে-আবদ্ধ যুবকদের মুক্তিকল্পে তাঁর আবেগময়ী বক্তৃতায় দেশে প্রচণ্ড আলোড়ন হলো; তিনি বল্লেন "যখন ভারত গভর্ণমেণ্ট প্রচার করেছেন যে কিছু কিছু করে স্বায়ত্ত্ব-শাসনের অধিকার দেশবাসীকে দেওয়া কর্ত্তব্য, তখন যুবকবৃন্দকে সমগ্র ভারতের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সাধারণ জনমতকে উপেক্ষা করে এভাবে আবদ্ধ রাখা কি যুক্তিসঙ্গত?" মণ্টেগুর ঘোষণায় নানারকম গুজবে দেশ ভরে গেল, কেউ বল্ল, এই ঘোষণা-অনুসারে দেশবাসী রাজ্য-শাসন প্রণালী সম্বন্ধে কি কি পরিবর্ত্তন প্রয়োজন মনে করেন তা জানবার জন্য মণ্টেগু ভারতে এসে বড়লাটের সঙ্গে নানাস্থানে পরিভ্রমণ করে জনসাধারণের মত জানবেন; আবার কেউ বল্ল যে মণ্টেগু ইংলণ্ডের যুদ্ধের জন্য সৈনিক সংগ্রহ করতে এদিকে আসবেন, ও আমাদের

স্বায়ত্ত-শাসন প্রদান করবেন। এই সময় শ্রীমতি এ্যানি বেসান্ত স্বায়ত্ত শাসনের দাবী ঘোষণা করে সর্ব্বত্র আন্দোলন করে বেড়াবার জন্য মাদ্রাজ-গভর্ণর লর্ড পেণ্টল্যাণ্ডের আদেশে ১৬ই জুলাই অন্তরীণে আবদ্ধ হন। শ্রীমতি বেসাণ্টের অন্তরীণে দেশ উত্তেজনায় ভরে উঠাতে মণ্টেগু-প্রসঙ্গ যেন কতকটা চাপা পড়ে যায়। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন হলে ২৫শে জুলাই এক প্রতিবাদ সভায় পিতৃদেব তীব্র ভাষায় বল্লেন, "I do not think the God of Humanity was crucified only once. Tyrants and oppressors have crucified humanity again and again, and every outrage on humanity is a fresh nail driven through his sacred flesh." এইঘটনার পর পিতৃদেব ন্যাশনালিষ্ট-সম্প্রদায় হোমরুল লীগে যোগ দিয়েছিলেন। আমরা তখন 'হোমরুল-লেখা' ব্রোচ পরতাম, 'হোমরুল-লেখা' কতরকম নক্সা-পাড়ের শাড়ীই না পরতাম। পিতৃদেব আমাদের পরণে এসব শাড়ী দেখে হেসে বলেছিলেন, "ব্যবসায়ীদের লাভের অঙ্কের দিকে লক্ষ্য ঠিকই আছে"। ১৬ই আগষ্টএর প্রতিবাদ-কল্পে বাংলার নেতৃবৃন্দ টাউন হলে সভা করবেন বলে ঠিক করেছিলেন, কিন্তু গভর্ণমেণ্ট সে সভা করতে দিলেন না। এসময় পিতৃদেব ভয়ানক উত্তেজিত হয়েছিলেন। তাঁর আহার নিদ্রা ঘুচে গেল, শুধু বলতেন "এ আদেশ কিছুতেই মান্য করা যাবে না, তাতে যদি জেল হয় হবে"। তাঁকে শান্ত করতে তখন যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল।

এই একই বৎসরে একটার পর একটা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে পিতৃদেবকে ঘটনা-স্রোতে যেন ভাসিয়ে নিয়ে গেল। প্রতিবাদ-সভার উত্তেজনা থামতে না থামতে আবার এক নূতন গোলযোগের সৃষ্টি হলো। অন্তরীণে আবদ্ধ হাওয়াতে দেশবাসী শ্রীমতী বেসাণ্টকে সম্মানিত করার জন্য ভারতের ছয়টি প্রদেশই তাঁকে আসন্ন-কংগ্রেসের

সভানেত্রীর পদে মনোনীত করলো। বাংলার মনে-প্রাণে সে ইচ্ছা থাকলেও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মডারেটগণ তার বিরুদ্ধাচরণ করলেন। ২৯শে আগষ্ট কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে সুরেন্দ্রনাথ, মামুদাবাদের রাজাকে সভাপতিরূপে প্রস্তাব করেন। এদিকে জাতীয় দলের ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী প্রস্তাব করেন যে ভারতের অন্যান্য ৬টি প্রদেশের ন্যায় বাংলাও শ্রীমতি বেসাণ্টের নাম প্রস্তাব করুক। পিতৃদেব প্রস্তাবটি সমর্থন করলেন। ভোট গ্রহণে দেখা গেল সুরেন্দ্রনাথ মাত্র চার ভোটে পরাজিত হয়েছেন। সুরেন্দ্রনাথের এই আচরণে জাতীয়দলের মধ্যে অসন্তোষ প্রকাশ পেল। গগণেন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁর অসন্তোষ জানিয়ে বল্লেন "এই আচরণে সমস্ত ভারতের কাছে বাংলাকে মাথা হেঁট করে থাকতে হবে।"

কংগ্রেসের নিয়মানুসারে অভ্যর্থনা-সমিতিই চূড়ান্ত-নির্ব্বাচনের অধিকারী, তাই ৩০শে আগষ্ট অভ্যর্থনা-সমিতির দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতি-নিয়োগের দিন স্থির হলো। কংগ্রেস কমিটির ব্যবহারে মর্ম্মাহত হয়ে দলে দলে একুশ বৎসরের অধিক লোকেরা পঁচিশ টাকা ফী দিয়ে creedএ সই করে অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য হলেন। এত-সংখ্যক লোক দেখে স্যার সুরেন্দ্রনাথ প্রমাদ গণলেন, তিনি বুঝলেন জাতীয় দলের জয় সুনিশ্চিত ; তখন তিনি পিতৃদেবকে বল্লেন "এত দরকার নেই, এখানে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না করে অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটিকে সভাপতি নির্ব্বাচনের অনুরোধ জানান যাক"। তিনি হয়তো ভেবেছিলেন যে সেখানে শ্রীমতি বেসাণ্টের নির্ব্বাচন তাঁর দলীয় লোকদ্বারা প্রতিরোধ করাতে পারবেন। কিন্তু তাঁর এই কথায় পিতৃদেব ও জাতীয় দলের কেউ রাজী হলেন না। এই নির্ব্বাচন সভায় তুমুল গণ্ডগোল উপস্থিত হলো ; অনেক বাকবিতণ্ডার পর পুনরায় ২৯শে সেপ্টেম্বর স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষের মধ্যস্থতায় স্থির হলো

যে উভয় দল মিলিত হয়ে শ্রীমতি বেসাণ্টকেই সভানেত্রী মনোনীত করবেন। জাতীয় দলের মতই বজায় রইল। এই ব্যাপারে পিতৃদেব বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

এরই তিন-চার দিন পরে মুক্তিলাভ করে শ্রীমতি বেসাণ্ট ৩রা অক্টোবর কলিকাতা এলেন। অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সভায় স্যার সুরেন্দ্রনাথই শ্রীমতি বেসাণ্টকে অভ্যর্থনা করলেন। উভয় দলের একটা আপোষ হলো সত্য, কিন্তু প্রকারান্তরে কংগ্রেস নরম-পন্থীদের হাত থেকে জাতীয়-দলেরই হাতে এসে পড়ল। পিতৃদেবের শ্রম সার্থক হোল।

জাতীয়-দলের এই জয়লাভের পর পিতৃদেব ময়মনসিং, ঢাকা, ও বরিশালে স্বায়ত্ত্ব-শাসন সম্পর্কে এবং অন্তরীণের বিরুদ্ধে ও এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের আচরণের তীব্র প্রতিবাদ ও সমালোচনা করে দেশবাসীকে সচেতন করতে লাগলেন। তাঁর এসব বক্তৃতা এতই প্রাণস্পর্শী ছিল যে তাঁর প্রাণের ডাক দেশবাসী উপেক্ষা করতে পারেনি। এই অল্প সময়েই প্রকাশ্য-রাজনীতিক্ষেত্রে পিতৃদেব প্রচুর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।

১৯১৭ সালে ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় বেসাণ্ট-কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। বিপুল সমারোহে শ্রীমতি বেসাণ্টকে ষ্টেশন থেকে শোভাযাত্রা করে আনা হলো। আমরা সকলে দেবীপ্রসাদ খৈতান মহাশয়ের বাড়ী থেকে এ শোভাযাত্রা দেখেছিলাম। জাতীয় পতাকার ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত-পোষাকে কিশোর-যুবকদের অশ্বচালনা ও জাতীয়-সেবক-দলের ছেলেমেয়েদের শোভাযাত্রা ও সর্ব্বশেষে পুষ্পাচ্ছাদিত গাড়ীতে শ্রীমতি বেসাণ্টের প্রত্যভিবাদন চিত্তাকর্ষক হয়েছিল সন্দেহ নেই। জনাকীর্ণ-পথের দুপাশের বাড়ী লোকে-লোকারণ্য, যেখান দিয়ে তাঁর

গাড়ী যাচ্ছিল, সেখান থেকেই তাঁর উপর পুষ্প-বর্ষণ করে সমগ্র দেশ তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছিল। বৃটিশ আইনের প্রতি ঘৃণা এবং সেই আইন-কবলিত সদ্য-মুক্তিপ্রাপ্তা-দেশনায়িকার প্রতি জনগণের শ্রদ্ধা তাঁকে সম্রাজ্ঞীর মহিমময় আসনেই প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

এই কংগ্রেসের সময় আমাদের রসারোডের বাড়ী কলকোলাহলে মুখরিত হয়ে উঠেছিল। কংগ্রেস অধিবেশনের দশ বার দিন আগের থেকেই অধিবেশনের পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত রোজ সন্ধ্যাবেলা আমাদের বাড়ীতে ত্রিশ চল্লিশ জন ছেলেমেয়ের গানের মহড়া বসেছিল এবং তা বড় সহজ ব্যাপার ছিল না! মহড়ার মাঝখানে আধঘণ্টা বিরতির সময় জলযোগের ধূম পড়ে যেতো। আমাদের বাড়ীর উপরের হলে এই সঙ্গীত সম্মিলনে, এবং নীচে পিতৃদেবের অফিস-ঘরে প্রাদেশিক-জাতীয়-দলের নেতৃবৃন্দের কংগ্রেসের কার্য্যাবলী-আলোচনা এই দুইয়ে মিলে রসারোডের বাড়ী কর্ম্মচঞ্চল হয়ে উঠেছিল সে সময়ে। আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের জননী বি-আম্মা সে সময়ে আমাদের অতিথি-রূপে ছিলেন। তাঁর দুইপুত্র মহম্মদ আলী ও সৌকাত আলী তখন অন্তরীণে আবদ্ধ – তা সত্ত্বেও তিনি জাতীয় মহাসভায় যোগদান করতে এসে ছিলেন। মহিয়সী নারী ছিলেন তিনি। খাস উর্দ্দু বলাতে যদিও আমাদের তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলা মুস্কিলই হতো—তবুও আমরা তাঁর কথা শুনতে খুব ভালবাসতাম, বিশেষ করে তিনি যখন রাত্রে উর্দ্দু ভাষায় আমাদের 'রূপকথা' শোনাতেন- সবভাল করে বুঝতে না পারলেও তাঁর বলার ভঙ্গীতেই মন্ত্র-মুগ্ধের মত বসে শুনতাম আমরা। এ সময় মহম্মদ আলী জিন্নাও আমাদের বাড়ীতে অতিথি ছিলেন।

*

কংগ্রেসের অধিবেশন আরম্ভ হলো 'বন্দেমাতরম্' গান দিয়ে। মেজপিসিমা এ গানের মূলগায়িকা ছিলেন। আমরা ত্রিশ চল্লিশ জন

ছেলে মেয়ে কোরাসে ছিলাম। সে সময় 'মাইকের' কোন ব্যবস্থা ছিলনা, কিন্তু মেজপিসিমার গান অতবড় প্যাণ্ডেলেও কারোও শুনতে অসুবিধা হয়নি। তাঁর গান শুনে সমস্ত প্রাদেশিক-নেতৃবর্গ বিশেষ করে, লোকমান্য তিলক বলেছিলেন "এমন অপূর্ব্ব কণ্ঠে মাতৃমন্ত্র শুনে ধন্য হলাম।" বঙ্কিম চন্দ্রের মাতৃ-বন্দনা সার্থক হয়ে উঠেছিল সেদিন মেজপিসিমার মধুর কণ্ঠে। এরপর রবীন্দ্রনাথ উদ্বোধনে একটি কবিতা পাঠ করেন। সমস্ত দর্শক উচ্চকণ্ঠে জয়ধ্বনি করে উঠলো। বাঙ্গালীর গৌরবে আমরাও গর্ব্বিত হলাম। কিন্তু বিষাদের সুর জেগে উঠেছিল তখন, যখন দেশ-প্রেমিক আব্দুল রসুলের মৃত্যুতে শোক-প্রকাশের প্রস্তাব করা হয়। খুবই ব্যথিত হয়েছিলাম সকলে তাঁর অভাবে। তিনি বাবার অত্যন্ত প্রিয়বন্ধু ছিলেন, তাই এই শোক প্রস্তাবের সময় তাঁর প্রিয়তমা কন্যার বিবাহ-আয়োজনের মধ্যে আব্দুল রসুল সাহেবের আকস্মিক মৃত্যুর উল্লেখ করে পিতৃদেব খুবই ব্যথিত হয়ে ছিলেন।

এই কংগ্রেসের একটু পূর্ব্ব-ইতিহাসও আছে। কারণ ১৯০৭ সালে সুরাটে যে কংগ্রেস ভেঙ্গে যায়, এবং চরম-পন্থীরা যে কংগ্রেস থেকে বের হয়ে আসেন বা নরম-পন্থীদের দ্বারা বহিষ্কৃত হন, এবং যে কংগ্রেসকে চরম-পন্থীরা "মডারেট মজলিস" বা "মেহতা মজলিস" বলে আখ্যা দিয়েছিলেন ; সুরাটের সেই কংগ্রেসের দীর্ঘ নয় বৎসর পর কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনে নরম ও চরম পন্থীদের মিলনের একটা সংযোগস্থল হয়। কাজেই কংগ্রেসের ইতিহাসে এ অধিবেশনের গুরুত্ব অনেক এবং পিতৃদেবের তাতে যোগদান এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সঙ্গেই জড়িত। স্বদেশী-যুগে তিনি চরম-পন্থী দল-ভুক্ত ছিলেন ; "মডারেট মজলিসে" তিনি কখনো থাকেননি বা থাকতেও পারেন না।

কলিকাতায় বেসান্ট কংগ্রেসের প্রধান আলোচ্য-বিষয় ছিল

ভারতবর্ষকে ইংলণ্ড যে রিফরম্ (Reform) দেবে তা গ্রহণ-যোগ্য কি না? পিতৃদেব এই রিফরম্ (Reform) গ্রহণের বিরোধী ছিলেন। এই কংগ্রেসে পিতৃদেব একটি নূতন কথা বলেছিলেন যা পূর্ব্বে কখনো শোনা যায় নি। তিনি বলেছিলেন, "একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ের (Time-Limit) মধ্যে, অন্ততঃ পনের বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিতেই হবে। শুধু তাই নয় এটা তাদের লিখিত-আইন-বিধিতেও (Statute Book) লিপিবদ্ধ করতে হবে।" কংগ্রেসে এটি নূতন কথাই, এবং এই অভিনব প্রস্তাবের গুরুত্ব এবং বৈশিষ্ট্য পরবর্ত্তী কংগ্রেসের ইতিহাসে কোনমতেই উপেক্ষণীয় নয়।

কলিকাতার অধিবেশনের পরই কংগ্রেসের জাতীয়-দলের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত; হয় এটা লক্ষ্য করবার বিষয় যে জাতীয়-দলের এই প্রাধান্য সূচিত হলো প্রথম বাংলার বুকেই। সুরাটে যার প্রারম্ভ, তার এক অধ্যায়ের সমাপ্তি হোল বাংলাতে। জয়ের আনন্দে পিতৃদেব দীপ্ত হয়ে উঠলেন।

১৯১৮ সালে একদিকে পিতৃদেব যেমন তাঁর আইনের ব্যবসায় অন্যদিকে তেমন কংগ্রেসের কাজে খুবই ব্যস্ত ছিলেন। কংগ্রেসে পুরাপুরিভাবে জাতীয়-দলের প্রতিষ্ঠাকল্পে তিনি দৃঢ়বদ্ধ হন। আমরা অবাক হয়ে ভাবতাম কেমন করে তিনি এত পরিশ্রম করতেন। আইনজীবি হয়ে তখন তিনি আলীপুরের 'ট্রাঙ্ক মার্ডার কেসে' খুবই ব্যস্ত; আবার সমভাবে কংগ্রেসের কাজেও শৈথিল্য দেখিনি কোনোদিন। তাছাড়া পারিবারিক-পরিবেষ্টনেও আমাদের সঙ্গে গান, গল্প, সাহিত্যালোচনা, হাসি-কৌতুক কিছুরই অভাব হতো না। আমার বিয়ে হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও প্রতিদিন রাত্রির খাওয়া তাঁর সঙ্গে বসে খেতে হতো, এজন্য তাঁর বাড়ীর নিকটে ২নং বেলতলা রোডে

আসতে হলো যাতে তাঁর সঙ্গে সদাসর্ব্বদা দেখাসাক্ষাতের সুযোগের অভাব না হয়।

এ সময়কার একটি ঘটনা সামান্য হলেও পিতৃদেবের জীবনের একটা দিকের পরিচয় পাওয়া যাবে বলেই উল্লেখ না করে পারছি না। পিতৃদেব সর্ব্বদাই বলতেন "মানুষ—মানুষই ; ব্রাহ্মণ হলেও সে মানুষ, নমঃশূদ্র হলেও সে মানুষ"। মনুষ্যত্বের অমর্য্যাদাতে তিনি ব্যথিত হতেন। "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই" চণ্ডীদাসের এই অমরবাণী তাঁর মর্ম্মে মর্ম্মে গাঁথা ছিল। মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ-জ্ঞান তাই বাবার একেবারেই ছিলনা, তা সে ধনী হোক বা দরিদ্র হোক, উচ্চ হোক বা নীচ হোক, হিন্দু হোক বা মুসলমান হোক, কিছু এসে যেত না তাতে ; তাঁর কাছে সকলেই ছিল মানুষ, সেই মানুষেরি বিকশিত-রূপ দেখেছিলাম তাঁর মধ্যে।

কলিকাতা-কংগ্রেসের পর তিনি যখন একবার বরিশালে গিয়েছিলেন, তখন সেখানে তাঁর সঙ্গে ভেগাই হালদারের পরিচয় হয়। ভেগাই সেখানকার একজন কংগ্রেস-কর্ম্মী ছিল, জাতিতে সে নমঃশূদ্র। ভেগাই কলিকাতা এসে বাবার বাড়ীতেই উঠলো। ভেগাই আসাতে আমাদের বাড়ীর বহু আত্মীয়েরা এবং কর্ম্মচারীবৃন্দ মাকে জানালেন যে ভেগাইএর খাবার ব্যবস্থা যেন রান্নাবাড়ীর দালানে না করা হয়। বহু-আত্মীয়-পরিজন-পরিবৃত গৃহে সকলকার অভিযোগ-অনুযোগই শুনতে হতো মাকে। মা সব দিক বিবেচনা করে ভেগাইর জন্য রান্নাবাড়ীর প্রাঙ্গনে তার নির্দ্দিষ্ট-জায়গা করে দিলেন।

একদিন পিতৃদেব কোর্টে যাবার সময় খেতে বসেছেন, এমন সময় কাঁদতে কাঁদতে সেখানে প্রবেশ করলো ভেগাই। "কি ভেগাই, কি হয়েছে" জিজ্ঞাসা করলেন তিনি। ভেগাই আকুল-ক্রন্দনে তাঁকে

জানালো যে সে একদিনও ভালকরে খেতে পারে না, কারণ মুরগীর এবং পায়রার ময়লার জন্য সে ভালকরে বসতেই পারে না সেখানে, খাওয়াতো দূরের কথা! বাবা সব শুনে মাকে বল্লেন "একজন মানুষ তোমার রান্নাবাড়ীর দালানে বসে খেতে পারেনা, আর তুমি তার কোন প্রতিবিধান করলে না?" মা যদিও নিজে জাত মানতেন না কিন্তু কারো উপর তিনি জোর খাটাতে চাইতেন না; ভেগাইকে দালানে খেতে দিলে পাচক থেকে আরম্ভ করে বাড়ীর অন্যান্য সকলের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হতে পারে এটা তিনি জানতেন। তাই তিনি বল্লেন, "কি করব? তুমি তো জান যে আমি নিজে ওসব মানিনা—কিন্তু সকলের অভি-যোগই তো শুনে আমার ব্যবস্থা করতে হবে।" মার কথা শুনে খানিক চুপ করে থেকে পিতৃদেব বল্লেন "বেশ! আজ রাত্রি থেকে ভেগাই আমাদের সঙ্গে খাবে, তাতে তো কারো আপত্তি হতে পারে না।" সে দিন রাত্রি থেকে ভেগাইর খাবার জায়গা আমাদের সঙ্গেই হোল। ভেগাইর আনন্দ আর ধরে না, তার মনুষ্যত্বকে এতদিন শ্রদ্ধা দেখায়নি কেউ; আজ তার ন্যায্য-পাওনা পেয়ে সে উল্লসিত হয়ে উঠে বাবার পায়ে লুটিয়ে পরল। বাবা পরম স্নেহ-ভরেই তাকে জড়িয়ে ধরলেন। দুজনেরি বক্ষ ভেসে গেল আনন্দাশ্রুতে; আমার স্বামী বলে উঠলেন, "দুজনেই পাগল"। আমি মনে ভাবলাম, এমন পাগলেই যেন দেশ-পূর্ণ হয়। বাবার এই ব্যাপার দেখে বর্ণ ভেদ উঠে গেল আমাদের রান্না-মহল থেকে, কিন্তু ভেগাইর স্নেহের অত্যাচারে আমরা অস্থির হয়ে উঠলাম। আমার বাড়ী খুব নিকটে থাকায় প্রায়ই সে ধাওয়া করতো সেখানে। একদিন বাড়ী ফিরে দেখি আমার উপরের বসবার ঘরে ভেগাই তার ধূলি-ধূসরিত-পদযুগল নিয়ে কাউচে আরাম করে শুয়ে আছে এবং আমাকে দেখে বলে উঠলো "বড়দি, একটু আরাম করে নিচ্ছি"। এতই সরল শিশুর মত ছিল সে যে তাকে কিছু বলা যেতোনা।

এই নিয়ে পিতৃদেবের নিকট কিছু অনুযোগ করলে তিনি বলতেন, "দেখ, দেখি, ওদের মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা যদি আমরা প্রথম থেকেই দিতাম, যদি ওদের সত্তা জানতে দেবার অধিকার থেকে এ ভাবে বঞ্চিত না করতাম, তাহলে ওদের ব্যবহারিক জীবনও আমাদের থেকে ভিন্ন হোতনা। অন্যায় করে যে আত্ম-সচেতনের পথ ওদের আমরা রুদ্ধ করে রেখেছি, সমাজের সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমাদেরই করতে হবে।"

বোম্বাই বিশেষ কংগ্রেসের অধিবেশন ও দিল্লী কংগ্রেস ২য় অধিবেশন—১৯১৮

১৯১৮ সালে দুইবার কংগ্রেসের অধিবেশন একটি বিশিষ্ট ঘটনা। প্রথমবার সৈয়দ হাসান ইমামের সভাপতিত্বে ২৯শে আগষ্ট হতে ১লা সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত কংগ্রেসের বিশেষ-অধিবেশন বোম্বাইএ হয়। দ্বিতীয় অধিবেশন হয় দিল্লীতে ডিসেম্বর মাসে।

আমার স্বামী, ভোম্বল, বেবী, মামা (সুরেন্দ্রনাথ হালদার), কাকা (প্রফুল্ল রঞ্জন) ও আমি বাঙ্গলা থেকে ডেলিগেট নির্ব্বাচিত হয়ে বাবার সঙ্গে বোম্বাই গিয়েছিলাম। মেজপিসিমা অসুস্থ থাকাতে মা যেতে পারেননি।

এসময় "ডিফেন্স অফ ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট ও রৌলট কমিটির রিপোর্টে" সমগ্র দেশ উত্তেজিত হয়ে ছিল। কলিকাতা থেকে বোম্বাই পর্য্যন্ত সমস্ত পথ বাবা বাংলার ডেলিগেটদের সঙ্গে এই ব্যাপার নিয়ে গভীর আলোচনায় মগ্ন রইলেন। বাবা রৌলট কমিটির প্রস্তাবের প্রতিবাদ করতেই যাচ্ছিলেন। এই ব্যাপারে তিনি এত উত্তেজিত হয়েছিলেন যে আর কোনদিকেই মন বসাতে পারছিলেন না।

বোম্বাই এসে আমরা 'তাজমহল' হোটেলে উঠলাম। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, সরোজিনী নাইডু এবং লোকমান্য তিলকের সঙ্গে আমাদের পারিবারিক প্রীতির খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। পণ্ডিত মতিলাল ও শ্রীমতী নাইডু এ হোটেলেই উঠেছিলেন। শ্রীমতী নাইডু ও পণ্ডিতজী দুজনেই বাবার মতই কৌতুকপ্রিয় ছিলেন। পণ্ডিত জহরলাল পিতার এ গুণেরও অধিকারী হয়েছেন।

পিতৃদেব বোম্বাই এসে তাঁর ব্যবহারের জন্য তিন চার খানা মোটর রেখেছিলেন ; তার একখানায় আমরা ভাইবোনেরা সারাদিন সহর দেখে বেড়াতে লাগলাম ; একদিন ফিরে এসে দেখি তিনি হোটেলের নীচের হলে মুখভার করে বসে আছেন। আমাদের দেখে বল্লেন "তিন চার খানা গাড়ী ঠিক করলাম আমার কাজের জন্য, নীচে এসে দেখি তার একখানাও নেই, কারা যে কোন কাজে নিয়ে গেল কিছুই জানিনা।" আমরাও সমস্বরে বাবার কথিত 'কারা'দের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে করতে উপরে চলে গেলাম ; কিন্তু সেই 'কারা'দের মধ্যে আমরাও যে একদল, সেকথা একবারও স্বীকার করলাম না।

২৭শে আগষ্ট বোম্বাই পৌঁছে, তার পরের দিন আমরা বেড়িয়ে ফিরলে ভোম্বল মাথার যন্ত্রনায় অস্থির হয়ে 'এসপিরিণ' খেয়ে ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়ল। আমরা অস্থির হয়ে পিতৃদেবকে খবর দিতে তিনি বল্লেন "চিকিৎসা-পত্র যা করাবার তোমরা সব করাও, ও যদি এখন মরেও যায় তবু কিন্তু আমাকে খবর দিওনা। তাহলে যে দায়ীত্ব নিয়ে আমি এখানে এসেছি তা করতে পারবো না।" আমরা অবাক হয়ে গেলাম। কাকা ও মামা মাথায় হাত দিয়ে বসলেন, আমার স্বামীতো রেগেই গেলেন, বল্লেন, "এমন পাগল তো কখনো দেখিনি! ছেলের চেয়ে দেশের কাজ বড় হলো?" শুধু ছেলে নয় দেশের কাজের জন্য তিনি সমস্ত সংসার নিয়ে পথে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। বিশ্বপ্রকৃতি তাঁকে আহ্বান করেছিল মানুষের গড়া এই ক্ষুদ্র সংসার থেকে এক বৃহৎ সংসারে। আমরা অবাক হয়ে লক্ষ্য করতাম তাঁকে! কিন্তু তাঁর মত পাগল হয়ে সংসার ছেড়ে বেড়িয়ে যেতে পারলাম কই? তাই সংসারের মায়াজালে আজও আবদ্ধ হয়ে পরে রয়েছি। আমি আগেই জানতাম পিতৃদেব যখন যে কাজে থাকতেন, তন্ময় হয়েই থাকতেন, কাজেই আমি আমার স্বামীর কথায় চুপ করে রইলাম।

কংগ্রেসের চিন্তায় তখন তিনি ডুবে রয়েছেন, বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে তাঁর যোগ থাকতোও না এবং তা তিনি রাখতেও চাইতেন না। "দারা পুত্র পরিবার, তুমি কার, কে তোমার ?", পিতৃদেবের এই রকমই নির্ব্বিকার ভাব দেখে আমার স্বামী ছুটলেন ডাক্তারের খোঁজে। আমরা শঙ্কাকুলচিত্তে বসে রইলাম ভোম্বলের কাছে। ডাক্তার এসে অবস্থা গুরুতর দেখে রাত্রি প্রায় ১টা পর্য্যন্ত বসে রইলেন। বাবার খোঁজ নিতে গিয়ে দেখি তিনি লোকজন নিয়ে গভীর আলোচনায় মগ্ন। প্রায় ঘণ্টাখানেক পর পিতৃদেব তাঁর একমাত্র পুত্রকে দেখতে এলেন। ভোম্বল তখন ঘুমাচ্ছিল, তা দেখে বল্লেন, "ওতো এখন ভালই আছে মনে হয়।" ভোরের দিকে ডাক্তার বল্লেন, ভয় নেই। এস্‌পিরিণ্‌ বহু পুরানো থাকাতেই বিষক্রিয়া হয়েছিল। সব চেয়ে আশ্চর্য্য হলাম, যখন সকালে পিতৃদেবকে জানালাম যে ভোম্বল ভাল আছে এবং ডাক্তার বলেছেন কোন ভয় নেই, শুনে তখন ছেলেমানুষের মতই কাঁদতে লাগলেন তিনি। যিনি ছেলের জীবন-সংশয় জেনেও নির্ব্বিকার চিত্তে কার্য্যে সমাহিত ছিলেন, তিনি তখন পুত্র ভাল আছে জেনে কেঁদে উঠলেন কেন ? বুঝলাম অন্তরের কি ব্যথা চেপে তিনি তাঁর মহৎ কর্ত্তব্য করে যাচ্ছিলেন। আমাদের বল্লেন "বাংলার প্রতিনিধির দায়ীত্ব নিয়ে এসেছি, নিজের স্বার্থের জন্য সে কথা ভোলা উচিত হতোনা।" পণ্ডিত মতিলাল বল্লেন "ভোম্বলের জন্য আমরা অস্থির, কিন্তু চিত্ত বেশ বুদ্ধদেব হয়ে বসে আছে—এসব ফিরে গিয়ে তোমার মাকে আমার বলতেই হবে।"

কংগ্রেসের অধিবেশনে রাউলট কমিটির প্রস্তাব প্রতিবাদ করতে উঠে বাবা বল্লেন "আমি এমন কথা কখনো বলিনা যে দেশে বিপ্লব-পন্থীর দল নেই" (I for one do not deny that there is a revolutionary party in this country)" "কিন্তু কঠোর অত্যাচার

দ্বারা (Repressive measures) তাঁদের দমন করা কখনো যাবেনা।"
এই বলে তিনি বাংলার কঠোর-দলন-কাহিনী বিবৃত করেন। কলিকাতার পর এ কংগ্রেসে কিন্তু 'বন্দেমাতরম্' গান শুনে তার বিকৃত সুরে আমরা মর্ম্মাহত হয়েছিলাম। আমার মনে হলো ভারতের অন্যান্য প্রদেশে 'বন্দেমাতরম্' যখন গাইতে হবে তখন বাংলা দেশে গিয়ে অথবা সেখান থেকে গায়ক এনে ঠিক করে শিখে নিতে দোষ কোথায়? যাক্ এখন আর সে প্রশ্ন উঠাবার কোন প্রয়োজনই নেই, কারণ স্বাধীন ভারতে স্বাধীনতার মন্ত্র 'বন্দেমাতরম্'কেই আজ খণ্ডিত করা হয়েছে, কাজেই সুর বৈষম্যে তার অমর্য্যাদা আর বেশী হতে পারে না।

এরপর ডিসেম্বর মাসে ১৯১৮ সালেই মদনমোহন মালব্যের সভাপতিত্বে দিল্লীতে কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। লর্ড হার্ডিঞ্জ তখন দিল্লীতে রাজধানী নিয়ে স্বতন্ত্র প্রদেশ রচনা করেছিলেন। দিল্লী স্বতন্ত্র ভাবে পাঞ্জাব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এই কংগ্রেস অধিবেশনের ব্যবস্থা করেছিল। পারিবারিক নানা কারণে আমরা এসময় বাবার সঙ্গে দিল্লী যেতে পারিনি।

এই অধিবেশনে বহু কৃষক-প্রতিনিধির-উপস্থিতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্বায়ত্ব-শাসন-বিষয়ক-প্রস্তাব নিয়ে এখানে বিশেষ আলোচনা হয়। মডারেট দলীয় শ্রীনিবাস শাস্ত্রী কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন, তিনি বাবার প্রস্তাবিত নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে (Time Limit) অন্ততঃ পনের বৎসরের মধ্যে স্বাধীনতার দাবীর সংশোধন-প্রস্তাব করেন। শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর এই প্রস্তাবের উপরে শ্রীমতি বেসাণ্ট, বিপিনচন্দ্র পাল, মৌলভী ফজলুল হক প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। শ্রীমতি বেসাণ্ট শ্রীনিবাস শাস্ত্রীকে সমর্থন করেন। পিতৃদেব এই সংশোধন-প্রস্তাব বাতিল করবার জন্য প্রবল যুক্তি দেখিয়ে বল্লেন,

"আপনারা এই সংশোধন প্রস্তাব সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করুণ" (I call upon you to reject the amendments in toto)। অবশেষে মূল প্রস্তাবই গৃহীত হয়।

এত কাজের মধ্যেও কিন্তু বাবা আমাদের জন্য দিল্লীর জরীর জুতা ও কাঁচের চুড়ী আনতে ভোলেননি, আর এনেছিলেন এক রাশ 'দিল্লীকা লাড্ডু'। লাড্ডু আমাদের দিয়ে হেসে বল্লেন "এই নে দিল্লীকা লাড্ডু, 'এ লাড্ডু যো খায়া ওভি পস্তায়া, আউর যো নেই খায়া ওভি পস্তায়া,' এখন তোরা খেয়ে দেখ্ ?"

এই কংগ্রেস হবার পাঁচ মাসের মধ্যেই ১৯১৯ সালে মে মাসে ময়মনসিংহে প্রাদেশিক সম্মিলন হয়। ১৯১৭ সাল থেকেই পিতৃদেব কংগ্রেসের এবং আইনের কাজে চক্রের মতই অনবরত ঘুরছিলেন। উভয় কাজেই তাঁকে দেখেছি প্রাণান্ত পরিশ্রম করতে।

১৯১৯ সালে ডিফেন্স-অফ-ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট এবং রাউলাট্ বিলের বিরুদ্ধে সমগ্র ভারত তুমুল আন্দোলনে ভরে উঠলো। কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, লাহোর, এলাহাবাদ, নাগপুর, এইসব জনবহুল-সহরে এই বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-সভা আহূত হতে লাগলো। এক রকম সমস্ত ভারতই স্বাধীনতা ও মানুষের সহজাত-অধিকারের বিরোধী এই বিলের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করলো। দিল্লী ও বোম্বাই-কংগ্রেসে পিতৃদেবের তীব্র অথচ যুক্তিপূর্ণ সমালোচনা সত্তেও ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় বেসরকারী সদস্যগণের প্রাণপণ-বিরোধ উপেক্ষা করে ভারত গভর্ণমেণ্ট রাউলাট কমিটির রিপোর্ট অনুসারে ১৮ই মার্চ্চ রাউলাট বিল আইনে পরিণত করাতে, মহাত্মা গান্ধী এই বিলের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ ঘোষণা করলেন।

ভারতের ভাগ্যাকাশ তখন ঘনঘোর-মেঘে আচ্ছন্ন! একটার পর একটা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে ভারতের একপ্রান্ত হতে অপর

প্রান্ত পর্য্যন্ত আন্দোলিত হতে লাগলো। মহাত্মার সত্যাগ্রহকে সমর্থন করে ৬ই এপ্রিল কলিকাতা গড়ের মাঠে মনুমেণ্টের নীচে এক বিরাট প্রতিবাদ-সভায় পিতৃদেব সত্যাগ্রহ শপথ গ্রহণ করলেন। মহাত্মার আহ্বানে সমগ্র বাংলা একমুহূর্ত্ত বিবেচনা না করে ঝাঁপিয়ে পড়ল। পরবর্ত্তীকালেও মতবিরোধ সত্ত্বেও বহুবার বাংলা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল স্বাধীনতা-যজ্ঞে। প্রাদেশিক-মনোভাব নিয়ে সভা বসিয়ে চিন্তা করে জটিলতা-সৃষ্টি করবার অবসর তখন বাঙ্গালীর ছিলনা। ভারতের প্রত্যেক প্রদেশই প্রাদেশিকতার প্রভাবমুক্ত হলে বিশ্ব-সভায় ভারত গর্ব্বোন্নত শিরে দাঁড়াতে সক্ষম হবে।

পিতৃদেবের সত্যাগ্রহ-শপথ-গ্রহণের কথা বেশ মনে আছে। মিটিং থেকে বাড়ী ফিরতে সেদিন তাঁর দেরী হয়েছিল। শরীর ভাল না থাকাতে সেদিন এ সভায় আমি যেতে পারিনি, মা ও বেবী গিয়েছিল সঙ্গে। আমাকে ও বড়পিসিমাকে উদ্বিগ্ন করে ওঁরা বেশ রাত করেই বাড়ী ফিরলেন। বাবা এসেই বড়পিসিমাকে বল্লেন "দিদি, আজ সত্যাগ্রহ-শপথ করে এলাম"। বড়পিসিমা জিজ্ঞাসা করলেন "সত্যাগ্রহ শপথটা কি ?" তার উত্তরে পিতৃদেব প্রাঞ্জল-ভাষায় বল্লেন "জীবনে যেটা সত্য বলে বুঝব, সেই আদর্শ রাখতে জীবনপণই হলো সত্যাগ্রহ।" সত্যের প্রতি বড়পিসিমার আগ্রহ চিরদিনের—তাই তিনি খুব খুসী হয়ে বাবাকে আশীর্ব্বাদ করে বল্লেন "সত্যের প্রতি এই আগ্রহ যেন তোর জন্ম জন্ম থাকে ভাই।"

এরপরই ২৩শে এপ্রিল কুখ্যাত জালিওনাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের খবর পেয়ে বাবা ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে বল্লেন, "না—বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের স্পর্দ্ধা ক্রমেই সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এর একটা প্রতিকারের উপায় করতেই হবে।" এত ব্যথিত ও মর্ম্মাহত হয়েছিলেন তিনি যে, সঙ্কল্প করলেন, সত্যাগ্রহ করে জেলেই যাবেন।

ময়মনসিং প্রাদেশিক সম্মিলন ১৯১৯ মে ও অমৃতসর কংগ্রেস ১৯১৯ ডিসেম্বর।

এই সংকল্প করেই মে মাসে ময়মনসিংহ-প্রাদেশিক-সম্মিলনীতে তিনি যোগদান করলেন। কাজেই এই সম্মিলন নানাভাবেই উল্লেখ-যোগ্য।

পিতৃদেবের ময়মনসিংহ-যাত্রাকালে মা, বেবী, আমার স্বামী ও আমি তাঁব সঙ্গী হলাম। আমাদের সঙ্গে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, নিশীথচন্দ্র সেন, মামা সুরেন্দ্র নাথ হালদার. ঢাকার শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং ব্যারিষ্টার ইন্দুভূষণ সেনও ছিলেন। ময়মনসিংহ যেতে বাহাদুরাবাদ ষ্টেশন-ঘাটের কথা চিরকাল মনে থাকবে। ষ্টেশনে গাড়ী থামলে দেখি প্লাটফর্ম্ম বলে কিছু নেই। গাড়ীর থেকে নামতে হলে লাফিয়ে পড়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। মা আর বেবীব নামতে কষ্ট হল না; আমার কিন্তু নেমে-পড়া এক দুরূহ ব্যাপার হয়েছিল। আমার অবস্থা দেখে বাবা বল্লেন "কিছু ভয় নেই—আমি দাঁড়িয়েছি' তুই আমার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়"। আমিও বাবার কোলে ঝাঁপিয়ে-পড়া নিরাপদ মনে করে নির্ভয়ে ঝাঁপ দিলাম; কিন্তু আমার দেহের ভার পিতৃদেব সামলাতে পারবেন কিনা সেটা আগে ভাবা হয়নি। ঝাঁপিয়ে পড়ামাত্র প্ল্যাটফর্ম্ম-পূর্ণ লোকদের সামনে বাবা আর আমি দুজনেই মাটিতে পড়ে গেলাম। কোনরকমে উঠে জাহাজে আমি চুপ করে বসে রইলাম, বেশ বুঝতে পারলাম যাত্রীরা এই দৃশ্যটা খুব উপভোগ করেছে।

এ যাত্রায় পিতৃদেব করাটিয়ার প্রসিদ্ধ জমিদার চাঁদ মিঞার

সঙ্গে বন্ধুত্বে আবদ্ধ হন। চাঁদ মিঞা সাহেব পরে দেশের কার্য্যে কারাবরণ করেছিলেন।

পিতৃদেব এই সম্মিলনীর নির্ব্বাচন-সমিতিতে পূর্ব্বেই সত্যাগ্রহ প্রস্তাবটি পাশ করিয়ে নিয়েছিলেন; কিন্তু প্রকাশ্য-সভায় তিনি পরাজিত হলেন। এসময় মৌলভী ফজলুল হক্‌ ও বিপিন চন্দ্র পাল পিতৃদেবকে প্রতিবাদ করেছিলেন। বিপিন বাবু যেন ক্রমশঃই পিতৃদেব হতে দূরে সরে যেতে লাগলেন। বাবার এই পরাজয়ে আমরাও কতকাংশে দায়ী ছিলাম। আমি বাবার বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিলাম শুধু স্বার্থপরতার খাতিরে। নিশীথচন্দ্র সেন মহাশয় আমাদের বলেছিলেন, "তোমার বাবা এতে জয়ী হলে তার নির্ঘাত জেল হয়ে যাবে- জেলে গেলে আর তাঁকে বাঁচতে হবে না।" এ কথা শুনে ন্যায়-অন্যায-বোধ সব আমাদের ঘুচে গেল—পিতৃদেবকে হারাতে মোটেই আমরা প্রস্তুত ছিলাম না—তাই আমরা সকলেই একজোটে তাঁর বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিলাম। মা কিন্তু বাবাকে সমর্থন করলেন। পরাজিত হয়ে পিতৃদেব মনে খুব কষ্ট পেয়েছিলেন; কেননা জীবনে কোন খানেই কোন অবস্থাতেই তিনি পরাজিত হন নি। পরাজয়-বরণ করা তিনি সমিচীন মনে করতেন না, একথা বোঝবার মত মনের বল তখন থাকলে একাজ কখনোই করতাম না। অধিবেশন থেকে ফিরে এসে কলিকাতা প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত একটা কথাও তিনি আমাদের সঙ্গে বলেন নি। খাওয়া-দাওয়া একরকম ছেড়ে দিলেন। অবস্থার গুরুত্ব দেখে অনু-শোচনায় দগ্ধ হতে লাগলাম, তখন মনে মনে ঠিক করলাম জীবনে আর তাঁর বিরুদ্ধে যাব না।

ময়মনসিংহ-প্রাদেশিক-সম্মিলনেই পিতৃদেব বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে অসহযোগের প্রস্তাব প্রথম উত্থাপন করেছিলেন। কংগ্রেসের

ইতিহাসে চিত্তরঞ্জন দাশ অসহযোগ-প্রস্তাবের প্রথম-উত্থাপনকারী একথা আশা করি বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে যাবে না।

ময়মনসিংহ থেকে ফিরে এসেই বাবা জালিনওলাবাগের হত্যা-কাণ্ডের তদন্ত হওয়া উচিত মনে করেন। তদনুসারে দেশবাসী রয়েল কমিশন প্রার্থনা করে। দেশবাসীর সে প্রার্থনা অগ্রাহ্য করে গভর্ণমেণ্ট হাণ্টারকে সভাপতি করে একটি কমিটি গঠিত করেন। কলিকাতা হাইকোর্টের জ্যাষ্টিস্ র‍্যান্‌কিন্, পণ্ডিত জগৎনারায়ণ, স্যার চিমন্‌লাল শীতলবাদ প্রভৃতি এই কমিটির সভ্য মনোনীত হন। প্রথমে এই কমিটিতে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ও পিতৃদেব উভয়েই প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবি হিসাবে উপস্থিত থেকে সাক্ষীদের জেরা করার কথা ছিল। তাঁরা চেয়েছিলেন যে কমিটির কাছে যেমন স্যার মাইকেল ওডায়ার, জেনারেল ডায়ার, কর্ণেল জনসন প্রভৃতি উপস্থিত থাকবেন, তেমনি লালা হরকিশন লাল, ডাক্তার কিচলু এঁরাও সমভাবে উপস্থিত থাকবেন। এতে সম্মত না হওয়াতে গভর্ণমেণ্টকে বিকল্পে বলা হলো যে বন্দী-অবস্থাতেই তাঁদের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করতে দেওয়া হোক। বিকল্প প্রস্তাবও অগ্রাহ্য করাতে মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত মতিলাল ও পিতৃদেব একযোগে হাণ্টার কমিটি বর্জ্জন করলেন। কিন্তু অল্ ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটিতে মহাত্মা, বাবা, মতিলাল, আব্বাস্ তায়েবজী ও জয়াকরকে নিয়ে পূর্ব্বেই একটি অনু-সন্ধান-কমিটি গঠিত হয়েছিল; এই কংগ্রেস-অনুসন্ধান-কমিটির উদ্দেশ্য ছিল, হাণ্টার-তদন্তের মূল সাক্ষ্যগুলি সম্বন্ধে বিচার করে অন্যান্য আরও নূতন প্রমাণ গ্রহণ করে প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধান করা।

এ সময় বিখ্যাত মিউনিশন-বোর্ড এর মোকর্দ্দমায় তিনি গভর্ণমেণ্ট থেকে নিযুক্ত হয়েছিলেন—কিন্তু তিনি সে মোকর্দ্দমার কাগজপত্র সব ফিরিয়ে দিলেন—দেশমাতৃকা তাঁকে আহ্বান করছিলেন

আরো মহত্তর কাজে। তাই হাইকোর্টের সব কাজ-করা বন্ধ করে মাসেরপর মাস অমৃতসরে কাটালেন। আর্থিক-ক্ষতি তাঁর যথেষ্ট হয়েছিল, কিন্তু তিনি তা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেন নি। সমস্ত শক্তি তিনি একত্রীভূত করলেন এই তদন্ত-কমিটির কার্য্যে।

সে সময় এ তদন্তের ফলে বৃটিশসৈন্যদের যে বর্ব্বরতার কথা বাবার কাছে শুনেছিলাম, তা ভাষায় ব্যক্ত করা আমার পক্ষে অসম্ভব! কোন জাতি এমন নৃশংস অমানুষোচিত ব্যবহার করেও পৃথিবীতে সভ্য বলে গর্ব্ব করতে পারে ভেবে আমরা আশ্চর্য্য হয়েছিলাম। যে ইংলণ্ড স্ত্রীলোকের প্রতি সম্মান দেখাতে মৌখিক-ভদ্রতায় উছলে পরে, সেই সভ্যতার লীলাকেন্দ্রের ইংলণ্ডবাসীরাই অসহায় ভারতীয় স্ত্রীলোকদের উপর অত্যাচারের যে বীভৎস কলঙ্কময় অধ্যায়ের নিদর্শন রেখে গিয়েছে তা তুলনাহীন। এই অত্যাচারের কলঙ্ক-কালিমায় ইংলণ্ড চিরকাল সভ্যতার ইতিহাসে মসীলিপ্ত হয়েই থাকবে।

জালিওনাবাগের এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডে ব্যথিত হয়ে উঠলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। ১৯১৯ সালে ৩০শে মে ভাইস্‌রয় লর্ড চেমস্‌ফোর্ডকে এক পত্রে তিনি জানালেন যে মহামান্য সম্রাটের সম্মানভার হতে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হউক।
'স্যার' উপাধি ত্যাগ করে রবীন্দ্রনাথ এই ঘৃণ্য হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানালেন।

ময়মনসিংহ থেকে এসে কিছু পরেই বাবা অমৃতসর চলে গেলেন। তার ক'দিন পূর্ব্বে মা, বেবী ও অসুস্থ ভোম্বলকে নিয়ে রিখিয়া চলে গেলেন ভোম্বলের ভগ্ন-স্বাস্থ্যের জন্য। কথা হলো হাইকোর্ট বন্ধ হলে আমরা, মা ও ওদের রিখিয়া থেকে নিয়ে

সকলে একসঙ্গে অমৃতসর যাব। সেই ব্যবস্থানুযায়ী আমরা আগষ্ট মাসের শেষে মার কাছে রিখিয়াতে এলাম। মন কিন্তু অস্থির ছিল বাবার কাছে অমৃতসরে তাড়াতাড়ি পৌঁছবার জন্য।

রিখিয়া জায়গাটি প্রাকৃতিক দৃশ্যে মনোরম; বিশেষ করে ছোট ছোট পাহাড় ও মহুয়া গাছের শ্রেণীতে আমরা মুগ্ধ হয়েছিলাম। সাঁওতালদের অপূর্ব্ব দেহশ্রী, তাদের রমণীদের রমণীয় খোপা বাধবার ভঙ্গী; ছবিরমত চিত্রিত করা তাদের মাটীর কুটির খুবই আকর্ষণীয় ছিল।

এ জায়গাটার আর একটা আকর্ষণ ছিল, কারণ পিতৃদেব এই জায়গাটা, কুমার কৃষ্ণদত্ত ও শরৎচন্দ্র রায়চৌধুরী প্রভৃতি আরো কয়েকজনের সঙ্গে নিয়েছিলেন আদর্শ-পল্লী-গঠনের উদ্দেশ্যে। সে উদ্দেশ্যে তিনি বহু অমূল্য সময় ও অর্থব্যয় করেছিলেন। গঠন-মুলক কার্য্য চলার কালেই আমরা এসে দেখলাম পথ-ঘাট বাধান হচ্ছে, চাষবাসের আয়োজনও চলছে। পরবর্ত্তীকালে ভোম্বলকেও এই কাজের জন্য এখানে তিনি রেখেছিলেন। অসহযোগ-আন্দোলনে যোগ দিয়ে যখন তিনি সর্ব্বস্ব-ত্যাগ করলেন তখন সময় ও অর্থ কোনটাই তাঁর ছিল না। রিখিয়ার ব্যবস্থা পরে কুমার কৃষ্ণদত্ত প্রভৃতি গ্রহণ করেছিলেন।

এখানে মাসখানেক থেকে নভেম্বর মাসের গোড়াতেই আমরা অমৃতসরে এলাম। যেদিন অমৃতসরে পৌঁছলাম, বাবা সেদিন তদন্ত-কমিটির কার্য্যে লাহোর ছিলেন। মাকে অমৃতসর রেখে পিতৃদেবকে আনবার জন্য সেই রাত্রেই আমরা মোটরে লাহোর রওনা হয়ে গেলাম। আমাদের দেখে বাবা খুব আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন, কেননা আমাদের আসবার খবর পাবার আগেই তিনি লাহোর চলে

গিয়েছিলেন। বাবার কাজ শেষ হয়ে গেলে আমরা সেই রাত্রেই অমৃতসর চলে এলাম।

অমৃতসরের বাড়ীটি খুব বড় ছিল। সেখানে মহাত্মা গান্ধী, মতিলাল নেহেরু এবং কমিটির অন্যান্য সভ্যগণ কমিটির কার্য্যের জন্য প্রায় সব সময় আসতেন।

মহাত্মা গান্ধীকে একবার পূর্ব্বে কাকাসাহেব সতীশরঞ্জন দাশের বাড়ী কলিকাতায় দেখেছিলাম। তখন তিনি দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে এসেছিলেন যুদ্ধের জন্য সৈন্য-সংগ্রহ করবার কথা বলতে। এই অমৃতসরে তাঁর সঙ্গে প্রথম ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হবার সুযোগ পেলাম আমরা। যদিও পরে বহুবার তাঁর সান্নিধ্যে অনাবিল আনন্দ লাভ করেছি। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর সঙ্গে বাবা পূর্ব্বেই পরিচিত ছিলেন, এখানে তাঁর পরিবারবর্গের সঙ্গে আমাদের প্রথম আলাপ হলো এবং পরে এই পরিচয়ের পরিণতি হোল আমাদের উভয় পরিবার এবং মহাত্মাজীর মধ্যে আপনার জনের মতই স্নেহ-প্রীতি-ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া।

অমৃতসরের বাড়ী সব সময় জনসমাগমে পূর্ণ থাকতো। সকলে একত্র বসে খাবার সময় তদন্ত-কমিটির কত আলোচনাই না শুনতাম আমরা! পণ্ডিত জহরলাল তখন যুবক। পণ্ডিতজীর সঙ্গে তিনিও সে সময় এখানে ছিলেন। কংগ্রেস অধিবেশনের ঠিক পূর্ব্বেই পণ্ডিত মতিলালের সহধর্ম্মিনী, তাঁর পুত্রবধু কমলা ও দুই কন্যা স্বরূপ (বিজয়লক্ষ্মী) ও কৃষ্ণাকে নিয়ে এলেন।

এখানে কংগ্রেস-তদন্ত-কমিটির কাছে দলে দলে যারা সাক্ষ্য দিতে আসতেন, তাঁদের দেখে ও তাঁদের বর্ণনা শুনে চোখের

জল রাখতে পারিনি। মাতৃঅঙ্ক থেকে শিশুকে ছিনিয়ে নিয়ে তাঁদেরই চোখের সামনে বৃটিশ সৈন্যদের তরবারীতে গেঁথে ফেলার কথা শুনে আমরা মর্ম্মাহত হয়েছিলাম। এই সৈন্যরাই তাদের অধিনায়কের নির্দ্দেশ-মত নারীদের প্রতি যে বর্ব্বর অত্যাচার করেছিল, হত-ভাগিনীদের সাক্ষ্যে ও অঙ্গে তার চিহ্ন দেখে শিউরে উঠেছিলাম। ইংরেজের চূড়ান্ত বর্ব্বরতার নিদর্শন, তাদেরই-কথিত-অসভ্য-ভারতের বুকে বৃটিশের সভ্যতার জ্বলন্ত উদাহরণ ভারতের জাতীয় মহাযজ্ঞের ইতিহাসে চির-দেদীপ্যমান থাকবে সন্দেহ নাই।

জালীনওলাবাগ। যেখানে সভাতে অসহায় সমবেত জন-গণের উপর গোলা-বর্ষণ হয়েছিল, তাদের রক্তে-রঞ্জিত, সে স্থান দেখতে গিয়েছিলাম, একদিন। পাঞ্জাবের এই মরণ-যজ্ঞের ছয় মাস পরেও সে রক্তধারা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়নি—গাড়ী গাড়ী মাটি চাপা দিয়েও তার অস্তিত্ব বিলুপ্ত করতে পারেনি। হিন্দু মুসলমানের মিলিত রক্তে রঞ্জিত সে পবিত্র মাটিতে দাঁড়িয়ে পিতৃদেব কি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন জানিনা; কিন্তু আমার মনে হয় পিতৃদেবের মর্ম্মের সে প্রতিজ্ঞাই বুঝি রূপায়িত হয়ে উঠেছিল তাঁর প্রিয় শিষ্য সুভাষচন্দ্রের মধ্যে - ইংরাজের বিরুদ্ধে আপোষহীন-সংগ্রাম দ্বারা। অকু-স্থলের চারদিকই প্রাচীর-বেষ্টিত, আর প্রাচীরের পরই শ্রেণীবদ্ধ অসংখ্য বাড়ীঘর ছিল।

জনসভায় জনগণকে সমবেত হতে কোনপ্রকার বাধা দেওয়া প্রথমে হয়নি। কিন্তু যখন স্থানটিতে আর তিলধারণের জায়গা রইলনা, তখন বৃটিশ-অধিনায়কের আদেশে সৈন্যবাহিনী প্রবেশ-পথের মুখে ও বাগের চার পাশের প্রাচীরের উপর থেকে মেসিন্‌গান চালিয়ে কত লোককে যে হত্যা করেছিল তার সংখ্যা জানা যায়নি। বহুশিশু

ও নারী যে নিহত হয়েছিল তার প্রমাণ-স্বরূপ রাশি রাশি ছোট জুতা ও ভগ্ন কাঁচের চুড়ী আমরা তখনো পড়ে থাকতে দেখেছিলাম।

গত কংগ্রেসে ডাক্তার কিচলু যখন পরবর্ত্তী-কংগ্রেস অমৃতসরে আহ্বান করেণ, তখন তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি যে মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে পাঞ্জাবের এই মরণ-যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হবে এবং তিনিও শান্তি-রক্ষার চেষ্টায় নির্ব্বাসিত হবেন। তখন ইংরেজরা তাঁকে সন্দেহের চক্ষে দেখলেও পরবর্ত্তীকালে কিন্তু বিশ্বের দরবারে তাঁকে শান্তির অগ্রদূত বলেই সম্মানিত করা হয়েছে। কংগ্রেসের অধিবেশনের পূর্ব্বেই মুক্তি-লাভ করায় তিনি অমৃতসর-অধিবেশনে যোগদান করেছিলেন।

কংগ্রেস-তদন্ত-কমিটির রিপোর্টে দেশবাসী এই অত্যাচারের কাহিনী জানতে পারলো। অমৃতসর-কংগ্রেসে এই জালীওয়ানা-বাগই যে পিতৃদেবের বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে সম্পূর্ণ অসহযোগ-প্রস্তাবের কারণ হয়েছিল তার সন্দেহ নেই।

এপ্রিলে জালিওয়ানাবাগ হত্যাকাণ্ডের পরই ডিসেম্বরে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে অমৃতসরে কংগ্রেসের অধিবেশন হয় (১৯১৯ সাল)। এই অধিবেশনের পূর্ব্বে সংস্কার-ব্যবস্থা মঞ্জুর করে সম্রাটের এক ঘোষণা প্রচারিত হয় এবং কারারুদ্ধ নেতাদের মুক্তি দেওয়া হয়। অধিবেশনে সদ্য-কারামুক্ত আলী-ভ্রাতৃদ্বয়, ডাক্তার কিচলু, লালা হরকিষণ লাল, পণ্ডিত রামভূজ দত্ত চৌধুরী প্রভৃতির যোগদানে সভামধ্যে বিপুল আনন্দ ও উল্লাসের সাড়া পরে গেল। জননেতাদের অভ্যর্থনার সে দৃশ্য এখনো চোখে ভাসছে।

পাঞ্জাবে এত কাণ্ডের পরও মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের অধিবেশনে সম্পূর্ণ সহযোগীতার (Total Co-operation) এবং পিতৃদেব সম্পূর্ণ প্রতিরোধ-মূলক অসহযোগীতার (Total obstruction) প্রস্তাব

উত্থাপন করলেন। অবশেষে লোকমান্য তিলকের মধ্যবর্ত্তিতায় এই বলে আপোষ হলো যে গভর্ণমেণ্টের যে সব ব্যবস্থাকে আমরা স্বরাজ লাভের সহায়ক বলে মনে করবো তার সঙ্গে সহযোগীতা করবো কিন্তু যে ব্যবস্থা-সমূহকে স্বরাজ-লাভের বিঘ্ন বলে মনে হবে তার সঙ্গে আমরা অসহযোগীতা করবো। তিলকের মহারাষ্ট্র এর নামাকরণ করেছিলেন "পারস্পরিক সহযোগীতা" (Responsive Co-operation)। ১৯১৮ সালে 'নির্দ্দিষ্ট সময়' (Time limit) নিয়ে শ্রীনিবাস শাস্ত্রী ও শ্রীমতি বেসাণ্টের বিরুদ্ধে পিতৃদেব দাঁড়িয়ে ছিলেন ; আর এখানে এই কংগ্রেসে তিনি দাঁড়ালেন মহাত্মা গান্ধীর মতবাদের বিরুদ্ধে। পিতৃদেব এই "পারস্পরিক সহযোগীতা" সম্পর্কে অমৃতসরে এক ভাষণে বল্লেন -"The view with which I have compromised it is this, that co-operation when necessary to advance our cause, but obstruction when that is necessary for the advancement of our cause".

অমৃতসর কংগ্রেসের মাস দুই পর ১০শে ফেব্রুয়ারী কাশীধামে কংগ্রেস-তদন্ত-কমিটির পাঞ্জাব-তদন্তের বিবরণ স্বাক্ষরিত হলো। জাতীয় মহাসমিতি, লর্ড চেম্‌সফোর্ডের পদত্যাগ, জেনারেল ডায়ারের পদচ্যুতি ও বিচার, রাউলাট আইন প্রত্যাহার ও সামরিক আইনে প্রদত্ত জরিমানা প্রত্যর্পনের দাবী করেছিলেন ; কিন্তু যে মাসে ভারতসচিবের ও ভারতগভর্ণমেণ্ট 'ডেচপ্যাচে' হাণ্টার কমিটির 'মেজরিটি' রিপোর্ট গৃহীত হওয়াতে জাতীয় মহাসমিতির দাবীগুলি অগ্রাহ্য হলো। গভর্ণমেণ্ট হত্যাকারীদের পুরস্কৃত করলেন এবং জেনারেল ডায়ারের জন্য ভালভাবেই অর্থ সংগৃহীত হলো।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে ইংরেজ ওয়ারেণ্‌ হেষ্টিংশ্‌কে অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছিলেন, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগেই তা

অপেক্ষা বহুগুণে অপরাধী ডায়ারকে সেই ইংরেজই পুরস্কৃত করলো। জাতীয় অধোগতির প্রমাণ এর চেয়ে আর কি হতে পারে?

অমৃতসরে পূর্ণ সহযোগীতা জানানোর ফল মহাত্মা গান্ধী ভাল ভাবেই পেলেন। এই সময় মিত্রশক্তিরা তুর্কীকে যে সন্ধি-সর্ত্ত দিল তাতে মুসলমান সম্প্রদায় বিক্ষুব্ধ হয়ে খিলাফৎ আন্দোলন আরম্ভ করলেন।

এই সময় পিতৃদেব ডুমরাওণ মহারাজের একটি মোকর্দ্দমা নিয়ে ডুমরাওণ যান। সেটা ১৯২০ সাল, আমার স্বামীও জুনিয়ার হয়ে যাওয়াতে আমরা সকলেই সে সঙ্গে গিয়াছিলাম।

কলিকাতা কংগ্রেস বিশেষ অধিবেশন ১৯২০ ৪ঠা সেপ্টেম্বর, নাগপুর কংগ্রেস ১৯২০ ডিসেম্বর।

কংগ্রেসের কাজে বাবা যেমন একমনা হয়ে কাজ করতেন, মোকর্দ্দমার বেলাতেও তাই। কাজে তাঁর শ্রান্তি ছিল না, কিন্তু উদাসীন ছিলেন শুধু নিজের বিষয়ে। ছুটির সময় নাপিত দিয়েও প্রাত্যহিক দাড়ী-কামানতে তাঁর অলসতার সীমা ছিল না। এমন কি পরিধানের জামা কাপড় পর্য্যন্ত একজনের সাহায্য ছাড়া তিনি পরতে পারতেন না। আর অফিসঘরে বসে কাজ করতে করতে কতবার যে মক্কেলের উচ্ছিষ্ট জল খেয়ে ফেলতেন তার সীমা-সংখ্যা ছিল না। আমার স্বামী আমাকে বলতেন "তোমার বাবার মত এমন ঘৃণাশূন্য নোংরা লোক আমি দেখিনি।" আমরা পিতৃদেবকে এ নিয়ে কত যে বকাবকি করতাম তার ঠিক নেই। কিন্তু সে সব কথা তাঁর এক কান দিয়ে ঢুকে অন্য কান দিয়ে বেরিয়ে যেতো।

ডুমরাওণে আমার স্বামী বাবার সঙ্গে কাজ করতে করতে শ্রান্ত হয়ে এক একবার উঠে এসে বলতেন "তোমার বাবা কাজ করতে বসলে আর কোন খেয়ালই থাকে না।" সত্যিই তাই, খাওয়া নিয়ে বসে থেকে থেকে আমরাও শ্রান্ত হয়ে পরতাম।

কাকার (প্রফুল্লরঞ্জন) মেয়েরা, গৌরী ও উমা এ সময় পাটনা থেকে প্রায়ই আমাদের কাছে চলে আসতো। তারা এলে বাবা একটু জব্দ হতেন। তাঁর গভীর কাজের মধ্যে তারা যখন তখন অফিসঘরে প্রবেশ করে হাজার রকম প্রশ্নে তাঁকে বিব্রত করে তুলতো। মক্কেল-পরিবৃত বাবা কিন্তু তাতে একটুও বিরক্ত

হতেন না। কাজ করতে করতে তাদের কথার সমানে উত্তর দিয়ে যেতেন।

এখানে আমাদের 'ডাক' উটবাহিত হয়ে আসতো। তাই দেখে উমার উটে চড়বার বাসনা জেগে উঠলো একদিন। মা তার এ ইচ্ছার একেবারেই অনুমোদন না করাতে সে হঠাৎ সোজা গিয়ে ঢুকল তার জ্যেঠা মহাশয়ের অফিসঘরে যেখানে লোকজন বেষ্টিত হয়ে কাজ করছেন। আমরা যে সে ঘরে গিয়ে তাকে নিয়ে আসবো তারও উপায় নেই। দরজার বাইরে থেকে শুনছি, উমা বাংলা এবং হিন্দী মিশিয়ে বাবাকে বলছে "জ্যেঠামশাই, আমার একঠো ইচ্ছা পূর্ণ হুয়া, কিন্তু আর একঠো ইচ্ছা পূর্ণ নেই হুয়া।" পিতৃদেব বলছেন শুনলাম, "কোন্ ইচ্ছা তোর পূর্ণ নেই হুয়া?" উমা বলল, এখানে আসবার ইচ্ছা পূর্ণ হুয়া কিন্তু উটকা পিঠমে উঠনেকো ইচ্ছা পূর্ণ নেই হুয়া।" বিপুল হাস্য ধ্বনিতে ঘর ভরে গেল। বেচারা উমা তার ইচ্ছা পূর্ণ করবার অনুমতি তার জ্যেঠামহাশয়ের কাছে পেয়েও তা অপূর্ণ রয়ে গেল তার জ্যেঠিমার জন্য। শ্রেণীবদ্ধ উটের আকৃতি দেখে মা বল্লেন "না না কাজ নেই ওতে উঠে।" উমাকে সেদিন বোঝাতে আমাদের প্রাণান্ত হয়েছিল। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও যে তাঁকে তাদেরই একজন মনে করত এ ক্ষুদ্র ঘটনায় তা বেশ দেখতে পাই।

কাজ কর্ম্মের পর রাত্রিবেলা খাওয়ার পরে বাবা খানিকক্ষণ কীর্ত্তন শুনতেন। ওঁর সারাদিনের শ্রান্তি যেন তিনি দূর করতেন এই কীর্ত্তন শুনে। মাঝে মাঝে শ্রীচৈতণ্যদেবের আলোচনা করতেন, বলতেন "সিভিল ডিসোবিডিয়েন্স" কিন্তু মহাপ্রভুই প্রথম প্রবর্ত্তন করেছিলেন, কাজীর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে। আমাদেরও দেখছি

মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত-পথেই চলতে হবে একদিন।" তখন ভাবিনি যে সেই একদিন আর ক'মাসের মধ্যেই এসে যাবে। তখন থেকেই বাবা হয়তো তাঁর আইনব্যবসায় ছাড়বার সঙ্কল্প করেছিলেন, কারণ প্রায়ই তিনি বলতেন 'দুনৌকায় পা দিয়ে চলা যায় না।'

আমরা ডুমরাওণ থাকতেই কলিকাতার ব্যারিষ্টার সুকুমার চন্দ্র সেন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা সুজাতার সঙ্গে ভোম্বলের বিবাহ স্থির হয়; আমি সে সময় শ্বশ্রূমাতার কাছে কলিকাতায় চলে এলাম। কিছুদিন পরে পিতৃদেবও কলিকাতায় এলেন ভাবী-পুত্রবধূকে আশীর্ব্বাদ করবার জন্য।

আমার স্বামী ডুমরাওণেই রইলেন। কারণ কাজের জন্য বাবার আর ওঁর একসঙ্গে আসা চলতো না। সুজাতাকে আমাদের সকলেরই ভাল লেগেছিল, বিশেষ করে ওর সঙ্গীতে আমরা মুগ্ধ হয়েছিলাম। সঙ্গীত-সঙ্ঘের একজন পারদর্শিনী ছাত্রী ছিল সে। বাবার সুরের পিপাসার নিবৃত্তি হয়েছিল সুজাতার অপূর্ব্ব-কণ্ঠে উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতে; সমস্ত রাগমালা ওর মত করে গাইতে আমি আর কাউকে শুনিনি। ভগবানের নিষ্ঠুর বিধানে সুজাতা তার বিবাহিত জীবনের ছয় বৎসরের মধ্যেই তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সুরটি হারিয়ে ফেলল। বাবার মহাপ্রয়াণের এক বৎসরের মধ্যেই ভোম্বলের আকস্মিক মৃত্যুর পর সুজাতা আর কোন দিন গান করেনি।

১৯২০ সালে ৩০শে জুন ভোম্বলের সঙ্গে সুজাতার শুভবিবাহ সম্পন্ন হয়। এর অল্পদিন পূর্ব্বেই ন'পিসিমা (উর্ম্মিলাদেবী) বিধবা হওয়াতে ভোম্বলের বিয়েতে আমার বিয়ের মত সমারোহ হয়নি।

আজ পিতৃদেবের অতি আদরের পুত্রবধুই তাঁর জীবনের স্বপ্নের মধ্যেই নিজেকে জড়িয়ে রেখেছে। 'দেশবন্ধু বালিকাভবন'

প্রতিষ্ঠা করে শুধু নয়, পিতৃদেবের পরিকল্পনা-অনুযায়ী 'পল্লী-সংগঠন সমিতি'র সেবায় মন-প্রাণ ঢেলে দিয়েছে সে।

তিনটি শিশু-কন্যা নিয়ে ১৩২৬ সালে ভাগ্যহীনা হয়ে সুজাতা নয় বৎসর পরে তার কনিষ্ঠা কন্যা ইন্দ্রাণীকেও বিসর্জ্জন দেয়। ভোম্বলের মৃত্যু-সময় ইন্দ্রাণী মাত্র তিন মাসের ছিল। পতি-শোক কন্যাশোক সব ভুলে 'অপরের দুঃখ জ্বালা হবে মিটাইতে' বলে পিতৃদেবের প্রদর্শিত-পথেই আজ সে চলেছে।

১৯২০ সালে ৪ঠা সেপ্টেম্বর লালা লাজপত রায়ের সভাপতিত্বে কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হয়। এইকংগ্রেসে লোকমান্য তিলককে আর দেখতে পাওয়া যাবে না বলে নিদারুণ ব্যথা অনুভব করেছিলাম। দেশের এই সঙ্কট-মুহূর্ত্তে তাঁর মহাপ্রয়াণে পিতৃদেব অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছিলেন। ভ্রাতৃবিয়োগ ব্যথাই অনুভব করেছিলেন তিনি।

এই কংগ্রেসে লোকমাণ্য তিলকের মৃত্যুতে শোক-প্রকাশ যেমন একটি বিশেষ ঘটনা; তেমনি অসহযোগ-প্রস্তাব গৃহীত হবার জন্য মহাত্মার দৃঢ়-সঙ্কল্প আর একটি স্মরণীয় ঘটনা। ঘটনা গুরুতর হলো যখন পিতৃদেব মহাত্মার এ প্রস্তাব সমর্থন করতে অস্বীকার করলেন।

অমৃতসর কংগ্রেসের মাত্র ৮ মাস পরেই কলিকাতার কংগ্রেসের এ অধিবেশনে মহাত্মা তাঁর অভিমত সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করলেন কেন? পিতৃদেব কেনই বা তাঁর মতেরও পরিবর্ত্তন করেছিলেন? সভাপতি লাজপত রায়ও গান্ধীজির অসহযোগ-প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সমালোচনা করেও আবার তা সমর্থন করলেন কেন?

এই কংগ্রেসের ইতিহাসে পিতৃদেবকে রহস্যাবৃত করে রাখা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে পিতৃদেব অমৃতসরে মহাত্মার মতের বিরুদ্ধে অসহযোগ-প্রস্তাব উত্থাপন করলেও কলিকাতার কংগ্রেসে অসহযোগ-প্রস্তাবের বিরোধিতা তিনি করেন নি, বিরোধিতা করেছিলেন মহাত্মার মতবাদের। পিতৃদেব মনে করেছিলেন, মহাত্মা-প্রবর্ত্তিত এই প্রস্তাবে অনেক মারাত্মক ত্রুটি রয়েছে। সভাপতি লাজপত রায়ও তাঁর অভিভাষণে এর ত্রুটি দেখিয়ে সূক্ষ্ম-বিশ্লেষণ করেছিলেন। তাই মনে হয় অমৃতসরে পিতৃদেবের অসহযোগের কারণ যদি জালিওয়ানাবাগ হয়ে থাকে তবে কলিকাতায় মহাত্মার অসহযোগের কারণ হয়তো খিলাফত কমিটির অসহযোগের প্রস্তাব। এ প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধী স্পষ্টই এ কংগ্রেসে বল্লেন, "খিলাফত কমিটি যখন অসহযোগ-প্রস্তাব করে ফেলেছে তখন আমরা কংগ্রেসও তাতে যোগদি।" তাঁর এই যুক্তির প্রতি লালা লাজপত রায় আদৌ শ্রদ্ধা দেখাতে পারলেন না। বিপিন চন্দ্র পাল বল্লেন, "খিলাফতই বল আর জালিওয়ানাবাগ বল কোনটাই স্থায়ী ব্যাপার নয়, সুতরাং এদের উপলক্ষ্য করে অসহযোগ-ভিত্তি কোনমতেই দৃঢ় হবেনা; আমরা স্বরাজ চাই, স্বরাজ না পেলে আমরা অসহযোগ করবো।" মহাত্মা-নির্দ্দিষ্ট অসহযোগে যে ক্রম-নির্দ্দেশ রয়েছে, যথা, উপাধি ত্যাগ বা ছাত্রদের স্কুল কলেজ ত্যাগে গভর্ণমেণ্টের কোন অসুবিধা হবে বলে লালা লাজপত রায় মনে করলেন না। লাজপত রায় মহাত্মার প্রস্তাবের বিরোধিতা না করে শুধু সমালোচনা করে সভ্যদের উপর বিচারের ভার ছেড়ে দেন। পিতৃদেব তাঁদের আপত্তির সারবত্তা বুঝতে পেরে বল্লেন, "পাঁচ বৎসর দেশকে প্রস্তুত করবার জন্য সময় দেওয়া হোক্, তার পর শুধু অসহযোগই নয়, টেক্স-দেওয়া বন্ধ করে আইন-অমান্য

পর্য্যন্ত করা হবে।" এই কথায় পিতৃদেবের বিরুদ্ধ-পক্ষ কেউ কেউ বলে উঠলেন, "উনি এখনি প্র্যাক্‌টিশ্‌ ছাড়তে প্রস্তুত নন।" মহাত্মা দৃঢ়কণ্ঠে বল্লেন "কংগ্রেস যদি অসহযোগ-প্রস্তাব গ্রহণ না করে, আমি কংগ্রেসের বাইরে গিয়ে অসহযোগ আন্দোলন করবো।" পরবর্ত্তী-কালে তিনি বহুবার কংগ্রেস-ছাড়াব কথা বলে, কংগ্রেসকে তাঁর মতে চল্‌তে বাধ্য করেছেন; ত্রিপুরী-কংগ্রেস তার জ্বলন্ত প্রমাণ। পিতৃদেব কিন্তু কংগ্রেসের বাইরে গিয়ে কাজ করবার কথা কখনো বলেন নি—কংগ্রেসের ভিতরে থেকেই তিনি স্বরাজ্য পার্টি গঠনকরে তাঁর মত-প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরবর্ত্তীকালে ত্রিপুরী কংগ্রেসে জয়ী হয়েও সুভাষচন্দ্রকে অবশ্য কংগ্রেস ছেড়ে বের হয়ে আসতে হয়েছিল, কিন্তু তা পিতৃদেবের মৃত্যুর পর।

মহাত্মা তাঁর নিজের কথার যুক্তি দেখিয়ে বল্লেন; "এখনই এর উপযুক্ত সময়, এ সময় নষ্ট করা উচিত হবে না।" কংগ্রেস কম্পিতকরেই তিনি বলে উঠলেন —"Had India sword to-day, India would have drawn it" মহাত্মা কতটা উত্তেজিত হয়েছিলেন তা এতেই বোঝা যায়।

দুইদিন-ব্যাপী বহু বিতর্কের পর মহাত্মার অসহযোগ-প্রস্তাব গৃহীত হলো।

এই কংগ্রেসের দেড়মাস পর ২০শে অক্টোবর আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র সিদ্ধার্থ জন্মগ্রহণ করে। কোর্টের ছুটি সত্ত্বেও বাবা এজন্যই তখনো কলিকাতা ছিলেন। তাঁর সে সময় ষ্টীমারে সুন্দরবন ভ্রমণে যাওয়ার বন্দোবস্ত হয়েছিল। যেদিন আমার পুত্র ভূমিষ্ঠ হয় সেদিনই সকাল সাতটায় তাঁর জাহাজ ছাড়ার কথা; আগের দিন সারারাত্রি বাবা আমার পাশের ঘরে উদ্বিগ্ন হয়ে বসেছিলেন; আমাকে

প্রফুল্ল করবার জন্য সে ঘর থেকেই উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠলেন "তোর ছেলে হলে কুড়ি হাজার টাকা ওকে দেব।" কিন্তু একথাতে তখন সান্ত্বনা পাবার অবস্থা আমার ছিলনা। ভোর চারটার সময় সিদ্ধার্থ জন্ম-মাত্র নবজাতকের কান্না শুনে বাবা অস্থির হয়ে গেলেন তাকে দেখতে। আমিও তখন সব কষ্ট ভুলে তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিলাম।

দৌহিত্র দেখে তৃপ্ত হয়ে পিতৃদেব, ভোম্বল, সুজাতা, বেবী ও ন'পিসিমাকে নিয়ে জাহাজঘাটে চলে গেলেন। তাঁর সঙ্গে ছিল হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার ফণীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ও পত্নী লীলাদি এবং ক্ষণিদি (ক্ষেমঙ্করী রায়)। আমার জন্যই মার যাওয়া হলো না।

একুশ দিন পরেই পিতৃদেব ফিরে এলেন। সে সময় সিদ্ধার্থকে রোজ কোলে নিয়ে কত আদরইনা করতেন! বারান্দায় ঠেলাগাড়ীতে তাকে শুইয়ে গাড়ী ঠেলে বেড়াতেন। কোলে নিয়ে বলতেন, 'কবে তুই বড় হয়ে আমার ঘড়ির চেন ধরে টান্‌বি রে?' বাবার কাণ্ড দেখে আমরা হেসে মরতাম।

১৯২০ সালে ডিসেম্বর মাসে বিজয় রাঘবাচারিয়ার সভাপতিত্বে নাগপুরে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। বেবী, সুজাতা, ভোম্বল এরা সকলে বাবার সঙ্গে নাগপুর চলে গেল। শিশু-পুত্রের জন্য আমি যেতে পারলাম না, মাকেও যেতে দিলাম না।

এই কংগ্রেসে সভাপতি বিজয় রাঘবাচারিয়াও মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগের প্রয়োগ সম্পূর্ণ সমর্থন করতে পারেননি। তিনি প্রশ্ন করলেন 'ছাত্রেরা বিদ্যালয় ও উকিলেরা আদালত ছাড়লে কি

ভারতবর্ষ বর্ব্বরতার পথে এসে দাঁড়াবে না? ঠিক বর্ব্বরতার পথে না এলেও জালিওনাবাগ ও খিলাফতের কোন প্রতিকার যে হবে না, এটা সুনিশ্চিত।' বেশ স্থির-সিদ্ধান্তেই একথা তিনি বল্লেন।

পিতৃদেব এই কংগ্রেসে যেন আরো রহস্যাবৃত হয়ে পরলেন। অনেকের ধারণা ছিল, মহাত্মার অসহযোগ-নীতিকে পরাজিত করবার জন্যই তিনি অনেক প্রতিনিধি নিয়ে এসেছেন। কিন্তু কংগ্রেসের মণ্ডপে যখন তিনি দাঁড়ালেন, সকলে বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে দেখলো যে অসহযোগের প্রস্তাব পিতৃদেব নিজেই উত্থাপন করছেন। ভিতরের খবর যারা জানে না তাঁরা এতে বিস্মিত হয়েছিলেন নিশ্চয়ই।

বস্তুতঃ কলিকাতার কংগ্রেসে সে সব আপত্তির জন্য পিতৃদেব মহাত্মাকে সমর্থন করেন নি, নাগপুরে সে সব আপত্তি অপসারণ করা হয়েছিল তাঁর সমর্থনের জন্য। তিনি বল্লেন, "স্বরাজ-লাভই মুখ্য উদ্দেশ্য, খিলাফৎ ও পাঞ্জাব গৌণ উদ্দেশ্য।" কলিকাতা কংগ্রেসে একথা মহাত্মা স্বীকার করে নেননি তাই পিতৃদেব এখানে স্পষ্টই বল্লেন "মহাত্মা একথা যদি স্বীকার করে নেন তবে আমি তাকে পূর্ণ সমর্থন করব।" মহাত্মা তখন তার একথায় সম্মত হয়ে মূল প্রস্তাবটি মুসাবিদার ভার পিতৃদেবের হাতেই ছেড়ে দেন। পিতৃদেব নিজের ইচ্ছানুযায়ী প্রস্তাবটি মুসাবিদা করে অসহযোগের প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। এতে কলিকাতা কংগ্রেস হতে পিতৃদেবের মত পরিবর্ত্তনের কোন প্রশ্নই উঠেনা; একথা যারা বলেন বা লেখেন তাঁরা ভুল করেন, বরং বলতে হয় প্রকৃতপক্ষে মহাত্মাই স্বমতের কিছুটা পরিবর্ত্তন করলেন। পিতৃদেবের এই প্রস্তাবে কাউন্সিল-বর্জ্জনের কথা একেবারেই ছিলনা। নাগপুর কংগ্রেসে

বিজয় রাঘবচারিয়ার সভাপতিত্বে পিতৃদেবের প্রস্তাব সম্পূর্ণ অনুমোদিত হলো।

প্রত্যেকটি কংগ্রেসের আন্দোলনের ঘাত-প্রতিঘাতে নেতৃগণ যেন উত্তাল তরঙ্গের মধ্যদিয়েই কংগ্রেস-তরণীকে পরিচালিত করছিলেন, তাতে কে কখন কর্ণধার হয়েছিল সুস্পষ্ট ভাবেই তা প্রতিফলিত হচ্ছিল। অনেকের মতে কলিকাতার চেয়ে নাগপুরের প্রস্তাব দুর্ব্বল! পিতৃদেব তাঁর বক্তৃতায় প্রমাণ করলেন যে নাগপুরের প্রস্তাব কলিকাতার চেয়ে দুর্ব্বল তো নয়ই বরং বেশী প্রবল।

সহযোগীতা বর্জ্জনই যে ভারতবাসীর গ্রহণীয় সে বিষয়ে মতভেদ না থাকলেও অসহযোগীতার উপায় নিয়ে কলিকাতায় মতভেদ ছিল। নাগপুরে সেই উপায় ভেদেরই সমাধান হলো। এখানে মহাত্মাকে স্বমতে এনে পিতৃদেব তাঁকে সমর্থন করলেন; কাউন্সিল প্রবেশ-বিষয়ে স্বীয় মত তিনি তিলমাত্রও পরিহার করেননি।

নাগপুরের এই অপূর্ব্ব সম্মিলন ভারতের রাজনৈতিক গগনে ধ্রুবতারার মতই দেশবাসীকে পথ দেখালো।

এই সময় সুভাষ চন্দ্র বসু লণ্ডনে আই, সি, এস পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হয়ে তাঁর ভ্রাতা শরৎ চন্দ্র বসুকে পত্রে জানালেন যে গোলামী করা তাঁর পোষাবে না এবং তিনি দেশে ফিরে পিতৃদেবের সঙ্গে কাজ করতে চান। শরৎ বাবু তাঁর বন্ধু আমার স্বামীর মাধ্যমে একথা পিতৃদেবকে জানালেন। সুভাষের এতবড় ত্যাগের সংকল্পে উল্লসিত হয়ে পিতৃদেব বল্লেন, "এমন সোনার-চাঁদ ছেলেই তো আমি আমার কাজের জন্য চাই।" সুভাষচন্দ্র ছাত্রজীবনে প্রথম একবার পিতৃদেবের সংস্পর্শে আসেন; তখন সুভাষচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র। রাত্রে একদিন আমরা খেতে বসেছি, এমন সময়

বাবার বেহারা এসে সুভাষের আগমন-সংবাদ তাকে জানালে, পিতৃদেব খাওয়া ফেলে উঠে গেলেন। খানিক বাদে ফিরে এসে বল্লেন, "আশ্চর্য্য তেজী ছেলে, তার কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মিঃ ওটেন ছাত্রদের সঙ্গে অশিষ্ট ব্যবহার করাতে সুভাষ তাকে ভাল ভাবেই শিক্ষা দিয়ে এসেছে, কিন্তু এর ফল কি হবে তাই ভাবছি।" ফল খুব ভালই হয়েছিল স্যার আশুতোষের বিচারে। প্রেসিডেন্সী থেকে বিতাড়িত হলেও ইউনিভারসিটি সুভাষ চন্দ্রকে বিতারিত করেনি। পরে স্কটীশচার্চ্চ কলেজ থেকে সম্মানের সঙ্গে বি, এ, পাশ করে তিনি পিতা জানকীনাথ বসু মহাশয়ের ইচ্ছানুসারে আই, সি, এস পড়তে লণ্ডনে যান। আই, সি, এস এ চতুর্থ স্থান অধিকার করে পরে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হতে মনোবিজ্ঞান ও নীতিবিজ্ঞানে ট্রাইপোজ সহ বি, এ পাশ করেন।

সুভাষ চন্দ্রের প্রতি স্যার আশুতোষের এই উদারতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলে মনে করি কেননা যদি সুভাষচন্দ্রের পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যেত, তবে পিতৃদেব হয়ত সুভাষচন্দ্রকে পেতেন না।

সুদূর সাগরপারে নাগপুর জাতীয় মহাসমিতির আহ্বান পৌছল সুভাষের কানে। ১৯২০ সালে তিনি আই, সি, এস এর পদ ত্যাগ করে ১৯২১ সালে ১৬ই জুলাই দেশে ফিরে এসেই পিতৃদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন।

অনেকেরই ধারণা সুভাষ চন্দ্র দেশে ফিরে এসেই মহাত্মাজীর সঙ্গে প্রথম দেখা করে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং মহাত্মাজী তাঁকে চিঠি দিয়ে পিতৃদেবের কাছে পাঠিয়ে দেন। কথাটি আংশিক ভাবে সত্য হলেও সবটা ঠিক নয়। এখানে সুভাষ চন্দ্রের "The Indian Struggle" থেকে তাঁরই কথা তুলে দিচ্ছি। তিনি লিখেছেন—

"I had passed the Indian Civil Service in England in 1920, but finding that it would be impossible to serve both masters at the same time—namely the British Government and my Country—I resigned my post in May 1921, and hurried back to India with a view to taking my place in the national struggle that was then in full swing. I reached Bombay on July 16th and the same afternoon I obtained an interview with Mahatma Gandhi. My object in seeking an interview with Mahatma Gandhi was to get from the leader of the campaign I was about to join, a clear conception of his plan of action. During the last few years I had made some study of the methods and tactics employed by revolutionary leaders in other parts of the world and in the light of that knowledge I wanted to understand the Mahatma's mind and purpose. * * * 'I desired to obtain a clear understanding of the details—the successive stages—of his plan, leading on step by step to ultimate seizure of power from the bureaucracy. To that end I began to heap question upon question and the Mahatma replied with his habitual patience. There were three points which needed elucidation. * * His reply to the first question satisfied me. ◦ ◦ ◦ The Mahatma's replies to the other two questions were not convincing. What his real expectation was, I was unable to understand. My Reason told me clearly again and again, that there was a deplorable lack of clarity in the plan which the Mahatma had formulated and that he himself did not have a clear idea of the successive stages of the compaign which would bring India to her chrished goal of freedom. ◦ ◦ ◦ Depressed and disappointed as I was what was I to do? The Mahatma advised me to report myself to Deshabandhu C. R. Das on

reaching Calcutta I had already written to the latter from Cambridge that I had resigned from the Indian civil service and had decided to join the political movement.

Reaching Calcutta I went straight to the house of Deshabandhu Das ० ० ० I can still picture before my mind's eye his massive figure as he approached me. He was not the same Mr Das whom I had onced approached for advice when he was one of the leaders of the Calcutta Bar and I a student expelled from the University for political reasons ० ० ० During the course of our conversation I began to feel that here was a man who knew what he was about—who could give all that he had and who could demand from others all they could give—a man to whom youthfulness was not a shortcoming but a virtue. By the time our conversation came to an end my mind was made up. I felt that I had found a leader and I meant to follow him."

সেই থেকে সুভাষ মাকে মাতৃ সম্বোধন করে আমাদের ভ্রাতৃস্থান অধিকার করলো এবং পিতৃদেবের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হয়ে দেশ-জননীর সেবায় তনুমন প্রাণ ঢেলে দিল।

কলিকাতা-কংগ্রেসে মহাত্মার সমর্থকেরা পিতৃদেব আইন ব্যবসায় ছাড়তে রাজী নন বলে সমালোচনা করেছিল। নাগপুর কংগ্রেস থেকে ফিরে তিনি একেবারেই আইন ব্যবসায় ত্যাগ করে দেশমাতৃকার সেবায় পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করলেন। দুবৎসর পূর্ব্বে ডুমরাওণ মোকর্দ্দমার সময় সেখানে একজন সন্ন্যাসী পিতৃদেবের হাত দেখে বলেছিলেন; "তুমি ভোগ-ঐশ্বর্য্য ভোগ বৎসরাধিককাল মধ্যেই পরিত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করবে।" সে কথা তখন আমরা কেউ

বিশ্বাস করিনি। কিন্তু সন্ন্যাসীর সে কথা মিথ্যা হলো না, বৎসরাধিককালের মধ্যেই ধনৈশ্বর্য্য-পরিবেষ্টিত পিতৃদেব ত্যাগী-সন্ন্যাসীর জীবনই বরণ করে নিলেন। লোকমান্যের আশার বাণীও সফল হলো। তিনি বলেছিলেন, "আমার আশা হয় এমন একদিন আসবে যেদিন দেশগৌরব-চিত্তরঞ্জন তাঁর সমস্ত শক্তি স্বদেশ সেবায় নিয়োজিত করবেন; এবং তাঁর স্বদেশ প্রীতি উজ্জ্বল-প্রদীপের মত ভারতবাসীকে পথ দেখিয়ে দিবে" লোকমান্যের অকাল-তিরোধানে সে প্রয়োজন বোধ হয় তাড়াতাড়িই অনুভূত হয়েছিল। লোকমান্য দেখে যেতে পারেননি তাঁর বাণীর সার্থকতা কিন্তু পিতৃদেব সেই আশার স্বপ্ন সফল করেই দেশের সেবায় নিজের সর্ব্বস্বই নিবেদন করলেন।

জাতীয় মহাসমিতির আহ্বানে এই ত্যাগের পথে এসে পিতৃদেবের আর কোন আক্ষেপই ছিলনা, শুধু একটি চিন্তায় তিনি কাতর হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর উপার্জ্জিত যে অর্থে তিনি দুঃখী, দরিদ্র, অনাথ আতুরের সেবা করবার সুযোগ পেতেন, সেই সুযোগ থেকে তিনি বঞ্চিত হলেন। এই ব্যথা এত তীব্র ভাবেই তিনি অনুভব করেছিলেন যে শেষে মনকে প্রবোধ দেবার জন্য করুণ ভাবেই তিনি বলেছিলেন, "আমি কি করব? আজ যে আমার আরো বড় কর্ত্তব্যের ডাক এসেছে। আমিতো অমর হয়ে আসিনি, যদি আজ আমি মরে যেতাম, তবে যাদের এতকাল আমি সেবা করেছি তাদের তখন যিনি দেখতেন এখনো তিনিই দেখবেন; এ পথে আমাকে যিনি ঠেলে দিয়েছেন, তাঁদের তিনিই রক্ষা করুন।"

*

মনে পড়ে সে দিনের কথা, যেদিন তিনি আমাকে ও ভোম্বলকে তাঁর আইন ব্যবসায়-ত্যাগের কথা বলে বল্লেন, "জানি! তোমাদের

অনেক কষ্ট সহ্য করতে হবে, কিন্তু কি করব ? আমি যে আর এর মধ্যে থাকতে পারছিনা !" মা তাঁকে উৎসাহ দিয়ে বল্লেন, "অর্থকে পৃথিবীর বড় সম্পদ বলে আমি মনে করিনা, তাতো তুমি জান ! তোমার এই সংকল্পে আমিও তোমার পাশেই রয়েছি। দৈহিক আরাম যদি তুমি ছেড়ে দিতে পার, তোমার স্ত্রী হয়ে কি আমি তা পারবোনা ?" ভোম্বল বল্ল, "বাবা, তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে তোমার কাজ কর—আমাদের জন্য কিছু ভেবনা, তোমার যা কিছু আছে সব দেশের জন্য ব্যয় কর ; আমরা যথেষ্ট বড় হয়েছি, বিলাসিতা করতে না পেলেও আমাদের কোন দুঃখ নেই—নিজেদের সংস্থান নিজেরাই করে নেব। আমাদের জন্য তুমি ভেবনা।" মা ও ভোম্বলের সহানুভূতি পেয়ে পিতৃদেব পরম শান্তি পেলেন সেদিন।

মাতৃভূমির সেবায় পিতৃদেবের এই মহান ত্যাগ সমগ্র ভারত বর্ষকে সেদিন স্তম্ভিত করেছিল। যারা বাংলার আদর্শ ও বৈশিষ্টের কথা জানে তারা পিতৃদেবের মধ্যে আবার প্রেমের অবতার শ্রীমন্ মহা-প্রভুকেই দর্শন করেছিলেন। বাঙ্গালী আবার ভাব-প্লাবনে ডুবে গেল।

দলে দলে ছাত্র-ছাত্রীরা কলেজ ছেড়ে রসারোডের বাড়ীতে সমবেত হতে লাগলো। তারা জাতীয় বিদ্যালয়ে বা দেশের বিভিন্ন কার্য্যে আত্মনিয়োগ করতে প্রস্তুত হলো। উকিল, ব্যারিষ্টার, গভর্ণমেন্টের চাকুরিয়াগণ অনেকেই নিজ নিজ ব্যবসায় পরিত্যাগ করে পিতৃদেবের পার্শ্বে সমবেত হলেন। মহাত্মা গান্ধীর যে বাণী ছাত্র-সমাজকে অনুপ্রাণিত করতে পারেনি, পিতৃদেবের ত্যাগের আদর্শে একযোগে তারা তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে নিজ নিজ শক্তি-অনুযায়ী সহযোগীতা-বর্জ্জনের দিকে এগিয়ে এল।

এই সময় পিতৃদেব একে একে তাঁর বিলাসিতা বর্জ্জন করতে আরম্ভ করলেন। যেদিন তিনি মোটা খাটো খদ্দরের ধুতিতে শোভিত হলেন,

সেদিন তাঁর দৈহিক কষ্টের কথা ভেবে প্রাণ কেঁদে উঠেছিল। এই পিতৃদেবই ৬০ ইঞ্চি বহরের ফরমাইসি ঢাকাই ধূতি ছাড়া অন্য কিছু পরতেন না, সে ধূতি কুঁচোবারই বা কত কায়দা ছিল। কোনদিন একটু মোটা কুঁচোনো হলে ভৃত্যবর্গের উপর বিরক্ত হতেন। খাটো ধূতি-পরা তিনি দেখতে পারতেন না, বলতেন "জুতোর ঠোক্করে ফুল ফুটবে তবেই না ধূতি।" সেই পিতৃদেব খদ্দরের ধূতি পরে কত গর্ব্বিতই না হয়েছিলেন! ফিন্‌ফিনে গিলে-করা তুষার-শুভ্র পাঞ্জাবীর জায়গায় শোভা পেল মোটা খদ্দরের ফতুয়া! এসব পরে পিতৃদেবের কষ্ট হয়েছিল কিনা জানতে পারিনি কোনদিন, কিন্তু তাঁর বেশের এ পরিবর্ত্তনে আমাদের খুবই কষ্ট হয়েছিল প্রথমে। মার জন্যও কম কষ্ট হয়নি সেদিন। মিলের কাপড়ই যাঁর মোটা বলে অঙ্গে উঠেনি কোনদিন, ঢাকাই শাড়ীর মোটা পাড় পর্য্যন্ত যিনি সহ্য করতে পারতেন না, মিহি শান্তিপুরী শাড়ী যিনি সদাসর্ব্বদা পরতেন, তাঁর অঙ্গে উঠলো মাঝখানে-জোড়া-বহর-দেওয়া বাড়ান মোটা বিছানার চাদরের মত খদ্দরের শাড়ী, লাল ও কালো পাড় ছাপান। মাকে দেখেও মনে হলোনা যে কোন কষ্ট তাঁর হয়েছে। প্রথমবারে খদ্দর একেবারেই সুখদায়ক ছিল না, পরে অবশ্য আমরা খুবই ভাল খদ্দর পেতাম; কিন্তু পিতৃদেব ও মাকে কোনদিন মিহি খদ্দর পরতে দেখিনি।

এসময় চরকায় আমরা প্রত্যহ সূতা কাটতাম। পিতৃদেব কিন্তু এ ব্যাপারটি একেবারেই পারতেন না—তোড়-জোড় করে বসেছিলেন একদিন মহাত্মাজীর সঙ্গে—কিন্তু তাঁর পাঁজের তুলো সবই জড়াতে লাগল চরকার সূঁচের মুখে। সূতো এক টুকরোও বের হলো না। মহাত্মা হেসে বল্লেন "এ কাজে তুমি একেবারেই অযোগ্য।" পিতৃদেবও হেসে তাঁর এই প্রথম পরাজয় স্বীকার করলেন।

বরিশাল প্রাদেশিক সম্মিলন
ও
আমেদাবাদ কংগ্রেস

এ বৎসরেই ১৫ই এপ্রিল বিপিন চন্দ্র পালের সভাপতিত্বে বরিশালে প্রাদেশিক সম্মিলন হয়। সুজাতাকে ফেলে মা, পিতৃদেবের সঙ্গে বরিশাল যেতে পারেননি। বরিশাল যাবার ছয় সাত দিন পরেই ১৯২১ সালে ২০ শে এপ্রিল সুজাতার কন্যা অদিতি তার মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করে।

পিতৃদেব নানাস্থানে ঘুরে অসহযোগনীতি প্রচার করতে করতে বরিশালে এলেন। এই সম্মিলনীর সভাপতি বিপিন চন্দ্র পালের নিকট তিনি আশার বাণীই শুনবেন মনে করেছিলেন। কিন্তু তাঁকে নিরাশ করে বিপিন বাবু স্বরাজের ব্যাখ্যা নিয়ে তুমুল তর্ক তুলে বল্লেন, "স্বরাজ কথাটির পূর্ব্বে ডেমোক্রেটিক (Democratic) কথাটি জুড়ে দিতে হবে।" পিতৃদেব বল্লেন, "স্বরাজ অর্থ আমাদের জাতীয় জীবনের সমস্ত দিকে পরিপূর্ণতা লাভ" (Fulfilment of the life of our nation)। বিপিন চন্দ্র এতে সন্তুষ্ট হতে পারলেন না এবং মহাত্মার প্রতি কটাক্ষ করে বল্লেন, "আপনারা চান ম্যাজিক কিন্তু আমি দিচ্ছি লজিক্।" তাঁর মতে শেষ-অবস্থায় সহযোগীতা ব্যতীত গত্যন্তরই নাই। পিতৃদেব বিপিন বাবুর উক্তির উপযুক্ত-উত্তর তখনই প্রদান করেন। তাতে বিপিন বাবু উত্তেজিত হয়ে বল্লেন, "ধর্ম্ম সম্বন্ধে যেমন কোন গুরুর আধিপত্য আমি কখনো স্বীকার করিনি, তেমনি রাজনীতি-ক্ষেত্রেও গুরুবাদ আমি মানব না। যাঁরা আমার নিকট তা প্রত্যাশা করেন তাঁদের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হওয়া ভিন্ন আর উপায় কি?

খুবই দুঃখের কথা যে নাগপুরে বিপিন বাবু বাবাকে সমর্থন করেও, বরিশালে তাঁকে পরিত্যাগ করেন। রাজনীতি-ক্ষেত্রে আর তাঁরা দুজনে একত্রে কাজ করেননি।

বিপিন বাবু সুবক্তা, চিন্তাশীল ও একরোখা রাজনৈতিক নেতা ছিলেন। রাজনীতিক্ষেত্রে পিতৃদেব ও মহাত্মার সঙ্গে তাঁর মতবাদের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও নিজ বৈশিষ্টে তিনি উজ্জ্বল ছিলেন।

বরিশাল কনফারেন্সের পর পিতৃদেব কলিকাতা এসে পৌত্রী অদিতিকে দেখে আনন্দে আত্মহারা হলেন। অদিতি ঘোর শ্যাম-বর্ণেরই ছিল জন্মের পর। পিতৃদেব আদর করে বুকে তুলে নিয়ে বল্লেন "ও হোল আমাদের কালিন্দী;" অদিতি কিন্তু পিতৃদেবের এই নাম ব্যর্থ করে দিন দিন স্নিগ্ধ রঙ্ই পেতে লাগলো। এখন তাকে দেখলে কেউ বিশ্বাসও করবেনা যে তার রঙ্ দেখেই তার দাদু স্নেহভরে তাকে 'কালিন্দী' বলেছিলেন একদিন।

কলিকাতায় কিছুদিন থেকে পিতৃদেব মা ও বেবীকে নিয়ে কংগ্রেসের নীতি ও বাণী প্রচার-কল্পে বাংলা পরিভ্রমণে বের হলেন। সুপ্রভা দেবী, সত্যেন্দ্র চন্দ্র মিত্রও তাদের সঙ্গে ছিলেন।

পিতৃদেব বগুরা, মালদহ রাজসাহী, জলপাইগুড়ি পরিভ্রমণ করে সিরাজগঞ্জ হয়ে পাবনা যাবার যখন সংকল্প করেছিলেন তখন অখিল চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের 'তার' বার্ত্তাতে চাঁদপুরের কুলী-ধর্ম্মঘটের সংবাদ পেয়ে বাবা পোড়াদহ হয়ে গোয়ালনন্দে গেলেন। সেখানে এসে তিনি দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের প্রেরিত বিবরণে জানতে পারলেন যে শ্রীহট্টের ও হবিগঞ্জের চা-কর শেতাঙ্গদের অনাচার ও অত্যাচারের কবল থেকে মুক্তি-লাভের জন্য চা বাগানের শ্রমিকগণ ধর্ম্মঘট করে দলে দলে চাঁদপুর চলে এসেছে। তাদের উপর সৈন্যদ্বারা বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের অকথ্য অত্যাচারের প্রতিবাদে

রেল ও জাহাজের শ্রমিকেরাও ধর্ম্মঘট করেছে। শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত তাই পিতৃদেবকে অবিলম্বে চাঁদপুরে যাবার জন্য অনুরোধ জানালেন।

সবচেয়ে দুঃখ ও লজ্জার কথা যে চাঁদপুর যখন এই অসহায় শ্রমিকদের রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল, তখন সেখানকার ম্যাজিষ্ট্রেট ও কমিশনার দুজনেই ছিলেন বাঙালী।

দেশপ্রিয়ের প্রেরিত অত্যাচার-কাহিনী পাঠ করে পিতৃদেব তখনই চাঁদপুর যাবার সঙ্কল্প করলেন। জাহাজের শ্রমিকেরা চা-শ্রমিকদের উপর সহানুভূতি প্রদর্শন করে ধর্ম্মঘট করাতে ষ্টীমার-চলাচল তখন বন্ধ ছিল। চাদপুর যেতে হলে তাই একমাত্র জেলেডিঙ্গী ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। পিতৃদেব তাতে যাওয়াই স্থির করলেন। ঝড়-বৃষ্টির সময় তখন পদ্মা ও কীর্ত্তি-নাশা সে সময় রুদ্র-মূর্ত্তি ধারণ করে তাণ্ডব-নৃত্যে উন্মত্তা হয়ে রোষগর্জ্জনে যেন সংহারের জন্যই উদ্দাম হয়ে উঠেছে। এই নদীতে ক্ষুদ্র জেলেডিঙ্গীতে যাওয়া মানেই মৃত্যুকে বরণ করা! কিন্তু পিতৃদেবের প্রাণে তখন অসহায় শ্রমিকদের করুণ মুখচ্ছবি দৃঢ়ভাবেই অঙ্কিত। নিজের প্রাণের জন্য তাদের বিপদ তুচ্ছ মনে করবার লোক তিনি ছিলেন না। তাই সকলের সতর্কবাণী উপেক্ষা করে 'আমি কোন বাধা মানিনা' বলেই ৫ই জুন ভৈরব-গর্জ্জনা নদীতে পাড়ি দেবার জন্য তিনি প্রস্তুত হলেন। বেবীর শরীর সুস্থ না থাকাতে তার আপত্তি সত্ত্বেও তাকে কলিকাতা পাঠিয়ে দেওয়া হলো। সুপ্রভা, মা ও পিতৃদেবকে ছেড়ে কিছুতেই আসতে রাজী হলো না। তাঁর স্বাস্থ্যও এত ভাল ছিল যে তাঁকে সঙ্গে না নেবার কোন কারণই তাঁকে দেখানো গেল না। আর সত্যেনবাবুতো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড উল্টে গেলেও পিতৃদেব ও মাকে এই বিপদের দিনে ছেড়ে আসতে রাজী হলেননা একেবারেই। তাই মা বাবা কিছুতেই এদের এড়াতে না

পেরে তাদের নিয়েই ক্ষুদ্র ডিঙ্গীতে সেই উন্মত্তা পদ্মা পাড়ি দিলেন। মার কাছে জেলে ডিঙ্গীতে পদ্মা পাড়ি দেবার কাহিনী শুনে আমরা ভয়ে কণ্টকিত হয়েছিলাম। মা বল্লেন, 'মিলি (সুপ্রভা) আমাদের অন্যমনস্ক ও প্রফুল্ল রাখবার জন্য নানারকম কৌতুক, ন্যাকা-আবৃত্তি করতে করতে চলেছিল। সন্ধ্যের দিকে ঝড় প্রবল আকার ধারণ করলে মাঝিরা বলে উঠলো, 'কর্ত্তা! সামাল, সামাল! আপনাদের বুঝি আর পৌঁছাতে পারলাম না।' ক্ষুদ্র ডিঙ্গীখানি মোচার খোলার মতই অসহায় ভাবে নিজেকে যেন ছেড়ে দিল ঐ দুর্ব্বার জল-স্রোতের মধ্যে! ভগবান ভক্তকে যুগে যুগে রক্ষা করে এসেছেন, তাই নৌকার গতি-মুখ ঘুরে গেল চরের দিকে। সত্যেন-বাবু চরে লাফিয়ে পড়ে প্রাণপণ শক্তিতে মাঝিদের সঙ্গে ডিঙ্গীখানি টেনে তীরে তুললেন, সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বারিপাত আরম্ভ হলো; মা বলতেন- 'সে কি বৃষ্টি! বৃষ্টির ফোঁটা নয়তো মনে হচ্ছিল যেন বড় বড় পাথরই পরছে।' সত্যেনবাবু পিতৃদেবের আর মিলি মার হাত ধরে টেনে নিয়ে দৌড়তে আরম্ভ করে দিল, সেই বালির চরের উপর কাঁটা-ঘাসের মধ্য দিয়ে। একদিকে উন্মত্তা পদ্মার উত্তাল নৃত্য, আর তার সঙ্গে প্রবল বৃষ্টি ও বজ্রপাত। মা বলতেন 'সে বর্ণনা করবার শক্তি আমার নেই; শুধু মনে হচ্ছিল এই কি প্রলয়? দিশাহারা হয়ে আমরা ছুটে চলেছি, আর তোদের বাবা বলছেন, ভগবান আছেন, না হলে নৌকার মুখ ঘুরিয়ে দিল কে? এমন সময় দূরে একটি আলো দেখতে পেলাম, তোদের বাবার কথাই সত্যি হলো—ভগবানই যেন আলো দেখিয়ে আমাদের পথের সন্ধান দিলেন! আলো লক্ষ্য করে কতক্ষণ ছুটেছিলাম জানি না, হঠাৎ দেখি একটি পাতার কুটিরের সাম্নে এসে পরেছি। আমাদের আর্ত্ত স্বরে ঝাঁপ খুলে বের হয়ে এল এক

বৃদ্ধ। পরম-আত্মীয়ের মতই সে সাদর-আহ্বান জানিয়ে অনুরোধ করলো রাত্রিটুকু অন্ততঃ তার দীন কুটীরে কাটিয়ে যাবার জন্য। আমাদের ভিজে কাপড়ের জল তার মেঝে প্লাবিত করে দিল। সত্যেন কিন্তু এত দুর্যোগেও তোদের বাবার স্যুটকেশ আনতে ভোলেনি! কোনরকমে গা মাথা মুছে আমরা ক্লান্ত হয়েই বসে পড়লাম। আমরা কিন্তু তখনো বুঝিনি যে আমাদের আশ্রয়দাতা একজন সাপুড়ে। শ্রান্ত হয়ে বসে যখন একটু বিশ্রাম করছি তখন আমাদের দৃষ্টি পড়লো সাপুড়েদের ঝাঁপির মত কয়েকটি ঝাঁপির উপর; দেখেই তো ভয়ে আমি সাড়া হয়ে গেলাম, ভাবলাম, ঝড়ের থেকে এলাম কি তবে সাপের মুখে যাবার জন্য? সাপুড়ে আমাকে ঝাঁপির দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে বল্ল 'ভয় পাবেন না মাঠাকরুন! ওরা কিছু বলবে না, দেখবেন ওদের?' বলেই ঝাঁপির মুখ খুলতেই ভীষণ আকারের সাপ ফণা ধরে দাঁড়িয়ে উঠল। তাই দেখে তাড়াতাড়ি বল্লাম, 'না বাবা ওদের আর বার করো না।' বাইরে প্রকৃতির তাণ্ডবলীলা চলছে, ক্ষুদ্র পাতার ছাউনি দেওয়া কুটীরকে বাঁশের ঠেকো যেন আর ধরে রাখতে পারছে না। সত্যেন দুই হাত দিয়ে আমাদের মাথার উপর ছাউনিকে ধরে রাখবার চেষ্টা করছিল। সেদিন বুঝলাম যে ওর গায়ে কত জোর! এই অবস্থায় বাইরে ঝড় আর ভিতরে সাপ নিয়ে আমরা অনেকক্ষণ বসে রইলাম। তোদের বাবা কিন্তু বাঁশের কুটিরে ঠেসান দিয়ে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পরলেন।'

ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই ঝড় থেমে গেল। পদ্মা যেন চিত্তের দৃঢ়তা দেখেই পরাজয় স্বীকার করল সেদিন। মাঝিরা তাদের নৌকা খুঁজে যাত্রা করবার জন্য প্রস্তুত হলো। বৃদ্ধ সাপুড়ে নৌকা পর্য্যন্ত

এসে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল। বিদায় নেবার সময় পিতৃদেব ও মাকে প্রণাম করে সজল-চোখে বলেছিলেন "আজ আমার জন্ম সার্থক! বাবা, মা, ভাই, বোনের সঙ্গে আমার সেবা গ্রহণ করেছেন।" মাকে লক্ষ্য করে বল্লেন "মা ঠারান! আবার আইস।" বৃদ্ধ চলে গেলে মা বল্লেন, "তার দিকে তাকিয়ে সজল-চোখে তোদের বাবা বল্লেন, "এই আমার দেশের লোক! আমার দেশের মাটির খাঁটি-লোক এ;" বৃদ্ধের অতিথি-পরায়ণতার কথা পিতৃদেব আমাদের কাছে কতবার বলতেন। বলতেন, "আমরা তথাকথিত-শিক্ষিতেরা এদেরই বলি অশিক্ষিত! এমন প্রাণ দিয়ে অতিথিকে নারায়ণ জ্ঞানে সেবা আমরা করতে পারি? অশিক্ষিত হয়ে এমন প্রাণ-ধর্ম্মের অধিকারী হতে পারলে, চাইনা আমি শিক্ষিত হতে; জন্মে জন্মে যেন এর মতই অশিক্ষিত থাকি। আমাদের দেশের আদর্শ তো এরাই বাঁচিয়ে রেখেছে!"

পিতৃদেব ও মায়ের জীবন তুচ্ছ করে এই যাত্রার কাহিনীতে আমরা বিস্মিত হয়েছিলাম সন্দেহ নেই; সংসারের সব সুখ-ভোগ করে পরিণত বয়সে নিজ প্রাণ তুচ্ছ করা তবুও হয়তো সম্ভব, কিন্তু দেশপ্রেমের যে দুর্ব্বার আকর্ষণে যুবক সত্যেন্দ্র ও তরুণী সুপ্রভা সেদিন আত্মত্যাগেও কুণ্ঠিত হয়নি, তাদের সেই দেশপ্রীতিকে বারবার নমস্কার করি। তারা সেদিন সঙ্গে না থাকলে পিতৃদেব ও মাকে আমরা ফিরে পেতাম কিনা সন্দেহ।

এর পর চাঁদপুর পৌছাতে তাঁদের তিন দিন লেগেছিল। পরের দিনও পুনরায় ঝড়ের মুখে পড়ায় তাঁদের আশ্রয় নিতে হয়েছিল নদীর তীরবর্ত্তী এক গৃহস্থের বাড়ী। পল্লীর এই গৃহস্থের অতিথি-পরায়ণতার কথা মার মুখে শুনে আমরা আশ্চর্য্য হয়েছিলাম। মা বলতেন "ঝড়-জলে যখন বিপন্ন হয়ে আমরা কোনরকমে নৌকা

বৃদ্ধ। পরম-আত্মীয়ের মতই সে সাদর-আহ্বান জানিয়ে অনুরোধ করলো রাত্রিটুকু অন্ততঃ তার দীন-কুটীরে কাটিয়ে যাবার জন্য। আমাদের ভিজে কাপড়ের জল তার মেঝে প্লাবিত করে দিল। সত্যেন কিন্তু এত দুর্যোগেও তোদের বাবার সুটকেশ আনতে ভোলেনি! কোনরকমে গা মাথা মুছে আমরা ক্লান্ত হয়েই বসে পড়লাম। আমরা কিন্তু তখনো বুঝিনি যে আমাদের আশ্রয়দাতা একজন সাপুড়ে। শ্রান্ত হয়ে বসে যখন একটু বিশ্রাম করছি তখন আমাদের দৃষ্টি পড়লো সাপুড়েদের ঝাঁপির মত কয়েকটি ঝাপির উপর; দেখেই তো ভয়ে আমি সাড়া হয়ে গেলাম, ভাবলাম, ঝড়ের থেকে বাঁচলাম কি তবে সাপের মুখে যাবার জন্য? সাপুড়ে আমাকে ঝাঁপির দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে বল্ল 'ভয় পাবেন না মাঠারান! ওরা কিছু বলবে না, দেখবেন ওদের?' বলেই ঝাঁপির মুখ খুলতেই ভীষণ আকারের সাপ ফণা ধরে দাঁড়িয়ে উঠল। তাই দেখে তাড়াতাড়ি বল্লাম, 'না বাবা ওদের আর বার করো না।' বাইরে প্রকৃতির তাণ্ডবলীলা চলছে, ক্ষুদ্র পাতার ছাউনি-দেওয়া কুটীরকে বাঁশের ঠেকো যেন আর ধরে রাখতে পারছে না। সত্যেন দুই হাত দিয়ে আমাদের মাথার উপর ছাউনিকে ধরে রাখবার চেষ্টা করছিল। সেদিন বুঝলাম যে ওর গায়ে কত জোর! এই অবস্থায় বাইরে ঝড় আর ভিতরে সাপ নিয়ে আমরা অনেকক্ষণ বসে রইলাম। তোদের বাবা কিন্তু বাঁশের কুটিরে ঠেসান দিয়ে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পরলেন।'

ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই ঝড় থেমে গেল। পদ্মা যেন চিত্তের দৃঢ়তা দেখেই পরাজয় স্বীকার করল সেদিন। মাঝিরা তাদের নৌকা খুঁজে যাত্রা করবার জন্য প্রস্তুত হলো। বৃদ্ধ সাপুড়ে নৌকা পর্য্যন্ত

এসে পৌছে দিয়ে গিয়েছিল। বিদায় নেবার সময় পিতৃদেব ও মাকে প্রণাম করে সজল-চোখে বলেছিলেন "আজ আমার জন্ম সার্থক! বাবা, মা, ভাই, বোনের সঙ্গে আমার সেবা গ্রহণ করেছেন।" মাকে লক্ষ্য করে বল্লেন "মা ঠারান! আবার আইস।" বৃদ্ধ চলে গেলে মা বল্লেন, "তার দিকে তাকিয়ে সজল-চোখে তোদের বাবা বল্লেন, "এই আমার দেশের লোক! আমার দেশের মাটির খাঁটি-লোক এ;" বৃদ্ধের অতিথি-পরায়ণতার কথা পিতৃদেব আমাদের কাছে কতবার বলতেন। বলতেন, "আমরা তথাকথিত-শিক্ষিতেরা এদেরই বলি অশিক্ষিত! এমন প্রাণ দিয়ে অতিথিকে নারায়ণ-জ্ঞানে সেবা আমরা করতে পারি? অশিক্ষিত হয়ে এমন প্রাণ-ধর্ম্মের অধিকারী হতে পারলে, চাইনা আমি শিক্ষিত হতে; জন্মে জন্মে যেন এর মতই অশিক্ষিত থাকি। আমাদের দেশের আদর্শ তো এরাই বাঁচিয়ে রেখেছে!"

পিতৃদেব ও মায়ের জীবন তুচ্ছ করে এই যাত্রার কাহিনীতে আমরা বিস্মিত হয়েছিলাম সন্দেহ নেই; সংসারের সব সুখ-ভোগ করে পরিণত বয়সে নিজ প্রাণ তুচ্ছ করা তবুও হয়তো সম্ভব, কিন্তু দেশপ্রেমের যে দুর্ব্বার আকর্ষণে যুবক সত্যেন্দ্র ও তরুণী সুপ্রভা সেদিন আত্মত্যাগেও কুণ্ঠিত হয়নি, তাদের সেই দেশপ্রীতিকে বারবার নমস্কার করি। তারা সেদিন সঙ্গে না থাকলে পিতৃদেব ও মাকে আমরা ফিরে পেতাম কিনা সন্দেহ।

এর পর চাঁদপুর পৌছাতে তাঁদের তিন দিন লেগেছিল। পরের দিনও পুনরায় ঝড়ের মুখে পড়ায় তাঁদের আশ্রয় নিতে হয়েছিল নদীর তীরবর্ত্তী এক গৃহস্থের বাড়ী। পল্লীর এই গৃহস্থের অতিথি-পরায়ণতার কথা মার মুখে শুনে আমরা আশ্চর্য্য হয়েছিলাম। মা বলতেন "ঝড়-জলে যখন বিপন্ন হয়ে আমরা কোনরকমে নৌকা

থেকে তীরে উঠলাম, তখন ভাবিনি একবারও যে এমন আশ্রয়-স্থান আমরা পাব। ভিজে কাপড়ে আশ্রয়ের আশায় ছুটতে ছুটতে আমরা এই গৃহস্থবাড়ীর সামনে এসে পড়লাম। অনেকক্ষণ সত্যেন ডাকা ডাকি করল, "কে আছেন আমাদের একটু আশ্রয় দিন।" এমন সময় বাড়ীর ভেতর থেকে একজন অল্পবয়স্কা বধূ ছোট একটি ছেলেকে নিয়ে এসে আমাদের বাড়ীর মধ্যে যেতে আহ্বান করল। বাড়ীতে তখন ছেলেটি ছাড়া আর দ্বিতীয় পুরুষ-মানুষ কেউ ছিলনা। তোদের বাবা ও সত্যেন প্রথম বাইরের ঘরেই দাঁড়িয়ে ছিলেন তখন মেয়েটি বল্লে "বাবা আপনারাও ভেতরে আসুন।" ঘরের ভিতর গিয়ে মেয়েটি অতি সঙ্কোচের সঙ্গে বল্ল "আমাদের কাপড় পড়তে যদি আপত্তি না থাকে তবে শুকনো কাপড় এনেদি?" মা বলতেন, মেয়েটির এমন আপন-করা-স্বভাব-গুণে তারা আর কোন আপত্তি করতে পারেন নি। তার-দেওয়া শাড়ী ধুতি পরে মা ওঁরা বিশ্রাম করতে লাগলেন। সেই বধুটি ইতিমধ্যে মা ওঁদের সকলের ছাড়া-কাপড় নিয়ে উনুনের ধারে সেঁকে পরিপাটি করে ভাজ করে রাখল। তার পর মোটা চালের ভাত, বাড়ীর ঘি, মুগের. ডাল আর পটল ভাজা করে মা ওঁদের অতি যত্নের সঙ্গে খাওয়াল। বাবা কতবার আমাদের বলেছেন, "এমন তৃপ্তি নিয়ে কখনো খান নি"। কত গর্ব্ব করে বলতেন "এমন ভাবে অতিথি-সেবা আমার দেশেই সম্ভব।" এই নিরক্ষর পল্লী-বধূ সেদিন লোক চিনে অতিথির সমাদর করেনি—আজও হয়তো সে জানে না তার অতিথির নাম—নারায়ণ-জ্ঞানে অতিথি-সেবা আমাদের দেশের ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মই সেদিন পালিত হয়েছিল এই গৃহস্থের কুটিরে। মা বলতেন "গভীর রাত্রে ঝড় থামলে আমরা সুপ্তিমগ্ন এ গৃহস্থ-বধুর উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে নৌকাতে এসে উঠলাম।"

চাঁদপুরের নিকটবর্ত্তী হলে পিতৃদেবের নৌকা দেখে উৎকণ্ঠিত-

জনতা তুমুল জয়ধ্বনি করে তাঁদের অভ্যর্থনা জানালো। শ্রমিকেরা সেদিন শুধুই তাদের প্রিয়নেতা সস্ত্রীক দেশবন্ধুকেই পেলনা, তাঁদের সঙ্গে তারা দেখতে পেল তাদের ব্যথার সমব্যথী বাঙ্গলা দেশের আরো দুজন আত্মত্যাগী তরুণ ও তরুণী দেশকর্ম্মীদের। এই সুপ্রভাদেবীই এখন চিত্রজগতে খ্যাতি অর্জ্জন করেছে।

পিতৃদেব চাঁদপুরে সব দেখে শুনে ধর্ম্মঘটকারীদের পক্ষ অবলম্বন করলেন। 'তিলক-স্বরাজ-ভাণ্ডার' থেকে দেড়লক্ষ টাকা তাদের সাহায্যের জন্য দিলেন। এর জন্য পরে তাঁকে কৈফিয়ৎ কম দিতে হয়নি। আর আজ কিন্তু দেখি জনগণের অর্থ যদৃচ্ছ-ব্যয় করেও কৈফিয়ৎ দেবার কোন বালাই নেই।

ধর্ম্মঘটকারীদের পিতৃদেব বলেছিলেন "যতদিন তোমরা সম্মান সূচক সর্ত্ত পাবে, ততদিন কেউ কাজে যোগ দিও না। মাথায় মুট বয়েও যদি তোমাদের খরচ চালাতে হয় তাহলে আমরা তা করতেও কুণ্ঠিত হব না।" দেশের এইসব অতি-প্রয়োজনীয় কাজের জন্যই তিনি তিলক-স্বরাজ-ভাণ্ডারে অর্থ-সংগ্রহ করতে প্রাণপাত পরিশ্রম করেছিলেন। বাংলার অংশের দেয়-অর্থ তিনি সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন।

বেজওয়াদায় অল্ ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি নির্দ্দেশ দিয়েছিল যে সমগ্র ভারতে ৩০শে জুনের মধ্যেই এককোটী টাকা তুলতে হবে, এককোটী সভ্য শ্রেণীভুক্ত করতে হবে, এবং ত্রিশ লক্ষ চরকা সংগ্রহ করতে হবে। সকল প্রদেশকেই তাদের দেয়-টাকার ও কাজের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল।

এরপর ৮ই জুলাই যখন মহাত্মা ঘোষণা করলেন যে ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে বিদেশী বস্ত্র সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করতে হবে,

তখন বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের দলন-নীতি আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। এসময়ে চট্টগ্রামে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও গোয়ালনন্দে বসন্ত মজুমদার গ্রেপ্তার হলেন। এতে জনসঙ্ঘ অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠাতে, কংগ্রেসের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও পিতৃদেব তাঁদের জামীনে মুক্তি নিতে বলেন। এ সময় কংগ্রেসের গোঁড়াপন্থীরা ঘোর প্রতিবাদ করে পিতৃদেবের কাজে অসন্তোষ প্রকাশ করতে দ্বিধা করেনি। ১২ই ও ১৩ই জুলাই (১৯২১ সাল) ওয়েলিংটন স্কোয়ারের বাড়ীতে নবগঠিত কংগ্রেস কমিটির প্রথম অধিবেশনে ধর্ম্মঘট, জামীন, ফণ্ড ও ভোট-প্রণালী নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হয়। পিতৃদেব যখন বল্লেন যে অসহযোগ-আন্দোলনকে অহিংস রাখবার জন্যই তাঁকে জামীনের বন্দোবস্ত করতে হয়েছিল, তখন সকলেই তাঁর এই কার্য্য-প্রণালী সমর্থন করলেন। পিতৃদেব সম্পূর্ণরূপে কৈফিয়ৎ দেবার পর যখন সভাপতিত্বের জন্য তাঁর নাম প্রস্তাব করা হয় তখন তিনি ঐ পদ গ্রহণ করতে অস্বীকার করে বল্লেন 'যথেষ্ঠ নোংরা ঘেটেছি, আর তা ঘাটতে আমি চাইনা; এর চেয়ে সব ছেড়ে আমি আজীবন অস্পৃশ্যদের মধ্যে গিয়ে কাজ করবো।' যাই হোক, অনেক বাদ-প্রতিবাদের পর স্থির হলো পিতৃদেবই সভাপতি হবেন এবং তিনি ষাট জন সভ্য মনোনীত করে কাউন্সিল গঠন করবেন। বীরেন্দ্রনাথ শাসমল এর সম্পাদক নির্ব্বাচিত হলেন। তাঁর কর্ম্ম-শক্তির উপর পিতৃদেবের অশেষ নির্ভরতা ছিল। সাতকড়িপতি রায় এ সময় আইন ব্যবসায় ত্যাগ করে দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন।

যুবরাজের ভারতে আগমন-কাল নিকটবর্ত্তী হয়ে আসলে সমগ্র ভারত-ব্যাপী তাঁর আগমন-উপলক্ষে সমস্ত অনুষ্ঠান-বর্জ্জন করবার জন্য তুমুল আন্দোলনের সাড়া পড়ে গেল।

কলিকাতায় লর্ড রোণাল্ডসের সভাপতিত্বে যুবরাজের অভ্যর্থনার ব্যবস্থা স্থির করবার জন্য যে সভা হয়, অসহযোগীদের চেষ্টায় সে সভা ভেঙ্গে যায় এবং এই ২৪শে আগষ্ট কলিকাতায় এক বিরাট সভায় পিতৃদেব যুবরাজের অভ্যর্থনার বিরুদ্ধে তীব্র বক্তৃতা করেন। তিনি বল্লেন, 'সম্রাটই হউন বা তাঁহার যোগ্যপুত্র যুবরাজই হউন, যিনি এই বুরোক্রেসির শক্তি-বৃদ্ধির অভিপ্রায়ে এখানে আসিবেন, আমরা তাহাকে অভ্যর্থনা করিতে পারিনা······আমরা নিজবাসভূমে পরবাসী, দাস, দাসেরও অধম, ঘৃণিত, লাঞ্ছিত, হেয় জাতি। পারিনা আমরা কিছুতেই যুবরাজের অভ্যর্থনার কোন অংশে যোগদান করিতে।' এই সভায় শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী ও মৌলানা আক্রাম খাঁ পিতৃদেবকে এ বিষয়ে মুক্ত-কণ্ঠে সমর্থন করেছিলেন।

যুবরাজের আসন্ন-আগমন-বয়কট-কল্পে কলিকাতায় ১৭ই নভেম্বর খিলাফত কমিটির পূর্ণ সহযোগীতায় পিতৃদেব এই আন্দোলনকে অসামান্য সাফল্য-মণ্ডিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এমন কি কলিকাতার এই বয়কট-অনুষ্ঠান দেখে তখনকার ষ্টেটস্‌ম্যান্ ও ইংলিশম্যান ভীতগ্রস্থ হয়ে তার পরদিন তাদের কাগজে লিখেছিল, কলিকাতায় কংগ্রেস-ভলাণ্টিয়ার-রাজ চলছে এবং এই মুহূর্ত্তে তাদের সঙ্ঘকে বেআইনী বলে গভর্ণমেণ্টের ঘোষণা করা একান্ত কর্ত্তব্য। এর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কংগ্রেস-ভলাণ্টিয়ার-সংঙ্ঘ বেআইনী বলে ঘোষিত হলো এবং বাংলা গভর্ণমেণ্টের এই ঘোষণা অন্যান্য প্রদেশের গভর্ণমেণ্ট সমর্থন করলো। গভর্ণমেণ্টের এই ঘোষণায় সুভাষচন্দ্র প্রমুখ কর্ম্মীবৃন্দ এর বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে চাইলেন—কিন্তু পিতৃদেব বাংলার সমগ্র মতামত জানবার ও মহাত্মা গান্ধী ও ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের সঙ্গে পরামর্শ করবার সময় চাইলেন। তদনুযায়ী বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির

সভ্যগণের সভা আহূত হোল। এই কমিটিতে তিনশতাধিক সভ্য ছিলেন—সুভাষ চন্দ্রও এই কমিটির সভ্য শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। এ কমিটি 'সিভিল ডিসোবিডিয়েন্স' আরম্ভ করা যুক্তি-সঙ্গত মনে করে এই আন্দোলনের সমস্ত ক্ষমতা পিতৃদেবের হাতে ন্যস্ত করলেন। পরবর্ত্তী উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করবার ক্ষমতাও বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটি তাঁরই হাতে দিয়ে তাঁকে বাংলার কংগ্রেসের একমাত্র নিয়ামক করলেন। এই পদ্ধতিই শেষে ভারতের সর্ব্বপ্রদেশ গ্রহণ করল।

১৯২১ সালে সেপ্টেম্বরে আর একটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটেছিল। পিতৃদেব বিপ্লবীদলকে কংগ্রেসের প্রচার-কার্য্যের সহায়তা করতে অনুরোধ করলেন এবং সেজন্য তাঁদের মহাত্মার সঙ্গে আলোচনার সুযোগ দেবার জন্য আহ্বান করলেন। মহাত্মা এবং পিতৃদেবের সঙ্গে তাঁদের প্রাণ-খোলা আলোচনা হয়েছিল এবং তাঁরা বিপ্লবীদিগকে অহিংস-অসহযোগের প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁরা কংগ্রেসের কার্য্যে বিঘ্ন স্বরূপ হবেন-না তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এ প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠানের আনুগত্য স্বীকার করে সক্রিয় কার্য্যের দ্বারা কংগ্রেসের কার্য্যকে সাফল্য-মণ্ডিত করেছিলেন। এ সময় মহাত্মার সঙ্গে ওয়ার্কিং-কমিটির সভ্য, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, লালা লাজপত রায়, মৌলানা মহম্মদ আলী আমাদের রসা রোডের বাড়ীতে পিতৃ-দেবের অতিথি হয়েছিলেন

১৯২১ সালে অহিংস-অসহযোগ-আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধী যদি পিতৃদেব, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, লালা লাজপত রায় ও মৌলানা মহম্মদ আলীর সক্রিয়-সাহায্য না পেতেন তবে অহিংস-অসহযোগ এভাবে সাফল্য-মণ্ডিত হতো কিনা বলা শক্ত। পিতৃদেব ও লালা

লাজপত রায়ের তিরোধানের পর বাংলা ও পাঞ্জাবের রাজনৈতিক পরিস্থিতি চিন্তা করে দেখলেই তা বোঝা যায়।

এই সময় পিতৃদেব সমগ্র বাংলাদেশ পরিভ্রমণ করে যুবরাজের অভ্যর্থনা, বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন, ও অর্থ সংগ্রহের কার্য্যে লিপ্ত হন। এতে জনসাধারণের মধ্যে এমনই উন্মাদনা দৃষ্ট হয় যে সকলেই তখন মনে করেছিল যে দুমাসের মধ্যে মহাত্মার কথা-অনুসারে বিদেশী-বস্ত্র-বয়কট আন্দোলন নিশ্চয়ই সিদ্ধ হবে।

এই সময়ই পিতৃদেব তামাক ছেড়ে দিয়েছিলেন। তাঁর এত প্রিয় তামাক ছেড়ে দিয়ে একদিনও তাঁকে দেখিনি আক্ষেপ করতে। কোনদিনও যে তামাক খেতেন তা তাঁকে দেখলেও মনে হতো না। চিত্তবৃত্তি-নিরোধের এমন আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখে সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে গিয়েছিল।

২রা সেপ্টেম্বর থেকে কলিকাতার সমস্ত পার্কে স্তূপাকারে বিদেশী বস্ত্র ভস্মীভূত হতে লাগলো। প্রত্যেক সভায় পিতৃদেব বিদেশী-বর্জ্জন এবং বিদেশী বস্ত্র ভস্মীভূত করবার জন্য বক্তৃতা দিতে লাগলেন। বিদেশী-বর্জ্জন ও বস্ত্রযজ্ঞ দেখে এই বক্তৃতার পরের দিনই রসারোডের বাড়ীর টেনিস্‌কোর্টে আমাদের বাড়ীর যত বিদেশী বস্ত্র ছিল, পিতৃদেবের স্যুট্‌ কোট পর্য্যন্ত, সব স্তূপাকার করে সুভাষচন্দ্র তাদের মুখাগ্নি-ক্রিয়া সম্পন্ন করলেন। বৃটিশ-সরকারও তাদের চণ্ডনীতির প্রবর্ত্তণ করে কর্ম্মীদের গ্রেপ্তার আরম্ভ করে দিলেন। কিন্তু গভর্ণমেণ্টের দলননীতিকে অগ্রাহ্য করে সমগ্র ভারতবর্ষ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। এই সময়ে বাঙ্গলায় পীর বাদশা মিঞা, ডাক্তার সুরেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, যুক্তপ্রদেশের প্রভুদয়াল ও ডাক্তার আবদুল করিম গ্রেপ্তার হলেন।

১৪ই সেপ্টেম্বর ওয়ালটেয়ারে মৌলানা মহম্মদ আলী এবং ১৬ই সেপ্টেম্বর বোম্বেতে মৌলানা সৌকত আলী গ্রেপ্তার হন।

সে সময় পিতৃদেবের নির্দ্দেশে আমরা তিলক-স্বরাজ্য-ভাণ্ডারের জন্য প্রত্যহ অর্থ-সংগ্রহের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষায় বের হতাম। ভিক্ষালব্ধ অর্থ ও অলঙ্কার নিয়ে যখন দিনের শেষে ফিরে আসতাম, তাই দেখে পিতৃদেব খুব আনন্দ পেতেন। মহাত্মা গান্ধী বল্লেন, 'তোমাদের দেয়-ভিক্ষা আমাকে দিয়ে যাও।' আমাদের গহণার বাক্স তাঁর কাছে খুলে দিলাম, তিনি তার থেকে ইচ্ছামত 'ভিক্ষা' বেছে বেছে গ্রহণ করে আমাদের দিয়ে প্রতিজ্ঞা করালেন যে, যে সব অলঙ্কার দেশের কাজের জন্য তিনি নিলেন তা আর কোনদিন নূতন করে পূরণ করতে পারব না। তখন দেশের সমগ্র মাতৃজাতিকে যে ভাবে হাসিমুখে স্বীয় অঙ্গের অলঙ্কার খুলে দিতে দেখেছিলাম—তারপর আমাদের আর অলঙ্কার পুরণ করে রাখবার প্রবৃত্তি কোনদিন হয়নি।

১৮ই সেপ্টেম্বর পিতৃদেব পীর বাদশা মিঞার মোকর্দ্দমা উপলক্ষে ফরিদপুর গিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে মা, বেবী, সত্যেন্দ্রনাথ মিত্র, হেমেন্দ্রপ্রসাদ দাসগুপ্ত, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, জিতেন্দ্রলাল বন্দোপাধ্যায় এবং মৌলানা আহমেদ আলী ছিলেন। পিতৃদেব ফরিদপুর থেকে অনেক অর্থ সংগ্রহ করে ফিরেছিলেন। ১৩ই নভেম্বর প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি, আমেদাবাদে পরে বারদৌলীতে ও ২৩শে নভেম্বর আনন্দায় আইন অমান্য আরম্ভ করতে সম্মতি দিল।

১৭ই নভেম্বর যুবরাজ বোম্বাই বন্দরে এসে পৌছলেন। সেইদিন কংগ্রেসের নির্দ্দেশে সমস্ত ভারতে হরতাল অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বৃটিশ-রাজশক্তি সেদিন ভালভাবেই কংগ্রেসের প্রাধান্য অনুভব

করেছিলেন। কংগ্রেসের-নির্দ্দেশে তখন প্রভুত্ব বা বলপ্রকাশ আদৌ ছিলনা। যে দেশবাসী একদিন কংগ্রেসের নির্দ্দেশে জীবনপণ করতেও কুণ্ঠিত হয়নি, আজ স্বাধীন ভারতে সেই কংগ্রেস দেশবাসীর হৃদয়স্পর্শ করে না কেন? একথাই বার বার ভাবি।

যুবরাজের আগমনে হরতালের দিন কলিকাতার যে দৃশ্য দেখেছিলাম তা ভুলবার নয়। কংগ্রেস নির্দ্দেশ শিরোধার্য্য করে সেদিন নগরের সমস্ত কর্ম্মতৎপরতাই স্তব্ধ ছিল। যানবাহনের চলাচল সেদিন একেবারেই ছিলনা, শুধু সুভাষচন্দ্র "On national service" মোটরের সামনে লিখে স্ত্রীলোক ও শিশুদের ষ্টেশন থেকে গন্তব্যস্থানে পৌঁছে দিচ্ছিলেন। এমন সুনিয়ন্ত্রিত-হরতাল আর কখনো অনুষ্ঠিত হয়নি। কংগ্রেসের এই সুশৃঙ্খল-পরিচালনা-কার্য্যে তখন সকলেই বিস্মিত হয়েছিলেন। এই সুশৃঙ্খল-কার্য্য পরিচালনার মূল কৃতিত্ব ছিল তখনকার নেতৃবর্গের। কারণ তখন তাঁদের মধ্যে "আমি নেতা" এ মনোভাব একেবারেই দৃষ্ট হয়নি। পিতৃদেবকে দেখেছি সকলকে একসঙ্গে নিয়ে পরামর্শ করে কাজ করতে। নিজের মত তাদের বোঝাতে না পারা পর্য্যন্ত তিনি ক্ষান্ত হননি। কর্ম্মীদের সঙ্গে ছিল তাঁর 'এক পরিবারভুক্ত' সম্পর্ক—সেজন্যই তিনি জনগণের চিত্ত-রঞ্জনে সক্ষম হয়েছিলেন। হরতালের এই সাফল্যের জন্য গভর্ণমেণ্ট ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল, তাদের দলননীতি আরো প্রচণ্ডরূপ ধারণ করলো এবং ১৯শে নভেম্বর গভর্ণমেণ্ট স্বেচ্ছাসেবক-সঙ্ঘ অবৈধ বলে ঘোষণা করে দিল। সমস্ত কংগ্রেস ও খিলাফত অফিসে খানাতল্লাসী হয়ে গেল। এই হরতালকে সাফল্যমণ্ডিত করতে মামা (সুরেন্দ্রনাথ হালদার) ও ব্যারিষ্টার নিশীথচন্দ্র সেনের অক্লান্ত পরিশ্রমও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ভারতে যখন সর্ব্বত্র চণ্ডনীতির প্রয়োগ-বন্যা চলছিল, সে সময় সমগ্র ভারতব্যাপী গ্রেপ্তার চলতে লাগলো। সে সময় ২৭শে নভেম্বর বাঙ্গলার কংগ্রেস ও খিলাফত কমিটি দেশের অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে পিতৃদেবকে উপদেষ্টা ও নিয়ামকের ক্ষমতা দিয়ে দেশবাসীকে তাঁর নেতৃত্বে স্বেচ্ছাসেবক হতে আহ্বান জানাল। বাংলায় এমনভাবে দেশবাসীর বিশ্বাস, আশা ভরসা ও শ্রদ্ধার নিদর্শন বোধকরি পূর্ব্বে আর কোন নেতার ভাগ্যে জোটেনি। পিতৃদেব এই নিয়ামকের পদে সমাসীন হয়ে এই সঙ্কট সময়ে দেশকর্ম্মীদের কর্ত্তব্য-নির্দ্দেশ করে উপর্য্যুপরি কয়েকটি আহ্বান বাণী ঘোষণা করেন। দশলক্ষ স্বেচ্ছাসেবকের জন্য আহ্বান করেছিলেন তিনি। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট তাঁর এই প্রকাশকে উপেক্ষা করে তাঁর সব ঘোষণাই বে আইনী বলে প্রকাশ করে চারিদিকে খিলাফত ও কংগ্রেস কর্ম্মীদের গ্রেপ্তার করতে লাগলো। যতীন্দ্রমোহন তিনমাসের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। ১৯০৮ সালের পুরানো Criminal Law Amendment Act পুনরায় বুরোক্রেসীর সহায় হলো। পূর্ব্বে এই বিধান-অনুযায়ীই অনুশীলন সমিতি, সুহৃদ সমিতি ও সাধনা সমিতি বন্ধ করা হয়েছিল।

এই সময় রসারোডের বাড়ী কর্ম্মচাঞ্চল্যে মুখরিত হয়ে উঠেছিল। দলে দলে কিশোর ও যুবকেরা স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীতে যোগ দেবার জন্য এসে সমবেত হয়েছিল এখানে। পিতৃদেবের অদ্ভুত কর্ম্মপ্রেরণায় ও আদর্শে সমগ্র বাংলাদেশে এক নূতন ভাবের বন্যা বয়ে গেল। এক নূতন উৎসাহ ও কর্ম্মোদ্যমে বাংলা জেগে উঠলো। আজ পিতৃদেবের সেই বাঙ্গলা কার অভিশাপে এমন গভীর নিদ্রামগ্ন! জানি না আবার কোন মোহনস্পর্শে তার আত্মসম্বিৎ ফিরে আসবে!

দেশের নিয়ামক হয়েও পিতৃদেব কমিটির পরামর্শ না নিয়ে কথনো তাঁর কর্ত্তব্য সম্পাদন করতেন না। তাঁরই নির্দ্দেশে সুভাষচন্দ্রের অধিনায়কত্বে বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী ও খিলাফৎ সেবকগণের ভিন্ন ভিন্ন চালক নির্দ্ধারিত হয়েছিল। ১লা ডিসেম্বর দেশবাসীর নিকট পিতৃদেব "My message to my country-men" শীর্ষক বাণী প্রচার করেন। তাতে তিনি বলেছিলেন, "বুরোক্রেসী এবার অসহযোগ আন্দোলন ধ্বংশ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে। আমি জানিতাম সর্ব্বাগ্রে ইহারাই আইনের বিধান ভঙ্গ করিবে। পূর্ব্ব হইতেই ১৪৪ ধারা প্রয়োগ করিয়া আমাদিগের ন্যায়সঙ্গত অনেক কার্য্যে ইহারা বাধা প্রদান করিয়াছে। এখন আবার আমাদের সাফল্যে অসহিষ্ণু হইয়া ইহারা বিস্মৃতির গর্ভ হইতে অব্যবহৃত আইন-অস্ত্রের উদ্ধার সাধন করিয়া আমাদের উপরে প্রয়োগ করিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়াছে। আমি আপনাদিগকে সাহস দিতেছি এই সঙ্কট সময়ে আপনারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবেন না। ধৈর্য্যের সহিত আপনারা সর্ব্বপ্রকার অত্যাচার সহ্য করিবেন। হিংসানীতির কথনো আশ্রয় লইবেন না, কংগ্রেসের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিতে কথনো বিতৃষ্ণ হইবেন না। মনে রাখিবেন স্বরাজ-লাভই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। ইহারা কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীকে বে-আইনী-জনতা আখ্যা দিয়া প্রকারান্তরে কংগ্রেসের কার্য্যে বাধা প্রদান করিতেছে। আজ হইতে সমস্ত নরনারী যেন ভলান্টিয়ার হইয়া এই অসঙ্গত আইন অমান্য করিতে সঙ্কুচিত না হন। আজ হইতে আমি নিজে ভলান্টিয়ার শ্রেণীভুক্ত হইলাম। আমি আশা করি বাংলা দেশে অচিরেই লক্ষাধিক ভলান্টিয়ার কাজ করিতে ছুটিয়া আসিবে। আমাদের লক্ষ্য পবিত্র। কার্য্য-প্রণালী বিধিসঙ্গত ও অপ্রমত্ত। আপনারা মনে রাখিবেন যে দেশ-মাতৃকার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করা ভগবানেরই অভিপ্রেত কার্য্য।

পার্থিব কোন ক্ষমতাই আমাদের এই ভাগবত ব্রতে প্রতিবন্ধক হইতে পারে না ও পারিবে না।"

৩রা ডিসেম্বর প্রথম-স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী পাঁচটি দলে খদ্দর বিক্রয় ও হরতাল ঘোষণার জন্য প্রেরিত হলো। সুভাষচন্দ্রই এসব নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন। নিয়ম ছিল পাঁচজন করে স্বেচ্ছাসেবক এক এক দলে থাকবে। সে সঙ্গে একজন বার্ত্তাবহ দূরে থেকে তাদের কার্য্যকলাপের আবশ্যকমত সংবাদ দেবে। প্রথম দিন তাদের উপর কিন্তু পুলিশের কোন নজর পড়েনি।

৪ঠা ডিসেম্বর দশটি দল প্রেরিত হয়ে নির্ব্বিঘ্নে বাড়ী ফিরে এলো। এই সময় পিতৃদেবের সহকর্ম্মীরা সকলেই তাঁদের আহারাদি আমাদের রসারোডের বাড়ীতেই করতেন। এত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার মধ্যেও পিতৃদেবকে হাস্য পরিহাস থেকে নিবৃত্ত থাকতে দেখিনি। খেতে বসে পাচককে বল্লেন, "ঠাকুর, আর দুদিন পরেইত জেলের কঙ্কর মেশান ভাত খেতে হবে, তুমি এখন থেকেই সেটা আরম্ভ করে দাও—তাহলে আমাদের অভ্যেস হয়ে যাবে।" সুভাষচন্দ্র কিন্তু পিতৃদেবের একথা মোটেই সমর্থন করলেন না, মাকে বল্লেন, "যে দুঃখ পরে পেতেই হবে, আগে থেকেই তা স্বেচ্ছায় ভোগ করি কেন?" পিতৃদেব তাতে বল্লেন "জেলে গিয়ে যখন ঘানি টানতেই হবে তখন আগে থেকেই শরীরটাকে কষ্ট-সহিষ্ণু করে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।" এই রকম হাস্য পরিহাসে, বিমল আনন্দেই প্রত্যহ খাওয়ার পর্ব্ব শেষ হতো।

যুবরাজের আগমনে বোম্বাইতে দাঙ্গা-হাঙ্গামা অনুষ্ঠিত হয়েছিল বলে পিতৃদেব ৫ই ডিসেম্বর পুনরায় তাঁর আবেদন প্রকাশ করলেন, যাতে দেশবাসী সংযত ও সমাহিত চিত্তে কার্য্যে অগ্রসর হয়।

ইতিপূর্ব্বে ওরা ডিসেম্বর সমিতির অধিবেশন করতে লাহোরে লালা লাজপত রায়কে ডাক্তার গোপীচাঁদ, মালিক লাল খাঁ ও সন্তানম্ সহ গ্রেপ্তার করা হয়।

পাঞ্জাব কেশরী লাজপত রায়ের গ্রেপ্তারে পিতৃদেব ক্ষোভে গর্জ্জন করে উঠেছিলেন। এদের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখিয়ে তিনি ছাত্রদের সমরে আহ্বান করে বল্লেন, কংগ্রেসের গৌরব-স্তম্ভ লাজপত রায় আজ কারাগৃহে। আমি এখন প্রকাশ্য আক্রমণ চাই! বাংলার তরুণ যুবকেরা, তোমরা কি দাঁড়িয়ে কংগ্রেসের কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়া দেখবে? তোমরা কি মায়ের আহ্বানে সাড়া দিবে না? এখন কি তোমাদের পড়বার সময়? এস এস, বাংলার তরুণ তরুণীরা, আজ যে তোমাদের সহায়তা চাই। আমি যে বন্ধন শৃঙ্খলের গুরুভার আর বহন করতে পারছিনা, কলকাতার ছাত্রবৃন্দ। এতবড় নগরীতে কি মাত্র পাঁচহাজার সন্তান? তোমরা আর নিষ্ক্রিয় হয়ে থেকনা—আজ যে দেশ-জননীর সেবায় তোমাদের সাহায্যের বড়ই প্রয়োজন! আমার জীবন যায় যাক—কংগ্রেসের কাজ বন্ধ করতে তোমরা দিওনা—ছাত্রেরা, তোমরা কি আর আমার কথার উত্তর দিবেনা?

এমনই প্রাণস্পর্শী ভাষায় অশ্রুসজল চোখে তিনি ছাত্রদের আহ্বান করেছিলেন যে তারা সে আহ্বানে না এসে পারলনা, এমন কি গভর্ণমেণ্টের প্রেসিডেন্সী কলেজে গিয়ে মা যখন ভোম্বলের গ্রেপ্তারের পর গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে তাদের পিতৃদেবের আহ্বান জানিয়েছিলেন তখন প্রেসিডেন্সী কলেজ সে আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল।

ছাত্রদের প্রতি পিতৃদেবের এই আবেদনের পরদিনই ৬ই ডিসেম্বর ভোম্বল স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে যোগ দিয়ে খদ্দর বিক্রয় ও হরতাল ঘোষণা করতে যাবে বলে পিতৃদেবকে এসে বল্ল, "বাবা!

আমি যেতে চাই।" পিতৃদেব উল্লসিত হয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বল্লেন "তাইতো! পরের ছেলেকে ডাকবার আগে আমার ছেলেকে ডাকবার, আমার নিজের ছেলেকে পাঠানই তো কর্ত্তব্য"! অত্যন্ত আনন্দিত হলেন তিনি। মাও বল্লেন, "এবার পরের সন্তানকে আহ্বান করতে আমার কোন সংকোচই হবে না"। সেদিন পিতৃদেব আনন্দপূর্ণ চিত্তেই সংসারে তাঁর প্রিয়তম সম্পদকে দেশ সেবার্থে পাঠিয়ে গর্ব্ব অনুভব করেছিলেন। ভোম্বলকে একাজে নিবৃত্ত করতে পিতৃদেবের সহকর্ম্মীগণ সকলেই ভোম্বল ও পিতৃদেবের সঙ্গে অনেক তর্ক করলেন। কিন্তু পিতৃদেব বল্লেন, "নিজের ছেলেকে যেতে বারণ করে আমি পরের ছেলেকে এগিয়ে আসতে বলব? একথা তোমাদের বলাই অন্যায়। এবং তা করতেও আমি অক্ষম।" ভোম্বল যখন চলে গেল পিতৃদেব ও মা কাউকেই এতটুকু বিচলিত হতে দেখিনি। ভোম্বলের একবৎসরের মেয়ে মিনুকেও পিতৃদেব বল্লেন, কিরে? তুই যাবি? সেদিন ভোম্বলের উপর হিংসা হয়েছিল আমার! ছেলে বলেই না সে অমন করে চলে যেতে পারল পিতৃদেবের কাজে! আর তাঁর মেয়ে হয়ে শত নিষেধের গণ্ডীতে আমি বাঁধা পড়ে রইলাম। বেবী তখনো কোন গণ্ডীতে বাঁধা না পড়েও তার শারীরিক অসুস্থতার জন্যই যেতে পারলোনা। আর সুজাতা তখন শিশুকন্যা নিয়ে বিব্রত থাকায় তারও যাওয়া হলোনা।

বিকেল বেলাই আমাদের বাড়ীতে খবর এলো হ্যারিসন রোড ও কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে ভোম্বলের দল গ্রেপ্তার হয়েছে। পিতৃদেব এ খবরটি পেয়ে অবিচলিত চিত্তেই বসে রইলেন। দলে দলে অনেকে বাবাকে সহানুভূতি জানাতে এল্লেন, তাঁর কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নেই—তিনি ভাবছেন আরো ছেলে যোগাড়

করবার কথা! সামনেই সুভাষচন্দ্রেরা বসে ঠিক করছে এর পর কয়টি দল পাঠান হবে।

সন্ধ্যের পর সত্যেন্দ্র চন্দ্র মিত্র এবং হেমেন্দ্র নাথ দাসগুপ্ত ভোম্বলের লালবাজারে খাবার পাঠানর কথা পিতৃদেবকে জানালেন। সেদিন ভোম্বলের সঙ্গে ২১ জন গ্রেপ্তার হয়েছিল—মা তাদের সকলের জন্যই—খাবার দিলে সত্যেনবাবু ও হেমেন্দ্রবাবু তা নিয়ে লালবাজারে গেলেন।

রাত্রে সার্জ্জেণ্টরা ভোম্বলকে প্রহারে জর্জ্জরিত করেছিল, তাদের আচরণের তীব্র প্রতিবাদ করাতেই এ শাস্তি গ্রহণ করতে হয়েছিল তাকে। রাত্রে সমস্ত কলকাতায় গুজব রটে গেল যে ভোম্বল প্রহারে জর্জ্জরিত হয়ে জীবন বিসর্জ্জন দিয়েছে। পিতৃদেব ও মা দুইজনেই স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। সুজাতার তখন কি ভয়ানক অবস্থা! দুরু দুরু বক্ষে আমরা অপেক্ষা করছিলাম আরো বিশদ সংবাদের জন্য। হেমপ্রভা মজুমদার তখন চলে গেলেন আলীপুর জেলে খবর আনতে। প্রথমতো তাঁকে জেল কর্ত্তৃপক্ষ কোন আমলই দেননি, কিন্তু তিনিও দমবার পাত্রী নন। হুঙ্কার দিয়ে তিনি তাদের শাসালেন যে ভোম্বলের খবরের জন্য হাজার হাজার জনতা বাইরে অপেক্ষা করছে। তারা যদি শোনে যে ভোম্বলের সঙ্গে দেখা করতেই তিনি পারেননি, তবে তারা জানবে যে ভোম্বলের মৃত্যুর খবর সত্য এবং তাহলে কলিকাতায় আগুন জ্বলে উঠবে। কর্ত্তৃপক্ষ কি মনে করলেন জানি না, তবে অচিরেই হেমপ্রভা দেবীকে ভোম্বলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে দিলেন। তিনি এসে আমাদের ভোম্বলের উপর সার্জ্জেণ্টদের প্রহারের যা বিবরণ দিলেন তা শুনে আমরা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। সেইদিনই আমার স্বামীর ডুমরাওণের মোকর্দ্দমা উপলক্ষ্যে ডুমারাওণ যাওয়ার কথা ছিল এবং তাঁর শরীর অসুস্থ

থাকাতে আমারও সঙ্গে যাবার কথা হলো। ভোম্বল সুস্থ আছে শুনে সেরাত্রেই আমরা চলে গেলাম। সেখানে পরদিনই পৌঁছে বেবীর তার পেলাম যে মা গ্রেপ্তার হয়েছেন। খবর পেয়ে আমার স্বামী সব কাজ বন্ধ রেখে চলে আসবার ব্যবস্থা করলেন। পরদিনই আমরা পিতৃদেবের গ্রেপ্তারের খবর পেয়ে রওনা হলাম। হাওড়া এসে জানতে পেলাম যে মা মুক্তি পেয়েছেন।

বাড়ী পৌঁছে বেবীর কাছে শুনলাম ভোম্বল গ্রেপ্তার হবার পরদিনই মা সংকল্প করলেন তার পরদিনই তিনি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী নিয়ে বড়বাজারে খদ্দর বিক্রয় ও হরতাল ঘোষণা করতে যাবেন। একমাত্র পুত্রের গ্রেপ্তারে ও তার প্রতি সার্জ্জেণ্টের অকথ্য অত্যাচারে মাতৃহৃদয় বিচলিত হলো। মার সঙ্গে নপিসিমা (উর্ম্মিলা দেবী) ও নপিসিমা প্রতিষ্ঠিত নারীকর্ম্ম মন্দিরের একজন কর্ম্মী সুনীতি দেবীও গেলেন। বড়বাজারে যাওয়া মাত্রই তাঁরা গ্রেপ্তার হলেন।

মাদের গ্রেপ্তারে কলকাতায় হুলুস্থুল পড়ে গেল। বড়বাজারের বিরাট জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো—চারিদিক থেকে রব উঠলো, "আমি জেলে যাব"। সেদিন বাংলার অগণিত যুবকরা গ্রেপ্তার হলো। এই সঙ্গে হেমন্তকুমার সরকারও গ্রেপ্তার হলেন। যে ছাত্রদের নিকট আবেদন করে পিতৃদেব দুঃখপ্রকাশ করে বলেছিলেন, "মাত্র পাঁচ হাজার তোমরা" ? ভোম্বল ও মা ওঁদের গ্রেপ্তারে সেই ছাত্র সমাজ দলে দলে কারাবরণ করে বাঙ্গলা দেশকে গৌরবদীপ্ত করলো।

মার গ্রেপ্তারে পিতৃদেব ধীর গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন ; তাঁর সহকর্ম্মীদের পাঠিয়ে দিলেন ক্ষুব্ধ জনতাকে শান্ত করতে। বিজয় মামা (বি-সি চট্টোপাধ্যায়) মার গ্রেপ্তারে এত উত্তেজিত হয়ে উঠলেন যে পিতৃদেবকে কিছু জিজ্ঞাসা না করেই তিনি লালবাজারে তাঁদের জামীনে

মুক্ত করে আনবার জন্য চলে গেলেন। জামীনে মুক্ত হতে মা ওঁরা অস্বীকার করাতে, বিজয় মামা মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে চলে এলেন। মা ওঁদের প্রেসিডেন্সী জেলে নিয়ে যাওয়া হলো। মডারেটরা সেই দিনই লর্ড রেডিংকে একটি ভোজ দেন। সেই ভোজসভায় সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক মাতৃজাতির এ অপমান সহ্য করতে না পেরে তীব্র প্রতিবাদ করে ভোজ সভা থেকে বের হয়ে এসে বাঙ্গলার সম্মান রাখলেন।

বিজয় মামা কিন্তু লালবাজারে গিয়েই ক্ষান্ত হলেন না। তিনি একেবারে নিজ দায়িত্বে লর্ড রোনাল্ডসের কাছে গিয়ে মা ওঁদের মুক্তি প্রার্থনা করলেন, এবং তাতে সে রাত্রেই তাঁদের মুক্তির ব্যবস্থা হলো। সব ব্যবস্থা করে রাত্রিবেলা যখন এসে তিনি এই সুসংবাদটি দিলেন, পিতৃদেব তখন ব্যাঘ্রের মতন গর্জ্জন করে বল্লেন, "তুমি কার অনুমতিতে একাজ করেছ? তুমি কি বুঝবে যে আমাদের সমস্ত শ্রম তুমি কিভাবে পণ্ড করে দিলে? যাও তোমার সঙ্গে সম্পর্ক আছে বলাতে আমি লজ্জা বোধ করি।" বিজয় মামাও প্রতিগর্জ্জন করে বল্লেন, "বাসন্তী আমার বোন, তাঁর এ অপমান আমি সহ্য করতে পারিনা"। পিতৃদেব হেসে বল্লেন, "ও, বাসন্তী তোমার বোন, তাই তুমি একাজ করেছ? সে অন্য কারো বোন হলে বোধকরি তোমার অপমানবোধ হতোনা? তাই কি?" বিজয় মামা আর বাক্যব্যয় না করে চলে গেলেন। রাত্রি ১১টার পর জেলার গিয়ে মা ওঁদের জানালেন তাঁরা মুক্ত এবং বাড়ী যেতে পারেন —বিজয় মামাকে দেখে সব ব্যাপার শুনে মা ভয়ানক রেগে গেলেন, তিনি জেল হতে বেরুতে অস্বীকার করলেন। কিন্তু জেলার তাঁদের জানিয়ে দিলেন যে বন্দী মুক্তি পেলে তাঁকে জেলে রাখতে তারা অপারগ। মা ওঁরা রোষে, ক্ষোভে পূরিত হয়ে রাত প্রায় বারটার সময় বাড়ী ফিরে এলেন। বিজয় মামা সঙ্গে আসতে আর সাহস পেলেন না।

মুক্তির এ অপমান মায়ের অসহ্য হলো, তাই পরদিনই তাঁরা আবার খদ্দর বিক্রয় করতে গেলেন, কিন্তু আর তাঁদের গ্রেপ্তার করা হলোনা।

মা ওঁদের গ্রেপ্তারের পর সরকারী ইস্তাহারে পিতৃদেবকে লক্ষ্য করেই বলা হলো…"এই আন্দোলনের নেতৃবর্গ ইচ্ছাপূর্ব্বক আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার শক্তিকে সমরে আহ্বান করিতেছে। মহিলা ও কোমলমতি বালকগণকে যাহারা আইনভঙ্গ করিতে উৎসাহিত করিতেছে, অতঃপর তাহাদের সম্পর্কেও সরকার আইন প্রয়োগে বাধ্য হইবেন।"

মহারাজ স্যার প্রদ্যোৎ কুমার ঠাকুর একদিন পিতৃদেবকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, যে লর্ড রোনাল্ড্‌সে যদি পিতৃদেবের সঙ্গে সাক্ষাত করতে চান তবে তিনি লাট প্রাসাদে যাবেন কিনা। পিতৃদেব বলেছিলেন ভদ্রতা রক্ষার্থে যেতে তাঁর কোন আপত্তি নেই। একথার পূর্ব্বে লর্ড রোনাল্ড্‌সে এক প্রকাশ্য সভায় বলেছিলেন, "A great personality of Bengal will preside over the destiny of India and we wait with great anxiety to hear him as President of the next Indian National Congress." তিনি ভাবতেও পারেন নি যে পিতৃদেবের শক্তিতে বাংলাদেশ এত বল পাবে। হয়তো তিনি প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুরের কাছে শুনেছিলেন যে ভদ্রতা রক্ষার্থে তাঁর ওখানে যেতে পিতৃদেবের আপত্তি নেই, তাই এই আন্দোলন এবং হরতাল সম্বন্ধে বোঝাপড়া করবার জন্য তিনি স্যার আশুতোষ চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর সেক্রেটারী মিঃ গুরলেকে চিঠি দিয়ে পিতৃদেবের নিকট পাঠালেন। ৮ই ডিসেম্বর লর্ড রেনাল্ড্‌সের সঙ্গে পিতৃদেব সাক্ষাত করতে যান। কথাবার্ত্তায় উভয়েই বুঝলেন যে কোনপক্ষই নতি স্বীকার করতে প্রস্তুত নয়।

পিতৃদেব তাঁকে জানালেন কংগ্রেস নির্দ্দেশ অনুযায়ী হরতাল বন্ধ করা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব। এবং লর্ড রোনাল্ড্‌সেও বিনয় পূর্ব্বক পিতৃদেবকে জানালেন যে শান্তি শৃঙ্খলা তাদের রাখতেই হবে। শেষে লর্ড রোনাল্ড্‌সে মার গ্রেপ্তারের জন্য পিতৃদেবের নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করতে কার্পন্য করেননি।

১৯২১ সালে ১০ই ডিসেম্বর পিতৃদেব গ্রেপ্তার হলেন। সেদিনই সুভাষ চন্দ্র বসু, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, মৌলানা আকরাম খাঁ, পদ্মরাজ জৈন, মৌলবী আহম্মদ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দও গ্রেপ্তার হয়েছিলেন।

আগেই খবর এসেছিল যে সেদিন পিতৃদেব গ্রেপ্তার হতে পারেন। তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে সকলকে জানিয়ে সব ব্যবস্থা করতে লাগলেন। স্থির হলো যে তাঁর অনুপস্থিতিতে শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী বাংলার নিয়ামক হবেন, এবং শাসমলের স্থানে সাতকড়িপতি রায় সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

১০ই বিকেলবেলা রসারোডের উপরের বারান্দায় বসে পিতৃদেব চা পান করছেন, এমন সময় বেবী এসে বল্ল, "বাবা সার্জেণ্ট এসেছে।"

পুলিশ কমিশনার মিঃ কীড ও ডেপুটী কমিশনার মিঃ ম্যেকেনজী পিতৃদেবকে গ্রেপ্তার করতে এসেছিলেন। নীচের অফিস ঘরে শাসমল ও মামা সুরেন্দ্র নাথ হালদার বসেছিলেন। শাসমলও সেদিন গ্রেপ্তার হলেন।

আমরা এসে দেখলাম পিতৃদেব ও ভোম্বল গ্রেপ্তার হওয়া সত্ত্বেও মা কিছুমাত্র বিচলিত হননি—বরং স্বামী পুত্রের গৌরবে গৌরবান্বিতই দেখলাম তাঁকে।

বাড়ীতে এসে বাবাকে না দেখতে পেয়ে আমি খুব বিচলিত হয়ে তখনই স্যার আবদুর রহিমের অনুমতি নিয়ে প্রেসিডেন্সী জেলে বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চলে গেলাম। কিন্তু প্রথমদিন গরাদের বাইরে দেখা করতে দেওয়ায়, পুনরায় সাক্ষাতের অনুমতি চাইলে পিতৃদেব নিষেধ করে দিলেন। ভোম্বলের সঙ্গে দেখা হলো না। আমরা আর দেখা করতে না যাওয়ায় গভর্ণমেণ্ট কি বুঝলেন জানি না, দুই তিন দিন পর আমাদের জানানো হলো যে জেলের অফিস-ঘরে আমরা পিতৃদেবের সঙ্গে দেখা করতে পারব। গরাদের বাইরে থেকে আর দেখা করতে হবে না। গভর্ণমেণ্টের হঠাৎ এই শুভবুদ্ধি দেখে আমরা বিস্মিত হলাম। একদিন এই অফিস-ঘরেই পিতৃদেবের সঙ্গে দেখা করবার সময় একজন পুলিশ কর্ম্মচারী মাকে বলেছিল যে পিতৃদেবের সঙ্গে কথা বলবার সময় যেন কর্ম্মচারীদের শ্রুতিগোচর করেই কথা বলেন। মা তাতে তীব্র আপত্তি প্রকাশ করেন। পিতৃদেবও তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতে পুনরায় আমাদের নিষেধ করে দিলেন।

বিনা পরোয়ানায়ই পিতৃদেবকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। জেলে পিতৃদেব তাঁর পরোয়ানা দেখতে চাইলে মিঃ কীড জানালেন যে তাঁকে পরোয়ানা বলে ধরা হয়নি,—ফৌজদারী আইনের ৫৪ ধারা অনুসারে সন্দেহে তিনি ধৃত হয়েছেন। একথা শুনে হেসে পিতৃদেব তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন যে তাঁর প্র্যাকটিশ্ ছাড়বার পর আইনের কোনও নূতন প্রবর্ত্তন হয়েছে কিনা, কেননা তিনি যতদূর জানেন ৫৪ ধারা ভলাণ্টিয়ার আইনের জন্য নয়। কীড্ সাহেব বাক্যব্যয় না করে প্রস্থান করাই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করলেন।

১২ তারিখে ৫টার সময় প্রথম পিতৃদেবকে ম্যাজিষ্ট্রেটের

কাছে আনা হয়। পরে মোকর্দ্দমা মুলতুবি রাখার পর ২০শে জানুয়ারী ১৯২২ সালে সিভিল জেলে তাঁর বিচার হওয়ার কথা হয়। জেলে বিচার হলে জনসাধারণ কেউ আসতে পারবে না, এজন্যই বোধহয় গভর্ণমেণ্ট জেলে বিচার করার সিদ্ধান্ত করেন। নিশীথ সেন ও মামা জোর করেই বিচারের সময় ঢুকেছিলেন। তাঁদেরও যথেষ্ট বাধা দেওয়া হয়েছিল প্রথমে।

এরপর পিতৃদেব ইমফ্লুয়েঞ্জাতে কাতর হয়ে পরাতে ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯২২ সালে প্রকাশ্য বিচারালয়ে ব্যাঙ্কশাল কোর্টে বিচার হয়। পিতৃদেব নিজপক্ষ সমর্থন করলেন না। একতরফা-বিচারে মিঃ সুইনো ছয় মাস বিনাশ্রমে কারাদণ্ডের আদেশ দিলেন।

বিচারের পর পিতৃদেবকে প্রেসীডেন্সি জেল থেকে সেণ্ট্রাল জেলে আনা হয়েছিল। এখানে আসার একমাস পরেই ১০ই মার্চ্চ ১৯২২ সালে মহাত্মা গান্ধী আমেদাবাদে গ্রেপ্তার হন এবং ১৮ই মার্চ্চ তাঁকে ছয় বৎসর বিনাশ্রম-কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

জেলে এসে পিতৃদেব তাঁর প্রিয়-শিষ্য, সেবক ও কর্ম্মীদের এবং ভোম্বলের সঙ্গে মিলিত হন। প্রেসিডেন্সী জেলে সুভাষচন্দ্রের এবং অন্যান্য কর্ম্মীদের পিতৃদেবের সঙ্গে একঘরে থাকতে দেওয়া হয়নি—তবে বারান্দায় এসে সকলে মিলিত হতে পারতেন। কিন্তু সেণ্ট্রাল জেলে পিতৃদেব এদের নিয়ে একটা লম্বা টানা ঘরে একসঙ্গে থাকতেন। সেই ব্লক একেবারে পৃথক ছিল, অন্য কোন কয়েদীর ঘর সেখানে ছিল না। জেলের তিনটি গেট পার হয়ে চারিদিকে উচ্চ দেওয়াল-ঘেরা উঠান—তারপরেই সিঁড়ি দিয়ে উঠে বারান্দা ও তার পাশেই একখানা লম্বা টানা ঘর। পিতৃদেব ও সহকর্ম্মীদের ঘর হতে কানাইয়ের ফাঁসীর জায়গা বেশী দূরে

ছিল না। পিতৃদেব প্রায়ই সেদিকে চেয়ে মৌন হয়ে যেতেন। নবীন কিশোরের দেশপ্রেমকে স্মরণ করে তাঁর নয়ন অশ্রুসজল হয়ে উঠতো।

বিচারের সময়ই পিতৃদেব ইনফ্লুয়েঞ্জাতে কাতর হয়েছিলেন। সেণ্ট্রাল জেলে এসে শরীর খুবই দুর্ব্বল হয়ে পড়ল। আমরা দেখা করতে গেলে তাঁকে ঐ রুগ্ন শরীরে অতটা পথ হেঁটে আসতে হবে বলে মা বল্লেন, "যদি সেলএ গিয়ে দেখতে পারি তবেই যাব—নাহলে দেখা করতে গিয়ে এই দুর্ব্বল শরীরে অতখানি পথ হাঁটিয়ে কষ্ট দেবার কোন প্রয়োজন নেই।" মার একথা হয়তো লর্ড রোনাল্ড্‌সের কানে গিয়েছিল—কারণ তারপরদিনই গভর্ণমেণ্ট হাউস থেকে আমাদের বাড়ীতে ফোন এল যে আমরা সেলএ গিয়েই সাক্ষাৎ করতে পাব—এবং পিতৃদেবের অসুস্থতার জন্য মা সারাদিনই সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাঁর কাছে থাকতে পারবেন। আমাদেরও থাকতে বাধা ছিল না। এবং গভর্ণমেণ্ট থেকে আরো বলেছিল যে পিতৃদেবের খাবার আমরা ইচ্ছামত বাড়ী থেকে নিয়ে যেতে পারব। পিতৃদেব তাতে রাজী হননি; তিনি বল্লেন, "আমার ঘরে যতজন ছেলে আছে সবাইর খাওয়ার যদি আনতে দেয়—তবেই আমি বাড়ীর খাওয়ার খাব।" কর্ত্তৃপক্ষ এতে প্রথমে আপত্তি করেছিলেন। আমি একদিন খাবার সময় পিতৃদেবকে দেখতে গিয়ে দেখি—তিনি ক্যাম্পখাটে শুয়ে আছেন, আর মেঝেতে সুভাষ, ভোম্বল, হেমন্ত সরকার, কিরণ শঙ্কর রায়, সুকুমার কাকা এবং অন্যান্য সকলে খেতে বসেছেন। আমাকে দেখেই ভোম্বল বলে উঠল, "বেশ হয়েছে, যেমন জেলে আসিস্‌নি, আজ জেলের খাওয়া খেতেই হবে।" ভোম্বলের লোহার থালার দিকে তাকিয়ে দেখি—ভাত নয়তো যেন বেদানার দানার মতো

মোটা চাউল, তাও যদি পরিষ্কার হতো—তাহলে অনায়াসে খেতে পারতাম—কিন্তু তাতে দড়ির টুকরো থেকে আরম্ভ করে দেশলাইর কাঠি, ব্লটিং কাগজ, চুল কিছুরই অভাব নেই—এই ভাত আর তার পাশে একবাটী ডাল—এতো কালো রংয়ের ডাল আর আগে দেখিনি। ক্ষিদের চোটে সুভায, ভোম্বল ওরা সকলেই সোনামুখ করে ঐ কদর্য্য খাদ্য অমৃতের মতন খেয়ে যেতে লাগল। ভোম্বল জোর করে তার পাতের থেকে একগ্রাস আমার মুখে গুঁজে দিল—সেদিন বাড়ী এসে আর খেতে বসতেই পারছিলাম না। যখনই খেতে যেতাম—ভোম্বলের ঐ কদন্ন চোখের উগর ভেসে উঠতে লাগলো। পিতৃদেব অসুস্থ থাকায় তাঁর জন্য বার্লীর ব্যবস্থা ছিল। জেলের খাওয়া খেয়ে তিনি দিন দিন শুকিয়ে যেতে লাগলেন।

যাহোক, কদিন পরেই বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট পিতৃদেবের ও তাঁর সঙ্গীদের খাবার বাড়ী থেকে নেবার অনুমতি দিল। তাই মা সকলের জন্যই বাড়ী থেকে রান্না করে নিয়ে যেতেন।

তাই ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট তখন যে ভদ্রতা দেখিয়েছিল পিতৃদেবের অসুস্থতার জন্য, দেশীয় গভর্ণমেণ্ট অসুস্থ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে সেরকম কোন সুবিধাই দিলনা, দিলে হয়তো আজ আমরা শ্যামাপ্রসাদের অকাল বিয়োগে ব্যথাতুর হতাম না। পুত্রহীনা বিধবা বৃদ্ধা মাতা ও সন্তানদের বুকফাটা আর্ত্তনাদ ও দীর্ঘশ্বাসে তাহলে আজ বাঙ্গলার আকাশ বাতাস পূর্ণ হতো না।

কারাগারে থাকাকালীন কয়েকটি ব্যাপারে পিতৃদেবের চিন্তাশীল মনের গুরুতর পরিবর্ত্তন ঘটেছিল। প্রথম হচ্ছে মহাত্মা গান্ধীর বারদৌলীর প্রস্তাব। চৌরী চৌরাতে গ্রামবাসী অসহিষ্ণু হয়ে সেখানকার পুলিশ ষ্টেশান ভস্মীভূত করে, এবং কিছু পুলিশেরাও

তাদের হাতে নিহত হয়। এই খবর পেয়ে মহাত্মা গান্ধী মর্ম্মাহত হয়ে বারদৌলীতে ওয়ার্কিং কমিটির সভা আহ্বান করেন—মহাত্মা গান্ধীর নির্দ্দেশে কমিটি সমস্ত আন্দোলন বন্ধ করে দিয়ে শুধু চরকা, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ইত্যাদি কাজে আত্মনিয়োগ করবার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান করেন। প্রধান-নিয়ামক মহাত্মা গান্ধীর আদেশ সে সময় কর্ম্মীরা মেনে নিলেও তাঁদের ভেতর এ জন্য বিদ্বেষের ভাব জাগে। তাঁদের এ বিদ্বেষের প্রধান হেতু ছিল যে মহাত্মা গান্ধী, তাঁর সহকর্ম্মীদের সাথে পরামর্শ না করেই তাঁর অভিমত জানিয়েছিলেন এবং অন্যান্য প্রাদেশিক প্রতিনিধিদেরও মত তিনি প্রথমে নেন নি। তাঁর প্রধান পার্শ্বচর লালা লাজপতরায়, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ও পিতৃদেব তখন কারারুদ্ধ। বাবা কারাগারে এ খবর পেয়ে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন এবং মহাত্মাজীর এরূপ বার বার ভুল তিনি আদৌ সমর্থন করলেন না।

"এত বড় বৃহৎ দেশে চৌরীচৌরা ঘটবেই ; তার জন্য সমস্ত দেশে আন্দোলন বন্ধ করবার কোন মানেই হয়না ; তাছাড়া বাঙ্গলা দেশেতো কোন চৌরীচৌরা ঘটেনি, তবে বাঙ্গলার আন্দোলন বন্ধ হবে কেন ? এক কেন্দ্রের আদেশে সমস্ত প্রদেশের আন্দোলনকে থামিয়ে দেবার ক্ষমতা থাকলে প্রত্যেক প্রদেশের কাজ করবার স্বাধীনতাকে বলি দেওয়া হয়।" মহাত্মাজীর বারদৌলী-প্রস্তাব তাঁর গোঁড়াপন্থী বিশিষ্ট কয়েকজন অনুচরবৃন্দ ব্যতীত আর কেউ সমর্থন করেননি। দ্বিতীয় হলো, গোলটেবিল বৈঠকের আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করা মহাত্মার পক্ষে মারাত্মক ভুল হয়েছে বলে তিনি মনে করেছিলেন। আর তৃতীয় হলো, কাউন্সিলে প্রবেশ করে গভর্ণমেণ্টের সমস্ত কার্য্যে সক্রিয়-বাধা দেওয়া একান্ত প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেছিলেন। এই সব নানা চিন্তায় জেলেই তাঁর শরীর খুব

অসুস্থ হয়ে পড়লো। জেল হতে বের হয়েই তিনি "কাউন্সিল্ এন্ট্রি" বা কাউন্সিল্-প্রবেশ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

প্রকৃতপক্ষে মহাত্মা গান্ধীর সহিত তিন বৎসর পর্য্যন্ত পিতৃদেবের অনেক প্রধান প্রধান রাজনীতি-মূলক বিষয়েও যথেষ্ট মতানৈক্য ছিল। কিন্তু উভয়েই শৃঙ্খলার বশবর্ত্তী ছিলেন বলে মতানৈক্য থাকা সত্ত্বেও তাঁদের কার্য্য-পদ্ধতি বাধাপ্রাপ্ত হয়নি। আবার এও দেখেছি যে মহাত্মা প্রধান প্রধান রাজনীতিমূলক বিষয়ে প্রথমে পিতৃদেবের সঙ্গে মতানৈক্য দেখিয়েও আবার পরবর্ত্তী-কালে পিতৃদেবের মতানুবর্ত্তিতার পথই অনুসরণ করতে কুণ্ঠিত হননি।

কারাগারে অবস্থান কালে একদিন পিতৃদেব, সুজাতা, বেবী ও আমাকে বল্লেন, "এবার উঠে পরে তোরা তিলক-স্বরাজ্য-ভাণ্ডারে চাঁদা তুলতে লেগে যা।" আমরা তাঁর আদেশ-মত প্রত্যহ সকাল থেকে রাত পর্য্যন্ত অর্থ সংগ্রহ করে বেড়াতাম। কলিকাতার সে আগ্রহ ও উদ্দীপনা জীবনেও ভুলব না। যে পথ দিয়েই আমরা অর্থ সংগ্রহে যেতাম, সেখানেই জনতার ভীড় হয়ে যেতো। আমরা গাড়ী থামিয়ে ভিক্ষার ঝুলি মেলে ধরতাম—পথচারীরা আগ্রহ করেই আমাদের সে ভিক্ষার ঝুলি পূর্ণ করে দিত। মুটে মুট নিয়ে যেতে যেতে বোঝা নামিয়ে তার সারাদিনের উপার্জ্জন-লব্ধ অর্থ আমাদের হাতে দিয়ে বলতো, "দেশের কাজের জন্য এটা দেশবন্ধুর কাছে দেবেন।" সমাজের একপাশে পতিতা বারবনিতারাও এগিয়ে এসেছিল এই দান-যজ্ঞে। কাকে বাদ দেব? পিতৃ-দেবের প্রতি জনসাধারণের এই বিশ্বাস ও অন্তরের আকর্ষণ দেখে আমরা আরও উৎসাহিত হয়ে উঠলাম। শুধু কি টাকা? হাজার হাজার জননী-ভগিনীরা তাঁদের অলঙ্কার খুলে দিয়েছিলেন সে

সময়! রমণীর অলঙ্কারপ্রিয়তার একটা বদনাম আছে, কিন্তু ভারতীয় রমণীরা সে সময়ে দেখিয়েছিল যে সঙ্কট মুহূর্ত্তে প্রয়োজন হলে তারা প্রিয় বস্তুও আনন্দের সঙ্গে ত্যাগ করতে কুণ্ঠিত হয় না। যাদের অনেক আছে আমি শুধু তাঁদের কথাই বলছি না। আমরা এমন বধুকেও দেখেছি যার সম্বল শুধু তামার পাতে সোনা বাঁধান শাঁখা—হাতে সে শাঁখা বসে গিয়েছে—তবুও তাই দেবার আগ্রহে সে আকুল হয়ে বলছে, "দিদি, একটু অপেক্ষা করুন, চলে যাবেন না—আমি এখনই যাঁতি দিয়ে কেটে দিচ্ছি।" এ যেন রামচন্দ্রের বাঁধ বাঁধায় কাঠবেড়ালির প্রচেষ্টা, প্রয়োজন খুব কম থাকলেও আগ্রহটাই মনকে স্পর্শ করে। আমাদের কাছে যাঁতি দিয়ে কাটা সেই সোনার শাঁখার কথা শুনে পিতৃদেব অশ্রু-সজল চোখে তা মস্তকে স্পর্শ করে বলেছিলেন তাঁর এক ধনী বন্ধুর নাম করে, "তার দশ হাজার টাকার চেকের চেয়েও এই শাঁখার মূল্য বেশী।"

আমরা প্রতিদিন কত টাকা তুলেছি তা পিতৃদেবকে জানাতে যেতাম এবং যে সব অলঙ্কার আমরা পেতাম তা দেখবার জন্য আপাদমস্তক সে অলঙ্কারে ভূষিত হয়ে মার কাছে যেতাম। প্রথম যেদিন পিতৃদেবকে এই অলঙ্কার দেখাবার জন্য আমরা সজ্জিত হয়ে গিয়েছিলাম—সুভাষচন্দ্র তখন বিস্ময়ে বিস্ফারিত নেত্রে আমাদের দিকে চেয়ে বল্লেন, "একি, কি হলো? গায়ে ব্যাঙ্ক চাপিয়ে এসেছেন যে?" তখন তাকে আমাদের বোঝাতে হলো যে এ না করলে কারাগারের মধ্যে ব্যাঙ্ক আনা সম্ভব নয়।

এই রকমে এক সপ্তাহের মধ্যে আমরা নব্বই হাজার টাকা নগদ ও ট্রাঙ্ক ভর্ত্তি গহনা তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারের জন্য তুলেছিলাম! অবিশ্যি এ অর্থ সংগ্রহের কৃতিত্ব আমাদের কিছুই

নয়, কারণ সমগ্র দেশবাসীই তখন তাদের যথাসর্ব্বস্ব দেশের জন্য বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত হয়েছিল।

কারাগারে গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাজালে জড়িত হয়েও পিতৃদেব তাঁর সাহিত্যালোচনা বা হাসি-তামাসা ছাড়েননি। একদিন সুভাষ-চন্দ্রকে বল্লেন "ওহে সুভাষচন্দ্র, বের হয়েই তোমার একটা বিয়ে দিয়ে দিতে হবে।" সুভাষ হেসে বল্লেন, "আজ্ঞে, আমি কি অপরাধ করেছি?" পিতৃদেব বল্লেন, "না, তোমার কোন অপরাধ নেই, কিন্তু স্বরাজ-ভাণ্ডারে আমার টাকার প্রয়োজন—তা তোমার জন্য নিশ্চয়ই লাখ টাকা পাওয়া যাবে, কি বল?" সুভাষচন্দ্র রক্তিম-আননে সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। কিরণশঙ্কর রায়ও খুব কৌতুক-প্রিয় ছিলেন; তাঁর কৌতুকে পিতৃদেব খুব আনন্দ পেতেন। পিতৃদেব যখন এসব হাসি-তামাসার মধ্যে থাকতেন তখন তাঁহার শিষ্য-সেবকরা ভুলেই যেত যে তারা একজন মহান্ নেতার সঙ্গে কথা বলছে।

জেলে বসেই পিতৃদেব নিজেদের মতামত-প্রকাশের জন্য একটি সংবাদপত্রের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছিলেন। সে সব কল্পনা পরে রূপ পেয়েছিল যখন তিনি "ফরওয়ার্ড" পত্রিকার প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯২১ সালে—১৯ ডিসেম্বর পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য কারাগারে পিতৃদেবের সঙ্গে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের বার্ত্তাবহ হয়ে দেখা করতে এলেন। সেখানে মৌলানা আজাদ, মৌলানা আক্রাম খাঁ প্রভৃতি সমস্ত বন্দীদের নিয়ে একটি আলোচনা হয়। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট-তখন বেশ ভাল করেই বুঝেছিলেন যে সমগ্র মুসলিম-জগত তখন তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে সংকল্প করেছে

এবং ভারতের মুসলমানগণ যাতে তাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত না হতে পারে সে জন্য লর্ড রেডিং কংগ্রেসের সঙ্গে একটা আপোষ রফা করতে বদ্ধপরিকর হয়ে পণ্ডিত মদন মোহন মালব্যকে শান্তিদূতরূপে পাঠালেন। পণ্ডিত মালব্য ১৯২১ সালের আন্দোলন থেকে নিজেকে মুক্ত রেখেছিলেন বলেই বোধ হয় তাঁকে পাঠানই বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট সমীচিন বোধ করলেন। মালব্যজী যুবরাজের আগমন-উপলক্ষে হরতাল বন্ধ করবার অনুরোধ করে বল্লেন—যে সরকার অন্যায়ভাবে কারারুদ্ধ ব্যক্তিদিগকে মুক্তি দিবেন, চণ্ডনীতিমূলক সমস্ত ইস্তাহার প্রত্যাহার করবেন এবং দেশবাসী ও সরকারের মধ্যে বিরোধের কারণ সমূহ আলোচনার জন্য গভর্ণমেণ্ট ও সর্ব্বদলীয় প্রতিনিধিদের এক গোলটেবিল-বৈঠকের (Round Table Conference) আহ্বান করতে প্রস্তুত আছেন যদি পিতৃদেব যুবরাজের আগমন উপলক্ষে হরতাল বন্ধ করেন। এ হরতাল বন্ধ না করলে সেটা হওয়া সম্ভবপর নয় বিশ্বাস করেই তিনি এ কথা বলতে এসেছেন।

সব শুনে পিতৃদেব ও মৌলানা আজাদ সেই দিনই মহাত্মা গান্ধীকে নিম্নলিখিত তার করেন, "আমরা নিম্নলিখিত সর্ত্তে হরতাল বন্ধ করিতে বলি ;—

১। কংগ্রেস কর্তৃক উত্থাপিত সকল বিষয়ের আলোচনার জন্য গভর্ণমেণ্ট শীঘ্রই সভা আহ্বান করিবেন।

২। সরকার সম্প্রতি-প্রকাশিত সকল ইস্তাহার ও আদেশ প্রত্যাহার করিবেন।

৩। নূতন আইনে যাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, তাহাদিগকে বিনাসর্ত্তে মুক্তিদান করা হইবে।

অবিলম্বে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেলে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছে উত্তর দিবেন।" উত্তরে মহাত্মা গান্ধী নিম্নলিখিত তার করেন,—

"কাহাদিগকে সভায় ডাকা হইবে, তাহা যদি পূর্ব্বাহ্ণে স্থির হয় এবং ফতোয়ার জন্য করাচীর দণ্ডিত-ব্যক্তিদিগকে মুক্তি দেওয়া হয়, তবে হরতাল বন্ধ করা যাইতে পারে।"

পিতৃদেবের স্থলে শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী তখন বাংলার নিয়ামক ছিলেন। তিনি মহাত্মাজীকে জানালেন যে বাংলার মতে সভায় আলোচনার সুবিধা গ্রহণ করা সঙ্গত।

মহাত্মার উত্তর আসতে দেরী হলো এবং এতে তিনি খুব একটা আগ্রহও দেখালেন না। তিনি বল্লেন, "সভার ফল সন্তোষজনক না হওয়া পর্য্যন্ত অসহযোগ বন্ধ করা যায়না।" কিন্তু ভারত গভর্ণমেণ্ট এতে রাজী হলেন না। মহাত্মাজীর উত্তরের বিলম্ব দেখে তাঁরা অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন। কিন্তু পরে যখন মহাত্মাজী মত দিলেন তখন ভারত গভর্ণমেণ্ট আর রাজী হলেননা। পিতৃদেবের মতে মহাত্মা এখানে পুনরায় মারাত্মক ভুলই করলেন। রাজনীতিক্ষেত্রে এপর্য্যন্ত এরকম মারাত্মক অনেক ভুলই আমরা করেছি এবং তা করে ব্যর্থমনোরথও হয়েছি। পিতৃদেব সে সময় মহাত্মার এই মারাত্মক ভুলের জন্য কারাগৃহে রোষে, ক্ষোভে ও অন্তর্ব্বেদনায় অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। বলেছিলেন তিনি, "জীবনের এই এক সুবর্ণ-সুযোগ আমরা হারালাম।" এখন তা আমরা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি। যে স্বাধীনতা আজ আমরা পেয়েছি, পিতৃদেবের মতানুসারে সে পথে চললে তেত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেই আমরা অখণ্ড-ভারতে এ স্বাধীনতা পেতে পারতাম।

১৯২১ সালে ২৩শে ও ২৪শে ডিসেম্বরে আমেদাবাদ-কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। এই কংগ্রেসে পিতৃদেব সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি কারারুদ্ধ থাকাতে তাঁর লিখিত অভিভাষণ মহাত্মার আদেশে সরোজিনী নাইডু পাঠ করেন এবং হাকিম আজমল খাঁ সভাপতিত্ব করেন।

আমেদাবাদে সভাপতির অভিভাষণে পিতৃদেব শাসন-সংস্কারে প্রবর্ত্তিত-শাসন-পদ্ধতির বিশদ আলোচনা করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন,—

"কংগ্রেস অসহযোগ-নীতি গ্রহণ করিয়াছেন, যুবরাজের এদেশে আগমনের উৎসবাদি বর্জ্জন করিতে লোককে উপদেশ দিয়াছেন। ইহাকে আইন-ভঙ্গ বলা যায় না। কিন্তু স্বেচ্ছাসেবকের কার্য্য ব্যতীত এই কাজ সম্পন্ন হইতে পারে না। বুরোক্রেসী স্বেচ্ছাসেবক-প্রতিষ্ঠান বে-আইনী ঘোষণা করিয়াছেন। এইরূপে বুরোক্রেসী কংগ্রেসকে আঘাত করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে বুরোক্রেসীই আইন-ভঙ্গ করিয়াছে। যতক্ষণ লোক বক্তৃতায় বা কার্য্যে সাধারণ আইনের বিরোধী কার্য্য না করে, ততক্ষণ তাহাকে সেরূপ কার্য্যের অধিকারে বঞ্চিত করাই আইন-ভঙ্গ করা। সভা যতক্ষণ বে-আইনী না হয়, ততক্ষণ তাহাকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করাই বে-আইনী কার্য্য।" তাঁর এই ভাষণেই তিনি মুক্তির উপায় ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন,

"যে অবস্থায় জাতি তাহার স্বতন্ত্র স্বরাজ লাভ করিতে ও স্বীয় ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে, সেই অবস্থাই স্বাধীনতায় বা মুক্তিলাভে। জগতের ইতিহাসে দেখা যায় বহুজাতি তাহাদের বৈশিষ্ট্য ও জাতীয়তা

অক্ষুণ্ণ রাখিতে অসাধারণ চেষ্টা করিয়াছে। ফিন্‌ল্যাণ্ডে, পোলাণ্ডে, আয়ারল্যাণ্ডে, মিশরে ও ভারতবর্ষে এই চেষ্টা প্রকট। প্রথমে জাতি তাহার শিক্ষা-ব্যবস্থাগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের অর্থাৎ বিদেশী ব্যবস্থার প্রতিবাদ করে; তাহার পর লোক জাতীয়-শিক্ষা চাহে—শেষে বিদেশীর প্রভাব-মুক্ত হইয়া আপনার ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণের বলবতী বাসনা আত্মপ্রকাশ করে।"

আমেদাবাদে কংগ্রেসের মূল-প্রস্তাব ছিল স্বতন্ত্র এবং সমষ্টিগত (mass) সিভিল্ ডিসোবিডিয়েন্স্ ঘোষণা করা এবং গভর্ণমেণ্টের অর্ডিনান্স উপেক্ষা করে স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিবশেষে ভলাণ্টিয়ার-বাহিনীতে যোগ দিয়ে কারাবরণ করতে সকলকে আহ্বান করা। বাঙলা যেমন পিতৃদেবকে তার নিয়ামক করেছিল, বাঙ্গলার পথানুসরণ করে তেমনি এই কংগ্রেসে মহাত্মা গান্ধীকে সমগ্র দেশের নিয়ামক বলে ঘোষণা করা হোল।

—:::(((*))):::—

চট্টগ্রাম প্রাদেশিক সম্মেলন—১৫।১৬ এপ্রিল, ১৯২২
গয়া কংগ্রেস—ডিসেম্বর, ১৯২২

কারাগারে পিতৃদেবের অবস্থান কালে ১৯২২ সালে ১৫ই এবং ১৬ই এপ্রিল চট্টগ্রামে প্রাদেশিক সম্মেলন হয়। মা এই সম্মেলনের সভানেত্রী হয়েছিলেন। যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ছিলেন।

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির ভাষণ সকলেকেই বিস্মিত করেছিল। তাঁরা আরো বিস্মিত হলেন যখন সভানেত্রী কাউন্সিল-প্রবেশ অসহযোগের অঙ্গরূপে ঘোষণা করেন। সকলেই ভাবলেন, "এ শুধু মহাত্মার প্রস্তাবেরই বিরোধীতা নয়, দেশবন্ধুও এমন কথা তো বলেন নি।" কিন্তু তারা জানতেন না যে কারাগার থেকেই পিতৃদেব মাকে এই কাউন্সিল-প্রবেশ-প্রস্তাবের সমর্থন জানিয়েছিলেন এবং কারাগারে সহকর্ম্মীদের নিয়ে এবিষয়ে আলোচনার পর চট্টগ্রাম সম্মেলনে মার মুখ দিয়ে পিতৃদেবই একথা দেশবাসীকে শুনিয়েছিলেন। অনেকে এমনও বলেছিলেন যে কারারুদ্ধ হয়ে পিতৃদেব ভীত হয়ে সহযোগীতার জন্য ব্যস্ত হয়েছেন। এই কাউন্সিল-প্রবেশ নিয়ে পিতৃদেবের সহকর্ম্মী ও বন্ধুদের সঙ্গেও মতভেদ হতে লাগলো।

সভানেত্রীরূপে মাতৃদেবী বলেছিলেন,—

> "কাউন্সিলে প্রবেশ করে আমরা অসহযোগীতা করব। যে পর্য্যন্ত না আমরা নিজ অধিকার-লাভে সক্ষম হই, সে পর্য্যন্ত আমরা কাউন্সিলের ভালমন্দ প্রত্যেক কাজে বাধা দিব।"

এতে অসহযোগ ব্যর্থ হবে এ আশঙ্কাও কেউ কেউ করেছিলেন। কিন্তু কাউন্সিল-প্রবেশ দ্বারা "রিফর্মড্ কাউন্সিল", ভেঙ্গে দেওয়াই ছিল উদ্দেশ্য। গভর্ণমেণ্টের ভাল কাজে সহযোগীতা ও মন্দ কাজে অসহযোগীতা সত্যাগ্রহ-আন্দোলনে যা স্থির হয়েছিল, এখানে সে প্রস্তাব আলোচনা করা ঠিক হবে না কেননা কাউন্সিল-প্রবেশ স্বতন্ত্র একটি জিনিষ। অসহযোগের সঙ্গে কাউন্সিল-প্রবেশকে যারা জড়িত করে দেখেন বা আলোচনা করেন তারা জিনিষটাকে জটিলতার মধ্যেই এনে ফেলেন। "রিফর্ম্মস্"এ দেশের কোন লাভ হয়নি, তা লোকের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার জন্যই এবং আমলাতন্ত্রকে অচল করে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই পিতৃদেব কাউন্সিল-প্রবেশ সমর্থন করেছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন মহাত্মা গান্ধী-প্রবর্ত্তিত অসহযোগ থেকে কাউন্সিলে প্রবেশ করে অসহযোগ অনেক বেশী কার্য্যকরী হবে। ইন্‌ডিপেণ্ডেণ্ট্ ও মডারেটরা চট্টগ্রামের এই কাউন্সিল-প্রবেশ প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন। শুধু আপত্তি ছিল "ভালমন্দ প্রত্যেক কাজে বাধা দিব" একথায়। এইটুকু আপত্তি থাকলেও এতে স্পষ্টই আভাষ পাওয়া গেল যে ইন্‌ডিপেণ্ডেণ্ট্ ও মডারেটরা পিতৃদেবের দিকে কিছুটা এগিয়ে এসেছিল।

কারারুদ্ধ পিতৃদেবের শরীর একেবারেই ভেঙ্গে পড়ল। সুভাষচন্দ্র পিতৃদেবের খুব সেবা করতেন। আমরা যখনি দেখতে যেতাম পিতৃদেব বলতেন "সুভাষ খুব ভাল নার্স"। জেলে মথুর নাম্নীয় একটা ডাকাতকে তিনি ভৃত্যরূপে পেয়েছিলেন। প্রথমে মথুরকে দেখে ভয় হয়েছিল; কিন্তু পিতৃদেবের কাজ সে এমন মমতার সঙ্গে করতো যে এরকম আর কাউকে দেখিনি। তাঁর উপর মথুরের শাসন ও আবদার দুই-ই সমানে চলতো। ধমকেই সে পিতৃদেবকে সময়মত স্নান

করাতো। তার আচরণে একটুও মনে হতো না যে সে মাত্র ক'মাস বাবার সঙ্গে রয়েছে। তাকে একদিন পিতৃদেব বল্লেন, "আমিতো আর ক'দিন পরই জেল থেকে বের হব—তোরও তো আর বেশী দিন নেই— তুই ছাড়া পেয়ে আমার বাড়ী আসিস্— আমার কাছেই থাকবি, বুঝলি?" পিতৃদেবের একথা শুনে আমরা প্রমাদ গনলাম, ভাবলাম কি করে তিনি একজন খুনী ডাকাতকে বাড়ী নেবার কথা বলছেন? মথুরের অনুপস্থিতিতে পিতৃদেব মাকে বল্লেন, "ও ডাকাত বলেই কি ওকে চিরকালের জন্য ডাকাতি করতে হবে? আমরা যদি ওকে বিশ্বাস করে আমাদের বাড়ীতে কাজ করবার সুযোগ দেই—ভালভাবে থেকে খেতে পরতে পেলে ও কেন ডাকাতী করবে?" মা বল্লেন, "যা ভাল বোঝ কর, কিন্তু একটা কথা আছে 'স্বভাব যায় না মৈলে' জানতো? ওতো একবারই ডাকাতী করেনি বার বার ডাকাতী করেছে—তাতো ও নিজেই বলে।" যাই হোক, বাড়ীতে মথুরের আগমনের সম্ভাবনায় আমরা তেমন খুসী হতে পারলাম না।

যতই পিতৃদেবের মুক্তির দিন আসন্ন হতে লাগলো, জেলের মধ্যে তাঁর অন্যান্য সহকর্ম্মীরা ততই ম্রিয়মান হয়ে পড়লেন। হেমেন্দ্র-বাবু আমাদের বলেছিলেন, "যেদিন মেজর সেলিসবারি এসে দেশবন্ধুকে বল্লেন যে তিনি মুক্ত এবং ভোগ্বল গাড়ী নিয়ে তৈরী হয়ে আছে—সেদিন তাঁর মুক্তির জন্য আনন্দ হলেও আমাদের মনে হলো মেজর সেলিসবারী তাঁকে যেন আমাদের কাছ থেকে বন্দী করেই নিয়ে গেলেন—তাঁর অভাবে কারাবাস আমাদের সকলের অসহ্য হয়ে উঠলো।"

ক্রমে পিতৃদেবের মুক্তি-লাভের দিন এসে গেল। বেবীর বিবাহের ঠিক সাত দিন পূর্ব্বে ৯ই আগষ্ট তিনি জেল থেকে মুক্ত

হলেন। ১৭ই আগষ্ট ১৯২২ সালে কর্ণেল উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র ভাস্করানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে বেবীর বিবাহ হয়। সংবাদপত্রে বের হলো—"সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের দৌহীত্রের সহিত চিত্তরঞ্জন দাশের কন্যার বিবাহ।" এ নিয়ে সুরেন্দ্রনাথ ও পিতৃদেবকে জড়িত করে অনেক রঙ্গ-কৌতুকের অবতারণা হয়েছিল তখনকার সংবাদপত্রে।

পিতৃদেবের মুক্তির খবর বাইরে আগে জানানো হয়নি, হয়তো গভর্ণমেণ্ট আশঙ্কা করেছিলেন যে তাঁকে নিতে জেলের বাইরে অসম্ভব ভীড় হবে। ৯ই আগষ্ট রাত্রিবেলা বাবা বাড়ী এলেন।

তড়িৎবার্ত্তার মত তাঁর মুক্তির সংবাদ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। দেখতে দেখেত রসারোডের বাড়ী জনসমুদ্রে পরিণত হলো।

জেলে থাকতে পিতৃদেব একদিনও দাড়ী কামাবার হেঙ্গাম করেননি—বল্লেন, "ছুটির সময় আবার দাড়ী কামান কি?" পরদিনই তাঁকে আমরা বল্লাম, "এখনতো ছুটি ফুরিয়ে গেছে, এবার দাড়ী কামাতেই হবে—ওই জঙ্গলে পূর্ণ মুখ আমরা একেবারেই দেখতে রাজী নই।" বাবা পরম-স্নেহে দাড়ীতে হাত বুলাতে বুলাতে বল্লেন, "আহা! আমার এতদিনের সাথী!"

জেল থেকে মুক্তি পেলেন কিন্তু রোগ থেকে মুক্তি পেলেন না। অত্যন্ত ক্ষীণ স্বাস্থ্য নিয়েই তিনি এলেন। তখনও রোজ বিকেলে তাঁর অল্প অল্প জ্বর হতো। শরীর একেবারেই রক্তশূন্য হয়ে গিয়েছিল। আমরা স্থির করলাম, ১৭ই আগষ্ট বেবীর বিবাহ হয়ে গেলেই বাবাকে নিয়ে বায়ু-পরিবর্ত্তনে যাব।

এই সময়ে মতিলাল নেহেরু সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স এনকোয়ারী কমিটির সভ্যগণসহ পাটনাতে ছিলেন। বাবার নিমন্ত্রণে

তাঁরা সকলেই বেবীর বিবাহে যোগদান করতে এসেছিলেন। বেবীর বিবাহও হিন্দু শাস্ত্রানুসারে রেজিষ্ট্রেশন্ ছাড়াই হয়েছিল।

বেবীর বিয়ের পর জনসাধারণ হরিশ পার্কে বাবাকে অভিনন্দন প্রদান করেন। কলিকাতার ছাত্রসমিতিও এক পৃথক-সভায় তাঁকে অভিনন্দিত করেছিল। ছাত্রদের সভায় পিতৃদেব কেঁদে ফেলেছিলেন। তিনি যখন ছাত্রদের কষ্ট, লাঞ্ছনা ও ত্যাগের কথা বলছিলেন তখন চোখের জলে তাঁর বুক ভেসে গিয়েছিল। চিরকালই দেখেছি ছাত্র-সমাজের প্রতি তাঁর অন্তরের একটা বিশেষ আকর্ষণ। হাইকোর্টে ছুটি হলে আমার স্বামী ও আমরা সকলে একসঙ্গেই কাশ্মীর যাব স্থির হলো। কিন্তু এখনো ছুটি হতে কিছুদিন বাকী তাই পিতৃদেব ২৬শে আগষ্ট কয়েকদিনের জন্য দার্জিলীং বেড়াতে গেলেন। এই দার্জিলীং এর প্রীতি তাঁর বিশেষ টান ছিল, হয়তো সব সময়ই তাঁর মনে হতো কাকামণির কথা। পিতৃদেবের দার্জিলীং-প্রীতির জন্য আমরা অনেকবার সেখানে গিয়েছি। কোনদিন কখনো আমরা ভাবিনি যে এই দার্জিলীং-এর কোলে মাথা রেখেই একদিন পিতৃদেব চিরনিদ্রিত হবেন।

দার্জিলীং-এ দিন-পনের থেকে তিনি কলিকাতায় এলেন। কোর্ট বন্ধ হলেই আমরা ১৬ই সেপ্টেম্বর কাশ্মীর যাত্রা করলাম। কলিকাতা থেকে বাবা, মা, মেজমামা মহিন্দ্রনাথ হালদার (মার জ্যেঠতুতো ভাই), আমি ও আমার শিশুপুত্র সিদ্ধার্থ কাশ্মীরের যাত্রী হলাম। স্থির হলো কাকা (প্রফুল্ল রঞ্জন) ও খুড়ীমা পাটনা থেকে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন।

গাড়ীতে উঠে সিদ্ধার্থের আনন্দ আর ধরেনা! সে বাবার কোলে বসে তাঁর ফুলের মালা সব নিজের গলায় পরে, এটা কি?

ওটা কি?—প্রশ্নে বাবাকে ব্যস্ত করে তুললো। বাবা ওকে নিয়ে আমোদ-আহ্লাদ করলেও তাঁর 'দিদিমণি' অদিতি (ভোম্বলের মেয়ে) সঙ্গে না থাকাতে তাঁর মন বিষণ্ণ হয়েছিল। ভোম্বল, সুজাতা ও কন্যাকে নিয়ে পাবনা হেমায়েৎপুর-আশ্রমে শ্রীঅনুকূল ঠাকুরের কাছে গিয়েছিল। পাটনা থেকে কাকা ও খুড়ীমা এসে উঠলেন।

পিতৃদেব যাচ্ছেন, খবরের কাগজে এ সংবাদ পেয়ে প্রত্যেক ষ্টেশনে জনসমাগম জীবনেও ভুলবোনা। গভীর রাত্রেও ষ্টেশনে বাবাকে অভ্যর্থনা করতে জনতার বিপুল সমাবেশ হতে লাগলো। ফুল, মিষ্টি ও দুধে আমাদের গাড়ী ভরে গেল। প্রত্যেক ষ্টেশনেই বাবা যখন সমাগত জনতাকে উদ্দেশ করে কিছু না কিছু বলছিলেন, তখন মান্তু (সিদ্ধার্থ) অতি নিবিষ্ট-মনেই তার দাদুকে দেখছিল। এলাহাবাদে গাড়ী থামলে বিপুল জনতা দেখে মান্তু দৌড়ে জানলার কাছে গিয়ে বাবার সঙ্গে সঙ্গে কথা সুরু করে দিল। তার কথা ছিল 'মালা দাও'। বাবা তাড়াতাড়ি ওকে কোলে নিয়ে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।

ট্রেনে সারা-পথ এ ভাবে যেতে যেতে তিন দিনের দিন আমরা রাওলপিণ্ডি পৌছালাম। রাওলপিণ্ডি থেকে মোটরে কাশ্মীরে যেতে হয়।

প্রথমেই আমরা 'মারী' তে এলাম। সেখানে ডাক-বাঙ্গলোতে বিশ্রামাদি করে আবার পথ-চলা সুরু হলো। এমন অভিনব পার্ব্বত্য মোটরের রাস্তা খুব কমই দেখা যায়। এক এক জায়গা দিয়ে তো যেতে ভয়ই হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, কোন রকমে যদি গাড়ী একটু বেঁকে যায়, তাহলে কোন্ অতলে গিয়ে না জানি চিরবিশ্রাম নিতে হবে।

মোটর দ্রুতগতিতে চলেছে সর্পিল-পথ দিয়ে। নীচে পার্ব্বত্য-নদী যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে পাল্লাদিয়েই চলেছে আমাদের সঙ্গে আর সন্মুখে তুষার-কিরীটি পর্ব্বত-শ্রেণী দণ্ডায়মান। প্রকৃতির শোভা দেখতে দেখতে বাবা তন্ময় হয়ে গেলেন। শারীরিক দুর্ব্বলতা তিনি ভুলে গেলেন। বাবার উৎফুল্ল আনন দেখে মনে করলাম, কাশ্মীরের পথে যেতেই যখন এত উৎফুল্ল ভাব, না জানি 'ভূস্বর্গে' উপনীত হয়ে কি করবেন!

মারী থেকে আমরা কোহালায় এসে উপনীত হলাম। সেখানে রাত্রিবাস করতে হবে। রাত্রেই পিতৃদেবের ভীষণ জ্বর এলো। জ্বরের তাপ দেখে আমরা খুব শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। কিন্তু অত জ্বরেও বাবার মনের প্রফুল্লতা কিছুমাত্র কমেনি,বল্লেন, "কিছু ভেবনা তোমরা, এমন দেশে কি অসুখ থাকতে পারে?" অত জ্বর দেখে আমরা প্রথমে ঠিক করেছিলাম, সেখানে দু'দিন বিশ্রাম করবো। কিন্তু আমার স্বামী খবর নিয়ে এসে জানালেন যে জায়গাটি ভয়ানক ম্যালেরিয়ায় পূর্ণ। শুনে, বাবার জ্বর নিয়েই আমরা তার পরদিনই সকালে ওখান থেকে রওনা হলাম। এরপর উড়ী বলে পরবর্ত্তী বিশ্রাম-কেন্দ্রে এলাম। এখানে এসে দেখি যে ডাক-বাঙ্গলো আগে থেকেই ইংরেজ-যাত্রীরা দখল করে বসে আছে। আমরা কি করব ভাবছি, তখন ডাক-বাঙ্গলোর একজন রক্ষক আমাদের বল্লে, একটু নীচে নামলেই পি, ডব্লিউ, ডি'র একটি বাঙ্গলো আছে। আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সেই ডাক বাঙ্গালোর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। বাঙ্গলোর একটু দূরে আমাদের মোটর থেকে নামতে হলো, কিন্তু ডাক-বাঙ্গলোর কাছে এসে আমাদের সমস্ত পথ-পরিশ্রম সার্থক হয়ে গেল। এমন মনোরম দৃশ্য আর কোথাও আছে কিনা জানিনা—পাহাড়, নদী, বরফ এই তিনের সংযোগে মনে হচ্ছিল যেন স্বর্গেই পৌঁছে গেছি। প্রশস্ত বারান্দায় বাবাকে

বিছানা করে দেওয়া হলো! স্বভাবের অদ্ভুত শোভা দেখতে দেখতে আমরা তন্ময় হয়ে গেলাম। বাগান থেকে পেয়ারা এনে আমাদের বৈকালিক জলযোগ খুব মনের মতই হলো। এমন করে গাছ থেকে টাট্‌কা ফল তুলে খাওয়া তো সহজে হয় না। বাবা এখানে অনেক সুস্থ বোধ করতে লাগলেন। আমাদের বাঙ্গলোর নীচেই নদী— সেখানকার লোকেরা বলতো আঁকাশ-গঙ্গা। মা, আমার স্বামী, মেজমামা ও আমি সেই আকাশ-গঙ্গায় স্নানের লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। মা অবশ্য অত ঠাণ্ডাজলে বাবাকে স্নান করতে দিতে রাজী হলেন না। আকাশ-গঙ্গায় স্নান করতে নেবেই কিন্তু আমাদের স্বর্গে চলে যাবার অবস্থা হয়েছিল। বরফ-গলানো জলও বোধ হয় এর মত ঠাণ্ডা কিনা জানি না। নেমে স্রোতের মধ্যে পাথরে বসে পড়েই আমাদের আর নড়বার ক্ষমতা রইল না। সব অবশ হয়ে গেল। জল থেকে উঠে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বুঝতে পারিনি, আমাদের গরম লাগছে না শীত করছে। এ রকম অভিজ্ঞতা পূর্ব্বে কখনো হয়নি।

এখান থেকে আমরা 'গাড়ী' বলে একটি জায়গায় সন্ধ্যেবেলা এসে রাত কাটালাম। পরের দিন ভোরে কাশ্মীর রাজ্যের প্রবেশ-তোরণ 'বরামুলা' এলাম। সেখানে একটু বিশ্রাম করে শ্রীনগর যাবার ব্যবস্থা হয়েছিল। বরামুলায় বাবার জ্বর খুব বেড়ে গেল—১০৫°। দেখে আমরা সকলে অস্থির হয়ে গেলাম। কি করব ভাবছি, এমন সময় দুই তিন খানা মোটরে করে কাশ্মীর রাজ্যের পুলিশের ডেপুটী সুপারিণ্‌টেণ্ডেন্ট সঙ্গীসহ এসে উপস্থিত। বাবার তখন ভীষণ জ্বর। জ্বরের প্রাবল্যে তাঁর অবসন্ন দেহ দেখেও তারা বল্লেন, "কাশ্মীর রাজ্যে প্রবেশ করবার আগে আপনাকে প্রতিশ্রুতি-পত্র স্বাক্ষর করতে হবে যে আপনি সেখানে কোন রাজনৈতিক সংশ্রবে লিপ্ত হবেন না।" এই প্রতিশ্রুতিপত্র স্বাক্ষর করলে পিতৃদেব সসম্মানে কাশ্মীর রাজ-প্রাসাদেই

অতিথিরূপে থাকতে পারবেন, একথা বিনয়পূর্ব্বক বলতে অবশ্য ছাড়লো না। এই সম্মান-প্রদর্শনের জন্য পিতৃদেব তাদের বহু ধন্যবাদ দিলেন। প্রতিশ্রুতিপত্র স্বাক্ষর করে নিজেদের দেশে প্রবেশ করবার অনুমতি নিতে বাবা অস্বীকার করলেন। তারাও বহু দুঃখ জানিয়ে বল্লে যে তাহলে পিতৃদেবের শ্রীনগরে যাওয়া চলবে না। পিতৃদেব তখুনি ফিরবার ব্যবস্থা করতে বল্লেন। আমরা দুশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়লাম এই ভেবে যে ১০৫° ডিগ্রী জ্বরগ্রস্ত পীড়িত ব্যক্তিকে নিয়ে এত দূর-পথ কেমন করে ফিরব। কাশ্মীরাধিপতি তাঁর ইংরেজ-রেসিডেন্ট দ্বারা এই ভাবেই একজন বরেণ্য ভারতীয়কে অভ্যর্থনা জানাতে বাধ্য হলেন। আমাদের বাঙ্গলাদেশে কিন্তু অতিথিকে নারায়ণ-জ্ঞানেই সম্মান করা হয়, তা সে যে অবস্থাতে এবং যখনই আসুন না কেন। কাশ্মীরে কিন্তু তার বিপরীত আচরণই দেখতে পেলাম পিতৃদেবের ব্যাপারে। পরবর্ত্তী কালেও বন্দী শ্যামাপ্রসাদের প্রতি তাদের আচরণ কারো অবিদিত নেই।

পীড়িত পিতৃদেবকে নিয়ে নিতান্ত চিন্তিত মনে আমরা বরামূলা ত্যাগ করলাম। 'ভূস্বর্গ' কাশ্মীরের রাজধানীতে পিতৃদেবের আর প্রবেশ করা হোল না।

ফিরবার পথে কিন্তু উড়ীতে সেই পি, ডব্লিউ, ডি'র বাঙ্গলোতে অদ্ভূত ঘটনা ঘটেছিল। বাঙ্গলোর দোরে আমরা যখন মোটর থেকে নামছি তখন একজন সন্ন্যাসী সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি পিতৃদেবের কাছে গিয়ে তাঁকে একটি তামার মাদুলী দিয়ে হিন্দিতে বল্লেন, "বেটা এটা তুমি হাতে সর্ব্বদা পোরো—কখনো যেন হারিয়ে না যায়—তোমার শরীর ভাল হয়ে যাবে।" এই বলে তিনি আর কাল বিলম্ব না করে চলে গেলেন,—পরিবর্ত্তে তিনি কোন কিছুই প্রত্যাশা

করেননি। পিতৃদেবের সাধু-সন্ন্যাসী-প্রীতি খুব ছিল, তাই তিনি খুব বিশ্বাস করেই সে মাতুলী ধারণ করেছিলেন। আমরা কিন্তু বিশ্বাস না করলেও "দেখিনা কি হয়," এই ভেবে চুপ করে রইলাম।

মাতুলীর কোন শক্তি ছিল কিনা জানিনা, কিন্তু পিতৃদেবের জ্বর সত্যি কমতে আরম্ভ করলো। যখন আমরা মারীতে এসে পৌঁছালাম, তখন এতদিনের জ্বর তাঁকে প্রায় ত্যাগ করলো। তাঁর শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়ে পড়াতে আমরা মারীতে বাড়ী নিয়ে থাকবার ব্যবস্থা করলাম। সে সময় অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির এসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী ছিলেন শ্রীরাজারাম। তিনি সংবাদপত্রে কাশ্মীর থেকে পিতৃদেবের ফিরে আসবার কথা দেখেছিলেন- তাই মারীতে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে থাকবার-বাড়ী ঠিক করে দিলেন।

লোকমুখে এবং সংবাদপত্রে পিতৃদেবের মারীতে থাকবার বার্ত্তা পেয়ে ক্রমে ক্রমে আমাদের বাড়ীতে লোকজনের ভীড় বাড়তে আরম্ভ করলো।

পিতৃদেব মারীতে দিন দিন সুস্থ হয়ে উঠতে লাগলেন। কাশ্মীর যেতে পারলেন না বলে প্রায়ই হাসি-তামাসা করে আমার মেজমামাকে বলতেন "এই কালো বামুণ সঙ্গে থাকাতেই তো স্বর্গ-সুখ থেকে আমরা বঞ্চিত হলাম।" যা হোক মারী থেকে হিমালয়ের সৌন্দর্য্য তিনি মন-প্রাণ দিয়েই উপভোগ করেছিলেন।

সন্ধ্যেবেলা এখানে বাবার ও আমার স্বামীর সঙ্গে কাউন্সিল-প্রবেশ নিয়ে অনেক আলোচনা হতো। কারণ পণ্ডিত মতিলালের স্বাক্ষরিত-রিপোর্ট প্রকাশ হওয়াতে চারিদিকে কাউন্সিল-প্রবেশ-আলোচনা তখন আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল।

লাহোর থেকে ডাক্তার গোপীচাঁদ পিতৃদেবকে বিশেষ অনুরোধ করে পাঠালেন—ফিরবার পথে লাহোরে বক্তৃতা দিয়ে যাবার জন্যে।

এই চিঠি পেয়ে পিতৃদেব তাঁর কার্য্য প্রণালী ঠিক করে ফেল্লেন। আমার স্বামীকে বল্লেন "এক কাজ করা যাক—ফিরবার পথে এমন ব্যবস্থা কর যাতে শুধু লাহোর নয়—যাতে আমি যতটা সম্ভব সব জায়গাতেই এই কাউন্সিল প্রবেশ-প্রস্তাব আলোচনা করতে করতে যেতে পারি।" কোথা দিয়ে কি ভাবে গিয়েছিলাম তা সঠিক আজ আমার মনে নেই- কিন্তু মনে আছে যে প্রায় -পনের ষোল দিন আমরা ট্রেণে ট্রেণে ঘুরেছি। তখন যদি ডায়েরী রাখতাম তবে তারিখ দিয়ে আজ সবই গুছিয়ে লিখতে কোন অসুবিধাই হতোনা। সে সুযোগ আর আসবে না বলে আজ আমার অনুতাপের সীমা নেই। তবে মনে আছে যে লাহোর, আগ্রা, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, অম্বালা, অমৃতসর, এলাহাবাদ, কাণপুর, দেরাদুন হয়ে মধ্যপ্রদেশে বুলডানা কনফারেন্সে উপস্থিত হলাম। কাকা ও খুড়ীমা পাটনাতে আগেই ফিরে গিয়েছিলেন।

১লা নবেম্বর দেরাদুনে পিতৃদেব বিপিনচন্দ্র পালের বরিশালের কথাই মেনে নিয়ে বল্লেন, "কংগ্রেসের কর্ত্তব্য দেশকে জানানো যে কি রকমের গভর্ণমেণ্ট আমরা চাই। "It is the duty of the congress, therefore, to place before the country a clear statement of the system of government which we demand." তারপর বল্লেন "বুরোক্রেসী এই 'রিফর্ম'ড্ কাউন্সিলে' মুখোস পড়ে আছে, এই মুখোস ছিড়েফেলাই আমি আমাদের কর্ত্তব্য মনে করি। "(The reformed councils are really a mask which the bureaucracy has put on. I conceive it to be

our duty to tear this mask from off their face") আরো জোরের সঙ্গে বল্লেন, "আমি বুর্জ্জোয়াদের জন্য স্বরাজ চাই না, সংখ্যায় তারা ক'জন? আমি অগণন জনসঙ্ঘের জন্য স্বরাজ চাই, তারাই স্বরাজ অর্জ্জন করবে" (I want Swaraj for the masses and not for the classes. I do not care for the bourgeoisie. How few are they? Swaraj must be for the masses and must be won by the masses.)

এরপর যত জায়গায় তিনি বক্তৃতা করেছিলেন, প্রত্যেক জায়গায় তাঁর বক্তৃতায় একই সুর ধ্বনিত হয়েছিল, বুরোক্রেসীর মুখোস ছিড়ে তার স্বরূপ-মূর্ত্তি দেশকে দেখাবার জন্যই তিনি কাউন্সিল-প্রবেশের প্রয়োজনীয়তা দেশবাসীকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন। এই পরিবর্ত্তিত মতবাদ নিয়ে পিতৃদেব পরবর্ত্তী চারিটি কংগ্রেসের ইতিহাসকে আলোড়িত ও পরিবর্ত্তিত করেন। মহাত্মার সঙ্গে তাঁর মতবিরোধও দেখা দেয়। কংগ্রেসের ইতিহাস থেকে এই মতবিরোধ মুছে ফেলবার নয়।

এই সব জায়গাতেই দুইএক দিন করে আমাদের গাড়ী কেটে রাখা হতো। প্রাদেশিক নেতৃগণের আলোচনা আমাদের গাড়ীরই বসবার ঘরে হতো। যখনি যেখানে আমাদের গাড়ী কেটে রাখা হোতো সেখানেই প্রাদেশিক কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকেরা এসে দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে আমাদের সুখ-সুবিধা দেখতেন।

দীর্ঘকাল ট্রেণ ভ্রমণের পর আমরা ক্লান্ত হয়ে অমরাবতীতে বেবীর বাড়ীতে এসে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেল্লাম।

অমরাবতীতে আমরা যেদিন পৌঁছালাম, সেদিনকার মিটিংএ পিতৃদেব মামুকে সঙ্গে নিলেন। বক্তৃতার পর যেমনি তিনি বসেছেন,

মান্নু অমনি দাঁড়িয়ে উঠে—বক্তৃতা করবার ভঙ্গীতে, 'আমার মালা' বলে পিতৃদেবের মালা টেনে পরবার প্রয়াস পেতেই সভামধ্যে তুমুল হাস্যধ্বনি পড়ে গেল। পিতৃদেব তাড়াতাড়ি নিজের মালা তার গলায় পরিয়ে দিতেই মান্নু তার অভিধানের ভাষায় কথা বলে বসে পড়লো। পিতৃদেব মান্নুকে কোলে নিয়ে আমাকে বল্লেন, "তোর ছেলে দেখছি বক্তা না হয়ে যাবে না।" দেখেছি, যখনি পিতৃদেব মান্নুকে নিয়ে আমোদ-আহ্লাদ করতেন, তখনি তাঁর দিদিমণি ভোম্বলের মেয়ে মিন্নুর অনুপস্থিতি বোধ করতেন।

এরপরই আসন্ন গয়া-কংগ্রেসে সভাপতি হতে হবে বলে পিতৃদেব সব জায়গাতেই খুব বড় বক্তৃতা দেননি। বলা বাহুল্য, তার বক্তৃতার মুখ্য-উদ্দেশ্য ছিল কাউন্সিল-প্রবেশ।

এই রকম ভাবে সব জায়গা ঘুরে অমরাবতী থেকে আমরা ১০ই নভেম্বর কলিকাতা ফিরে এলাম। বেবীর শরীর অসুস্থ থাকাতে মা তাকে সঙ্গে নিয়ে এলেন।

কলিকাতা এসে দেখি ভোম্বল, সুজাতা, মীনু পাবনা থেকে ফিরে এসেছে। মীনুকে পেয়ে পিতৃদেবের আনন্দের সীমা রইল না।

ইতিমধ্যে পিতৃদেবের সেণ্ট্রাল্ জেলের সঙ্গী ভৃত্য-মথুর কারামুক্ত হয়ে পূর্ব্ব-কথা-অনুসারে আমাদের বাড়ী এসে উপস্থিত। আমরা জলজ্যান্ত একজন ডাকাতের আবির্ভাবে সত্যই খুব পুলকিত হইনি।

মথুর যখন তার ডাকাতির গল্প বলতো, আমরা তা শুনে ভয়ে কাঁটা হয়ে যেতাম। কেমন করে গভীর রাত্রে ডাকাতি করতে গিয়ে

কিশোরী বধূর গলা থেকে কিভাবে সে হার খুলে নিয়েছিল, ভয়ার্তা বধূটি চিৎকার করবার উপক্রম করলে, কেমন করে তার জিব টেনে বার করেছিল—এসব ব্যাপার সে বিশদভাবে অবলীলাক্রমে বর্ণনা করে যেতো। আর আমরা ভাবতাম এদাগী ডাকাতকে পিতৃদেব কি করে বিশ্বাস করে আসতে বল্লেন।

পিতৃদেবের সেবায় মথুরের ব্যবহার দেখে কিন্তু মনেও হতোনা যে কোনদিন কোনরকম নৃশংস ব্যবহার কারো প্রতি কখনো সে করেছে। পিতৃদেবের উপর তার যে জোর খাটাতে দেখেছি, আমরাও অতটা করতে সাহস পাইনি। লোকজন-পরিবৃত হয়ে বাবা যখন গভীর আলোচনায় মগ্ন, মথুর তখন অনায়াসে গিয়ে বলতো "বাবা! আর গল্প করতে হবেনা, অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে, এবার উঠুন স্নানের জল তৈয়ার।" শুধু এই নয়, সমবেত লোকদের সে বলে বসতো, "আপনারা কি বাবাকে নাওয়া খাওয়া করতে দিবেন না? এবার আপনারা উঠুন্।" পিতৃদেবের মৃদু ভৎ'সনায় সে কর্ণপাতও করতো না। সে বলতো "অনেক কষ্টে বাবা পেয়ে কি তাকে মরতে দেব নাকি?" পিতৃদেব তার কথা শুনে হেসে ফেলতেন। সে যখন আরম্ভ করতো— "বাবা আর আমি যখন জেলে—" তখন তার কথায় আমাদের ধৈর্য্য-চ্যুতি হতো—যেন একই কারণে দুজনের কারাবাস হয়েছিল আর কি! কিন্তু পিতৃদেব ওকে এতই স্নেহ করতেন যে আমরা ওকে কিছু বলে তাঁর মনে কষ্ট দিতে চাইতাম না। আমাদের মনোভাব বুঝে বাবা বলতেন "ওকে স্নেহ-ভালবাসা দিয়েই আমাদের জয় করতে হবে। জীবনে ও লোকের কাছে পেয়েছে শুধু অবিশ্বাস আর ঘৃণা। শুধু শুধু ও আজ ডাকাত নাম পায়নি, পেটের জ্বালাতেই ও এপথে নেমেছিল। ও নিশ্চয়ই শুধরে যাবে আমি জানি।" আমরা কিন্তু এতে নিশ্চিন্ত হতে পারতাম না।

এসময় আমার স্বামী কর্ম্মোপলক্ষে কয়েকদিনের জন্য মফঃস্বলে গিয়েছিলেন। রোজ-রাত্রে আমি গিয়ে বাবার সঙ্গে আহার করতাম। খাওয়া-দাওয়া ও গল্প-আলোচনায় কোন কোন দিন গভীর রাত্রি হয়ে যেতো। রসারোডের কোলাহলপূর্ণ বাড়ীতে আমি শিশুপুত্র নিয়ে থাকতে চাইতাম না, তাই খাওয়ার সময় রোজ রাত্রে যেতাম। বাড়ী ফিরবার সময় হেঁটেই আসতাম। কোনদিন সত্যেনবাবু, কোনদিন ভোম্বল বা অন্য কেউ আমাকে পৌঁছে দিত।

একদিন রাত্রে কেউ পৌঁছে দেবার না থাকাতে, পিতৃদেব বলে বসলেন, "মথুর! বড়দিমণিকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আয়।" একথা শুনে আমার তখনকার অবস্থা অবর্ণনীয়। ভাগ্যিস্, আমরা তখন গহনা পরতাম না, তাই যা ভরসা; একবার ভাবলাম "কি করবে ও? গহনা তো কিছু নেই।" তবুও দুরু দুরু বক্ষ নিয়েই রওয়ানা হলাম ওর সঙ্গে। রাস্তাতে এসে চারিদিকের নির্জ্জনতায় আমার ভয় বেড়েই চল্ল। আমার পিছনে মথুর তখন অনর্গল তার ডাকাতির অভিজ্ঞতা বলতে বলতে আসছে; আর আমি কাষ্ঠ-হাসি হেসে তার কথা শুনতে শুনতে চলেছি। হঠাৎ মথুর বলে উঠলে "বড়দিমণি, এসব শুনে আপনার ভয় করছে—না? আমরা সব বুঝতে পারি; তা দিদিমণি! আপনাদের কোন ভয় নেই, বাবা আমার সাক্ষাৎ দেবতা, আমাকে বুকে তুলে নিয়ে পুলিশের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। না হলে কোন অপরাধ না করলেও, দাগী আসামী বলেই, কোন চুরি ডাকাতি হলেই আমায় এতদিনে ধরে নিয়ে যেত। বাবার আশ্রয়ে আছি বলে এখনো ধরেনি। এখন বাবার ঘরে ঠাঁই পেয়েছি আর কোন ভয় নেই। আমার জীবন থাকতে আপনাদের কেউ কেশ-স্পর্শ করতে পারবে না।"—বলে সে আকুল হয়ে উঠতো। তার আশ্বাসবাক্য সত্ত্বেও বাড়ী পৌঁছে কিন্তু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেই বাঁচলাম।

এই মথুর কিন্তু "স্বভাব যায় না মলে" কথাটি পরে সার্থক করলো। পিতৃদেবের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে একদিন সে অন্তর্দ্ধান করল। তারপরই দেখা গেল এক বাক্স রূপোর বাসনও সেই সঙ্গে অন্তর্হিত। পিতৃদেব কিন্তু কিছুতেই মথুরকে এর সঙ্গে জড়িত করতে চাইতেন না। তিনি বলতেন, "ওই নিয়েছে তার প্রমাণ কি? ওর দাগী-চোর-মার্কার সুযোগ নিয়ে অন্য কেউ তো একাজ করতে পারে? হয়তো বা কোথায় মোটর-চাপাই পরেছে কি না কে জানে! বেচারা চোর নাম আর ঘুচাতে পারল না!" 'বেচারার' সম্বন্ধে পিতৃদেবের সঙ্গে আমরা কিন্তু একেবারেই একমত হতে পারতাম না। মথুর আজ আছে কি নেই তা জানি না। তার বহু ভাগ্যফলে সে যে মানুষের আশ্রয় ও স্নেহ পেয়েছিল তা জগতে দুর্লভ। আশাকরি পিতৃদেবের আশীর্ব্বাদ ও স্নেহ তাকে সৎপথে পরিচালিত করেছে।

১৯২২ সালে ডিসেম্বরে গয়ায় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। পিতৃদেব এই কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। এই নিয়ে দুই দুইবার জাতীয়-কংগ্রেস পিতৃদেবকে শ্রেষ্ঠ-সম্মানে সম্মানিত করেছিল। অবশ্য, এ সম্মান অনায়াস-লব্ধ নয়, বহু ত্যাগের পর যোগ্য-প্রাপ্তি। কাউন্সিলে প্রবেশ করে গভর্ণমেণ্টের সব কাজে বাধা দিয়ে কাউন্সিল ধ্বংশ করার প্রস্তাব নিয়ে তিনি অধিবেশনে অবতীর্ণ হলেন। সমস্ত বক্তৃতার মধ্যেই তাঁর এই সুর ধ্বনিত হয়েছিল। তাঁর এই সুচিন্তিত অভিমত এই প্রথম নয়। প্রথমে চট্টগ্রামে মাতৃদেবীর দ্বারা পরে দেরাদুন ও অন্যান্য জায়গায়ও তিনি ব্যক্ত করেছিলেন। কিন্তু হলে কি হবে? এতবড় একটা বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন সমস্ত দেশে একদিনে গ্রহণ করানোর অনেক বাধা ছিল। তাই কাউন্সিল-প্রবেশ কংগ্রেস সমর্থন করলেন না। তিনি পরাজিত হলেন।

পিতৃদেবের জীবনে সে এক চরম-মুহূর্ত্ত। পরাজয় স্বীকার করে পিছিয়ে পরবার তিনি পাত্র ছিলেন না।

কংগ্রেসের সভাপতি-রূপে দাঁড়িয়ে উঠে তিনি বল্লেন, "আজ আমি পরাজিত হয়েছি সত্য, কিন্তু একদিন একবৎসরের মধ্যেই কংগ্রেসকে আমার মতে আনয়ন করব।'

> Although to day I differ from the majority of the members, I have not given up the hope that a day will come when I shall get the majority on my side"

মহাত্মা গান্ধী তখনো কারারুদ্ধ। কেউ কেউ ইঙ্গিত করলেন, "দেশবন্ধু, মহাত্মা গান্ধীব কারারুদ্ধ অবস্থার সুযোগ নিয়ে মহাত্মার বিরোধী-প্রস্তাব কংগ্রেসে উথাপন করতে সাহসী হয়েছেন।" পরাজিত হবার পর পিতৃদেব কংগ্রেসের সভাপতির আসন হতে পদত্যাগ করলেন। কিন্তু কংগ্রেস ছাড়লেন না এবং কখনও ছাড়েন নি। কংগ্রেসের মধ্যে থেকেই তিনি নূতন দল গঠন করেছিলেন এবং যে প্রতিজ্ঞা গয়াতে তিনি করেছিলেন তা এক বৎসরের মধ্যেই পূর্ণও করেছিলেন। ৩১শে ডিসেম্বর পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুকে নিয়ে তিনি স্বরাজ্যদল গয়াতেই গঠন করলেন।

প্রথমে এ দলের নাম হয়েছিল কংগ্রেস-খিলাফৎ-স্বরাজ্য-পার্টি। এই দলে বাঙলা দেশ হতে প্রথম অনুবর্ত্তী হলেন, যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত, সুভাষ চন্দ্র বসু, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, সত্যেন্দ্র চন্দ্র মিত্র, কিরণ শঙ্কর রায়, সাতকড়িপতি রায়, মনমোহন নিয়োগী হেমেন্দ্র নাথ দাসগুপ্ত, প্রতাপচন্দ্র গুহ রায়, বসন্ত কুমার মজুমদার, হেমপ্রভা মজুমদার ও পরে আরও বহু নূতন সহযোগী এসেছিলেন।

উপরে যে কয়জনের নাম উল্লেখ করা হলো, তাঁরা গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত স্বরাজ্য-পার্টির সেবা করে গিয়েছেন।

গয়া-কংগ্রেস থেকে কলিকাতা ফিরে এসে পিতৃদেব পূর্ণোদ্যমে দেশে-দেশে কাউন্সিল-প্রবেশ-নীতি সমর্থন করে বেড়াতে লাগলেন। কাউন্সিল-প্রবেশ-নীতি কংগ্রেস দ্বারা স্বীকৃত করাতেই হবে, এই ছিল তাঁর দৃঢ় পণ। সে পণ রক্ষার জন্য তিনি শারীরিক অসুস্থতা পর্য্যন্ত গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন নি।

১৯২৩ সালে ২৯শে জানুয়ারী বোম্বাইতে একটি ক্ষুদ্র-কমিটির সহায়তায় পিতৃদেব নূতন দলের নিয়মাবলী রচনা করেন। তখনই 'কংগ্রেস খিলাফৎ' কথা বর্জ্জন করে 'স্বরাজ্য পার্টি' নাম দিয়ে এই দলকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং ফেব্রুয়ারী মাসে এলাহাবাদে জেনারেল-কমিটি দ্বারা তা সমর্থিত হয়।

কলিকাতায় এসে এই 'স্বরাজ্য দল' নিয়ে বহু দ্বন্দ্ব, কোলাহল ও মিথ্যা-অভিযোগের সম্মুখীন হতে হয়েছিল তাঁকে, কিন্তু স্ব-সঙ্কল্পে দৃঢ়চেতা পিতৃদেব তাতে ভ্রূক্ষেপ করেন নি।

এই সময় স্বরাজ্যদল ও পরিবর্ত্তন-বিরোধী দলের একটা মিলনের চেষ্টায়, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, পিতৃদেব ও মতিলাল নেহেরুকে অনুরোধ করেন—যাতে এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত উভয় দল মিলিত হয়ে চাঁদাতোলা ও সভ্যসংগ্রহের কাজ একত্রে করেন। এই সময়ের মধ্যে যদি সমগ্র দেশ সিভিল ডিসোবিডিয়ান্সের জন্য প্রস্তুত না হয়, তাহলে মে মাস থেকে 'স্বরাজ্যদল' কাউন্সিল-প্রবেশ কার্য্যে অগ্রসর হবেন এবং মৌলানা আজাদ তাতে যোগদান করে সর্ব্বভারতীয় নেতৃবৃন্দকে নিয়ে যাতে 'কাউন্সিল-প্রবেশ' কার্য্যকরী

করা যায় তার চেষ্টা করবেন। মৌলানা সাহেবের কথায় শ্রীযুক্ত রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার, সত্যমূর্ত্তি, পণ্ডিতজী এবং পিতৃদেব সম্মত হন।

'স্বরাজ্যদল', তদনুযায়ী তাঁদের কার্য্য আরম্ভ করে দিলেন। ২৪শে এপ্রিল দিল্লীতে রাজাগোপাল আচারিয়া, ডাক্তার আন্সারী, সরোজিনী নাইডু, হাকিম আজমল খাঁ ও মোয়াজ্জেম আলীকে নিয়ে একটি সম্মিলিত বৈঠকে স্থির হয় যে 'ইউনাইটেড্ প্রোগ্রাম' বা সম্মিলিত কার্য্যাবলী উভয়দল দ্বারা অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিন চার দিন পরেই রাজাগোপাল আচারিয়া 'তার' করে পিতৃদেবকে জানালেন যে বল্লভভাই প্যাটেল ও যমুনালাল বাজাজ সম্মিলিত-প্রস্তাব অনুযায়ী কার্য্য-নির্ব্বাহে অসম্মতি জানিয়েছেন।

এই সময়ে ২৭শে মে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু ও পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডণের চেষ্টায় বোম্বাইতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির এক অধিবেশনে স্থির হয় যে 'স্বরাজ্য দল' যে উদ্দেশ্য কাউন্সিলে-প্রবেশ সমর্থন করেন সে ভাবে নির্ব্বাচন-প্রার্থী কেউ হলে কংগ্রেস তাদের কোন বাধা প্রদান করবে না। পরিবর্ত্তন-বিরোধীদলের সঙ্গে 'স্বরাজ্য দলের' মিলনের প্রথম সূত্রপাত এখানে এবং এখান থেকেই তাঁদের জয়যাত্রা সুরু হলো।

কলিকাতায় হরিশ পার্কে ও মির্জ্জাপুর পার্কে দেশবাসীকে 'স্বরাজ্য পার্টী'র কার্য্য-প্রণালী বিশদরূপে বুঝিয়ে দেবার পর পিতৃদেব বিষ্ণুর চক্রের মতই ভারতের সর্ব্বত্র ঘুরে স্বরাজ্য-বার্ত্তা প্রচার দ্বারা লোকমত গঠন করতে লাগলেন। তিনি শ্রীযুক্ত তরুণ কুকণের সঙ্গে তামিল-নাডু ও অন্ধ্র প্রদেশ পরিভ্রমণ করে মাদ্রাজে স্বরাজ্য দলের বিজয়স্তম্ভ স্থাপন করতে সমর্থ হলেন। এই উপলক্ষে পিতৃদেব চিদম্বরম,

ত্রিচীনাপল্লী, তাঞ্জোর, মাদুরা, টিউটিকর্ণ, গুনটুর, চিত্তোর, সালেম, নেলোর, প্রভৃতি স্থানে বক্তৃতা দিয়ে অসহযোগ, কাউন্সিলের বাহিরে ও ভিতরে কার্য্য-প্রণালী, আইনভঙ্গ ইত্যাদি বিশদভাবে দেশবাসীকে যে ভাবে বুঝিয়েছিলেন তাতে তাঁর রাজনীতি এবং দেশপ্রীতি সমগ্র-দেশ স্পষ্ট ভাবেই উপলব্ধি করেছিল।

কিন্তু সমালোচক ও বিরুদ্ধ-বাদীর অভাব এখানেও হয়নি। তারা তাঁকে 'বিদ্রোহী' আখ্যা দিলেন। শঙ্করাচার্য্য ও রামানুজের জন্মভূমিতে পিতৃদেব এই সব তর্ক-বিশারদ-সমালোচকদের নিস্তব্ধ করে দিয়েছিলেন। এখানে ত্রিপ্লিকেন্ সমুদ্র-সৈকতে তাঁকে অভ্যর্থনা করার জন্য বিভিন্নদলীয়রা একযোগে একটি বিরাট-সভার অনুষ্ঠান করেন। কংগ্রেসের বিরুদ্ধবাদী দল, মহাজন সভা, খিলাফৎ কমিটি, তামিলনাডু স্বরাজ্যদল, প্রাদেশিক কংগ্রেস কাউন্সিল ও অমরকলা-বিলাসীনি সভা সব প্রতিষ্ঠানই একত্র হয়ে এখানে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে অভ্যর্থনা করে। প্রতিউত্তরে পিতৃদেব জানালেন—

"I have been called a rebel (laughter) Not that I disapprove of rebellion very much. (Renewed laughter) The whole of the non-co-operation activity was a rebellion. It was a silent non-violent rebellion and I have never been a rebel in my heart of hearts. I have rebelled against all forms of tyranny. If that appellation means that I rebelled against the tyranny of the congress, I accept that appellation as a correct one for me,"

"I am a rebel, because I have got the congress to proclaim what my viewis. But if it is implied that I am going against the interests of the congress, I deny

that charge in toto .. ..I have not gone away from the congress... ... ...I am not a rebel; I am only fighting against the tyranny of the majority. I am no rebel, I am only holding forth the right of every individual in God's earth to put forward his best for the good of the country. I am no rebel, I chose the path which I feel is necessary for our countrymen to take in order to reach the goal of Swaraj."

কাউন্সিল-প্রবেশ সম্বন্ধে তিনি বল্লেন—

"Now about the councils. There again people are busy about the future. What can you do within the councils? Has that not been tried? My answer is 'no'. What I want to do has not been tried. In the same way can you not say, "Has not non-co-operation been tried? Non-co-operation was more or less tried, even before it commenced under the leadership of Mahatma Gandhi. Why? At Amritsar I preached total non-co-operation. And I was opposed by Mahatma Gandhi who was for total co-operation.

"Now I turn to what I want you to do. I want you to enter the councils, in a majority and to put forward the National Demand. If it is not accepted I want to oppose the government in every measure, every thing has got to be opposed. I want to see that they are not able to govern us through the councils. Make the Government through the reformed councils. also absolutely impossible."

মাদ্রাজে কাউন্সিল-প্রবেশ নিয়ে অনেকে বলেছিলেন, 'এতো পার্ণেলী প্রথার অনুকরণ'। তার উত্তরে পিতৃদেব বলেছিলেন 'না, এটা পার্ণেলী প্রথার অনুকরণ নয়। আমি কি এতই বোকা যে House of Commons ও আমাদের ব্যবস্থাপক-সভার পার্থক্য বুঝিনা? House of Commons, sovereign legislatuie, আমাদের ব্যবস্থাপক-সভা তা নয়। অতএব আমি পার্ণেলের অনুকরণ আদৌ করিনি।'

'গভর্ণমেণ্ট যে মুখোস পরে রাজ্য-শাসন করছে, আমি সেই মুখোস ছিঁড়ে ফেলতে চাই। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ হতে আমাদের কাউন্সিল-প্রবেশ দ্বারা সর্ব্ববিষয়ে বাধা দেওয়া আরো উৎকৃষ্টতর অসহযোগ।"

এই মনোভাব নিয়েই তিনি কাউন্সিল-প্রবেশ দ্বারা আমলা-তন্ত্রের ধ্বংশ সাধনে কৃতসঙ্কল্প হয়েছিলেন। পরে কাউন্সিল-প্রবেশ করে Reformed Councils এর মুখোস ছিঁড়ে তার স্বরূপ দেশ-বাসীকে দেখাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

মাদ্রাজে বিজয় রাঘবাচারীও পিতৃদেবের এই মতবাদকে সমালোচনা দ্বারা তীব্র আক্রমণ করেছিলেন। কংগ্রেসের অনাচারের বিরুদ্ধে পিতৃদেব বিদ্রোহ করতে কুণ্ঠিত হননি এবং তার কারণ বিশদভাবে দেশবাসীকে জানাতেও তাঁর সাহসের অভাব হয়নি কখনো। দেশের মঙ্গলের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তি-বিশেষেব অধিকারের দাবীর কথা তিনি ব্যক্ত করেছিলেন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে গিয়ে—কিন্তু কংগ্রেস ত্যাগ করে নয়!

কংগ্রেসী-অনাচারের বিরুদ্ধে পিতৃদেবের পর সুভাষচন্দ্রই সক্রিয়-প্রতিবাদ করেছিলেন অবশ্য বাইরে থেকে, কেননা কংগ্রেসের

ভেতরে থাকা অসম্ভব হয়েছিল তাঁর পক্ষে।

কিন্তু স্বাধীন ভারতে কংগ্রেসের অনাচারের বিরুদ্ধে তার ভেতর বা বাইরে থেকে প্রতিবাদ করবার সাহস আজ ক'জনের আছে? যে দেশ বৃটিশ রাজশক্তির অনাচারের প্রতিবাদ সে দিনও করেছিল, সেই স্বাধীন-ভারত আজও সম্পূর্ণ বিদেশী-পীড়ণ-নীতি-অনুসৃত পন্থা থেকে মুক্তি পায়নি।

মাদ্রাজ থেকে ফিরে এসে পিতৃদেব বেবীর নবাগত জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রবীর ও আমার দ্বিতীয় পুত্র শান্তনুকে দেখে খুব খুসী হলেন। প্রবীর ১৩ই জুন ও শান্তনু ১৫ই জুলাই জন্ম গ্রহণ করে। শান্তনুকে দেখে বাবা বল্লেন, "কিরে! আমাদের কালিন্দীকে দেখে তোর শ্বাশুড়ী যে 'বড় কালো' বলেছিলেন—এবার দেখি তাঁর ঘরে একেবারে কেষ্ট ঠাকুর।" বলে খুব হাসতে লাগলেন।

দিল্লী কংগ্রেস—১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৩

কোকনাদ কংগ্রেস—ডিসেম্বর, ১৯২৩

কারামুক্তির পর পিতৃদেবকে দেশবাসী 'দেশবন্ধু' বলতো। সত্যিই জনসাধারণ যে তাঁকে বন্ধুর মতই মনে করতো তা আমরা ভাল করেই বুঝতে পেরেছিলাম এ সময়ে একটি ক্ষুদ্র ঘটনায়।

এই সময় একদিন গভীর রাত্রে একজন মাতালকে পুলিশ ধরে নিয়ে যাচ্ছিল আমাদের রসারোডের বাড়ীর সামনে দিয়ে। আমাদের বাড়ী দেখে মত্ত অবস্থাতেও মাতাল বোধহয় চিনেছিল যে সেটা দেশবন্ধুর বাড়ী। সে করুণ স্বরে কান্নাজুড়ে দিল, "বাবা চিত্তরঞ্জন, বাবা দেশবন্ধু! তোমার সদর থেকে আমাকে পুলিশ ধরে নিয়ে যায় বাবা, রক্ষা করো বাবা, দেশবন্ধু।" চিৎকারে শুধু পিতৃদেবই নয়, বাড়ী-শুদ্ধ সকলেরই ঘুম ভেঙ্গে গেল। আর্ত্ত-চিৎকার শুনে পিতৃদেব তাড়াতাড়ি উঠে নীচে গেটের কাছে গিয়ে দেখলেন, বদ্ধ মাতালকে পুলিশ ধরে নিয়ে যাচ্ছে। তাই দেখে পিতৃদেবের করুণা হলো। পুলিশকে বলে কয়ে তাকে ছাড়িয়ে দিলেন। মাতালের কাণ্ড দেখে বাড়ীর সকলের হাস্য-রসেরই উদ্রেক হয়েছিল। পিতৃদেব কিন্তু উপরে এসে খুব করুণভাবেই বল্লেন, "বেচারীর একদিন একটু মাত্রা বেশী হয়ে গিয়েছে মাত্র।" মাতালকে করুণা করবার কি আছে আমরা ভেবে পেলাম না। এখন ভাবি, পিতৃদেবের হৃদয়ে কি কারোই স্থানাভাব ছিলনা?

বোম্বাই-এর সিদ্ধান্ত পুনরায় কংগ্রেসের নিয়ম-বিরুদ্ধ বিবেচিত হয়েছিল বলে ১৫ই সেপ্টেম্বর (১৯২৩ সাল) দিল্লীতে মৌলানা আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হয়। সভাপতির ভাষণে তিনি স্বরাজ্য পার্টির কাউন্সিল-প্রবেশ-নীতি সমর্থন করেন। এই কংগ্রেসের অনতিপূর্ব্বে মৌলানা মহম্মদ আলী ও ডাক্তার কিচলু কারামুক্ত হলেন। পিতৃদেব এ কংগ্রেসে বাঙ্গলা থেকে বহু প্রতিনিধি নিয়ে উপস্থিত হলেন। স্বরাজ্য পার্টির জয় সুনিশ্চিত জেনে কংগ্রেসের তৎকালীন গোঁড়াপন্থীরা (No Changers) আপোষ করতে দ্বিধা করলেন না। কেননা মৌলানা মহম্মদ আলী বল্লেন যে যাতে কংগ্রেসের বিভিন্ন দলের মধ্যে ঐক্য সাধিত হয়, এই মর্ম্মে তিনি মহাত্মা গান্ধীর কাছ থেকে গোপন-বার্ত্তা পেয়েছেন। দিল্লী কংগ্রেসে কাউন্সিল প্রবেশ-নীতি সমর্থিত হোল।

গয়া-কংগ্রেসের পরাজয়ের গ্লানি মুছে যেতে এক বৎসরও অপেক্ষা করতে হয়নি। মাত্র নয় মাস পরেই দিল্লী কংগ্রেসে তা মুছে গিয়ে স্বরাজ্য পার্টি জয়যুক্ত হলো।

দিল্লী-কংগ্রেসের পর কলিকাতায় ফিরে এসে পিতৃদেব অক্টোবরে দৈনিক কাগজ 'ফরওয়ার্ড' প্রতিষ্ঠিত করে তার সম্পাদনা করেন। তাঁর সম্পাদিত এ সংবাদপত্র 'স্বরাজ্য পার্টির' কার্য্য-প্রণালী প্রকাশ করে জনমত গঠনের বিশেষ সহায়ক হলো।

'ফরওয়ার্ড' কাগজের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে কেহ কেহ বিনাবিচারে কারারুদ্ধ হলে সে সময় সুভাষচন্দ্র কার্য্য-পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছিলেন। অল্প কাল মধ্যেই 'ফরওয়ার্ড' কাগজ জাতীয় সংবাদ-পত্র সমূহের শীর্ষস্থান অধিকার করতে সক্ষম হয়েছিল। বিশেষ করে

গভর্ণমেণ্টের গুপ্ত-তথ্য প্রকাশ করে এ পত্রিকা গভর্ণমেণ্টকে যথেষ্ট বিব্রত করেছিল সে সময়।

আসন্ন-নির্ব্বাচনে স্বরাজ্য পার্টিকে জয়যুক্ত করবার জন্য পিতৃদেব দিবারাত্র পরিশ্রম করতেন। তাঁর এই একাগ্র-সাধনাকে ভগবান সাফল্যমণ্ডিত করলেন, ভারতের সর্ব্বত্র স্বরাজ্য পার্টিকে জয়যুক্ত করে। বিভিন্ন প্রদেশের প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক-সভায় স্বরাজ্য দলের প্রাধান্য লাভ হলো। স্বরাজ্য পার্টির নেতৃত্ব, ভারতীয় ব্যবস্থাপক-সভায় পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু এবং বাঙ্গলায় লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে পিতৃদেবের উপর অর্পিত হোল।

স্বরাজ্য পার্টিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য পিতৃদেবকে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছিল। তখন আমরা দেখেছি দিনে আট দশ ঘণ্টা বক্তৃতা দিয়ে এসে প্রচার-কার্য্য চালাবার জন্য আবার 'ফরওয়ার্ড' নিয়ে বসতে। পিতৃদেব বিজয়-গৌরবে মণ্ডিত হলেন সত্য, কিন্তু তাঁর এই অক্লান্ত পরিশ্রমে দুর্ব্বল-দেহ একেবারে ভেঙ্গে পড়লো। তাঁর দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ব্যাধির মূল বিস্তার করে বসলো।

এই সময় পূজাবকাশে তাঁকে নিয়ে আমরা বিক্রমপুরে আমার শ্বশুর-বাড়ী হাঁসাড়া গেলাম। তিনিও তাঁর অভিমত বিক্রমপুরবাসীকে জানাতে পারবেন বলে উৎসাহিত হলেন।

গোয়ালনন্দ হতে ষ্টীমারে লৌহগঞ্জ পর্য্যন্ত গিয়ে সেখান থেকে নৌকাযোগে হাঁসাড়া রওনা হলাম। আমার শ্বশ্রূমাতা ও আমার তিন ননদ, শৈল্য, ইলা ও লীলা আমাদের সঙ্গী হলেন। পিতৃদেব কারামুক্তির পর এই প্রথম হাঁসাড়া যাচ্ছেন, সে খবর পেয়ে দলে দলে লৌহজঙ্গ থেকে হাঁসাড়া পর্য্যন্ত প্রত্যেক গ্রামের লোক তাঁকে শ্রদ্ধা

জানাতে খালের ধারে ধারে সমবেত হতে লাগলো। বিক্রমপুরের চারদিক থেকে অগণিত-লোক নৌকা করে হাঁসাড়া অভিমুখে আসতে দেখে আমরা প্রমাদ গণলাম এবং বুঝলাম পিতৃদেবের শ্রান্তি অপনোদন এখানে হওয়া দুস্কর।

নৌকাতে উঠে পিতৃদেব শিশুর মত আনন্দে-আত্মহারা হয়ে গেলেন। প্রাণখুলে তিনি মাঝিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করে দিলেন। হাঁসাড়া 'বিলা দেশ' বলে আমার শ্বশ্রূমাতার সঙ্গে নানারকম পরিহাস চললো। নৌকাতে সে আনন্দের একবেলা কখনো ভোলা যায় না।

দুপুর বেলার খাবার আমাদের সঙ্গেই ছিল। পিতৃদেব কিন্তু মাঝিদের রান্না 'ছালন' খাবার জন্য অস্থির হয়ে উঠলেন। সে ইচ্ছা আমাদের জন্য তাঁর আর পূর্ণ হোলনা।

হাঁসাড়ার নিকটবর্ত্তী হয়ে দেখি নৌকাতে খাল ছেয়ে গিয়েছে। জাতীয়-পতাকা নিয়ে অগণিত স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছাসেবিকারা নৌকাতে এগিয়ে এলো তাঁকে অভ্যর্থনা করতে।

একে পূজাবাড়ী তার উপর পিতৃদেবের আগমনে গ্রামের ও আশে-পাশের জনসমাগমে বাড়ী ভরে গেল। ঠিক ষষ্ঠীপূজার দিন আমরা বাড়ী পৌঁছেছিলাম।

পিতৃদেব নেমেই প্রথমে দুর্গামণ্ডপে গিয়ে দেবী প্রতিমা প্রণাম করলেন। আমার স্বামীকে বল্লেন, "সবাইকে চণ্ডীমণ্ডপে উঠতে দেবতো? এ কথা শ্বশুর ঠাকুর ও শ্বশ্রূমাতার খুব মনঃপূত না হলেও, তাঁরা আর আপত্তি করলেন না। গ্রামের যুবকবৃন্দ এ কথাতে খুব

উৎসাহিত হয়ে পড়লো। সমস্ত গ্রামে ঢোল পিটিয়ে দেওয়া হলো যে চৌধুরীদের (আমার শ্বশুরবাড়ী) বাড়ীতে সর্ব্ববর্ণের লোক দেবী-মণ্ডপে উঠে অঞ্জলি দিতে পারবে এবং একসঙ্গে প্রসাদ পাবে। আশ্চর্য্য হয়েছিলাম, যখন গ্রামের নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা এই কথা শুনে ভয়ে আকুল হলো। সত্যিই তারা ভেবেছিল যে আমাদের সকলের সঙ্গে চণ্ডীমণ্ডপে যদি উঠে তবে তারা দেবীর কোপে পতিত হবে। পিতৃদেব শুনে অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে কাতর-কণ্ঠে বলেছিলেন "এদের এই ভয়ানক বিশ্বাসের জন্য আমরাই দায়ী। মানুষ মাত্রেরই যে সম-অধিকার আছে এটা প্রভুত্বের মোহে আমরাই এদের এতদিন জানতে দেইনি। দেশের একটা বিরাট অংশকে আমরা এভাবেই বঞ্চিত ও রুদ্ধ করে রেখেছি।" কিন্তু তারা যখন অনুভব করলো যে পিতৃদেব সত্যিই মনে-প্রাণে তাদের সঙ্গে একত্রে দেবীর অঞ্জলি দিতে চান, তখন তারা বিপুল আবেগে ও উচ্ছ্বাসে সমবেত হলো চণ্ডীমণ্ডপে। হাজার হাজার সর্ব্ববর্ণের জনগণের সঙ্গে যখন তিনি প্রসাদ পেতে মণ্ডপের প্রাঙ্গণে বসে গেলেন, তখন গ্রামের রক্ষণশীল স্ত্রী-পুরুষেরাও সকলে ছুটে এসে প্রসাদ গ্রহণ করলেন। "ব্রাহ্মণে দেয় আলিঙ্গণ আর চণ্ডালে দেয় কোল"—সেদিন প্রভুপাদ নিত্যানন্দের চণ্ডালে প্রেম-বিলানো পিতৃদেবের মধ্যে প্রত্যক্ষ করে আমরা ধন্য হয়েছিলাম। মনে হচ্ছিল, আচার্য্য অদ্বৈত্য যে মন্ত্রে মহাপ্রভুকে দীক্ষিত করেছিলেন, যে মন্ত্র প্রভুপাদ নিত্যানন্দের মধ্যে রসরূপ ও নামরূপ ধারণ করে বঙ্গভূমিকে প্রেমবন্যায় প্লাবিত করেছিল, তারই চরম প্রকাশ যেন আজ আমাদের নয়ন সম্মুখে।

আজই আমরা হিন্দু-মুসলমান-ভেদ প্রত্যক্ষ করি, শুধু প্রত্যক্ষ করিনা, ঐতিহ্যময়, সংস্কৃতিসম্পন্ন, নিজ প্রাণরসে-ভরপুর একটা আত্ম-ভোলা জাতিকে সে যূপকাষ্ঠে বলিদানেও কুণ্ঠিত হইনি। কিন্তু তখন

পল্লীগ্রামের মুসলমানেরা বাহ্যিক ও সামাজিক ব্যাপারে হিন্দুর সঙ্গে প্রীতির কবলেই বাঁধা ছিল। অগণিত মুসলমানেরা এসে তাই আমাদের সঙ্গে পূজো বাড়ীতে মিলিত হতে দ্বিধা করেনি। পিতৃদেব তাদের সঙ্গে আলাম গাজীর দরগাতে গিয়ে গ্রামের হিন্দুদের নিয়ে একসঙ্গে বসে তাদের শীর্ণি প্রসাদ নিয়েছিলেন। বৃটিশ-রাজশক্তির চক্রান্তে আমরা ভাইএ ভাইএ বিচ্ছিন্ন হলাম। কিন্তু আজও দুভাই দুঘরে বসতি করেও যদি আমরা একে অন্যের সুখ দুঃখ নিজের বলে গ্রহণ করি, তবে জগতে এমন কোন শক্তি নেই যা আমাদের সম্মিলিত শক্তিকে পরাভূত করতে পারে। পিতৃদেব এই খাঁটি কথা বুঝেছিলেন, তাই তাঁর মধ্যে হিন্দূ-মুসলমান-পার্থক্য-বোধ একেবারেই ছিলনা। আমরাও সে শিক্ষা কখনো পাইনি। নানাপথ দিয়ে হয়তো গন্তব্য স্থানে আমাদেব যেতে হয়—কিন্তু শেষ-পরিণতি সকলেরই এক। একথা ভুলে গিয়ে নিজ নিজ ধর্ম্মকেই আমরা হেয় অপমানিত করি বলে আমার ধারণা।

এখানে পিতৃদেব সভা করে তাঁর স্বরাজ্য পার্টির কার্য্য-প্রণালী ও কাউন্সিল-প্রবেশ বিক্রমপুরবাসীকে ভালভাবে বুঝিয়ে দিলেন।'

এই রকম ভাবে কোলাহল-পূর্ণ দিনগুলি গ্রামের লোকদের সঙ্গে কাটিয়ে বিজয়া দশমীর পরদিন আমরা কলিকাতা রওনা হলাম।

কলিকাতা ফিরে এসে পিতৃদেব কাউন্সিলে প্রবেশের জন্য সভ্য-নির্ব্বাচনে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। প্রথমেই বড়বাজার নির্ব্বাচন-কেন্দ্রে কাকা সতীশ রঞ্জন দাশ, এড্‌ভোকেট্‌ জেনারেলের বিরুদ্ধে স্বরাজ্য পার্টির সাতকড়িপতি রায়কে দাঁড় করালেন।

এ সময় রসারোডের বাড়ী কর্ম্মচাঞ্চল্যে মুখরিত হয়ে উঠলো। আহার নিদ্রা ভুলে পিতৃদেব এই নির্ব্বাচনে স্বীয়-দলকে জয়যুক্ত

করবার সংকল্প গ্রহণ করলেন এবং সিদ্ধি লাভও করেছিলেন। সাতকড়িপতি রায় এই নির্ব্বাচনে প্রবল পরাক্রান্ত প্রতিদ্বন্দ্বী সতীশ রঞ্জণ দাশকে পরাজিত করে ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন। মনে পড়ে, নির্ব্বাচনের ফল জেনে কাকা সাহেব আমাদের বাড়ী এসে বাবাকে বল্লেন, "আমাকে হারিয়েছ তাতে আমার আপত্তি নেই কিন্তু খালি পা-ওয়ালা লোক দিয়ে আমাকে হারালে ?" বাবা বল্লেন "এই খালি পা-ওয়ালা লোকেরাই যে দেশের প্রাণ জুড়ে আছে তা বুঝলেতো ?" এর পরেই ব্যারাকপুরে স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়কে তিনি পরাজিত করলেন নবীন ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায়কে দিয়ে। সে সময়ে ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায় দেশের জনসাধারণের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন। তাই তাঁকে নির্ব্বাচিত করবাব জন্য রাষ্ট্রগুরুর বিরুদ্ধে পিতৃদেব সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেছিলেন এই কেন্দ্রে। প্রত্যেক নির্ব্বাচনী-সভায় উপস্থিত হয়ে ডাক্তার বিধান চন্দ্র বায়কে নির্ব্বাচিত করবার জন্য অনুরোধ করলেন। বিরুদ্ধ-পক্ষের কোন বক্তাকেই তিনি নিবৃত্ত করতেন না। সকলকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেন এবং তাদের যুক্তি অলৌকিক শক্তিবলে তিনি খণ্ডন করতেন। একদিন ব্যারাকপুরে এক সভায় প্রতিপক্ষের ঢিল এসে পিতৃদেবের আঙ্গুলে লেগেছিল। তিনি তাতে কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে মৃদু হেসে ধীরভাবে বলেছিলেন "সাহস করে সামনে এসে মারনা কেন ভাই ? কেন কাপুরুষ নামের কলঙ্ক বহন করছো ?" তাঁর এই আচরণে জনতা স্তব্ধ ও তাঁর ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হয়েছিল। সিংহের বিবরে প্রবেশ করে বিধান রায়কে নিমিত্ত করে সেদিন সিংহকেই পরাজিত করেছিলেন তিনি। স্যার সুরেন্দ্রনাথ সেদিন রাজনৈতিক আসন পিতৃদেবকে ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়িয়েছিলেন আর ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায় জয়ী হয়ে কংগ্রেসে প্রথম প্রবেশ করবার সুযোগ পেয়ে

ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হলেন। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় পিতৃদেবের সহায়তায় নিজ কৃতিত্ব প্রদর্শন করবার সুযোগ একদিন পেয়েছিলেন এবং যাঁর জন্য আজ তিনি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী— আশাকরি অন্যান্য লোকেরাও তাদের কৃতিত্ব প্রদর্শন করবার সে সুযোগ পেতে তাঁর সহায়তা থেকে বঞ্চিত হবে না। তবেই পিতৃদেবের পরিশ্রম সার্থক হবে এবং বিধানচন্দ্র রায়ও যোগ্য গুরুদক্ষিণা দিয়ে ধন্য হবেন।

এইরূপে প্রায় প্রত্যেক নির্ব্বাচন-কেন্দ্রেই স্বরাজ্য পার্টির সভ্যরা নির্ব্বাচিত হতে লাগলো এবং পিতৃদেব তাঁর দলীয় চল্লিশ জন সভ্য নিয়ে ব্যবস্থাপক-সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ একক-বিরোধী-দল হয়ে প্রবেশ করলেন। পরে জাতীয়দলের সমর্থনে তাঁরা আরও শক্তিশালী হয়েছিলেন।

১৯২৩ সালে ডিসেম্বর মাসে কোকনাদে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। মৌলানা মহম্মদ আলী এই কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। এই কংগ্রেসও সিদ্ধান্ত করে যে পিতৃদেবের কাউন্সিল-প্রবেশ-ব্যাপারে কোনরূপ বাধা দেওয়া হবেনা।

গয়ার পর একবৎসরের মধ্যেই কংগ্রেস কাউন্সিল-প্রবেশ দুই দুইবার সমর্থন করলো। মহাত্মা গান্ধী তখনও কারাগারে।

এই কংগ্রেসে শুধু কাউন্সিল-প্রবেশ-নীতি নয় এতে আরো একটি স্মরণীয় ঘটনা হিন্দু মুসলমান চুক্তি, "বেঙ্গল প্যাক্টের" প্রস্তাব উত্থাপন। "বেঙ্গল প্যাক্ট" প্রস্তাব উত্থাপিত হলে সভায় তুমুল কোলাহল হতে লাগলে। অনেকে চীৎকার করে বলে উঠলো" বেঙ্গল প্যাক্ট মুছে ফেল" (Delete the Bengal Pact, delete the Bengal Pact.)

পিতৃদেবের পক্ষে এটা সহ্য করা অসম্ভব হলো। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বল্লেন, "আপনারা বেঙ্গল প্যাক্টের প্রস্তাব মুছে ফেলতে পারেন, কিন্তু ভারতবর্ষের কংগ্রেসের ইতিহাস থেকে বাঙ্গলাকে মুছে ফেলতে পারেন না। এই কংগ্রেসে বাঙ্গলা তার অভিমত জানাবেই। কার সাধ্য বাঙ্গলাকে এ অধিকার থেকে বঞ্চিত করে? বাঙ্গলাকে এ ভাবে মুছে ফেলবার চেষ্টা করলে বাঙ্গলা তার নিজের পায়ে দাঁড়াতে জানে।"

"You can delete the Bengal Pact from the resolution, but you can not delete Bengal from the History of the Indian National Congress. Bengal demands her right of having her suggestion considered by the National Assembly. What right has any body to say. that Bengal has to be deprived of her right. Bengal will not be deleted in this unceremonious fashion. I can not understand the argument of those "Delete Bengal Pact". If you do, Bengal can take care of itself. You cannot refuse Bengal to make a suggestion."

হিন্দু-মুসলমান চুক্তি সম্বন্ধে তিনি আরও বলেছিলেন যে, "(Swaraj was impossible without non-violent, non-co-operation and non-co-operatian could not be effective without unity between hindus and mohamedans. They must therefore work for the unity if they meant to achieve Swaraj.)"

এই চুক্তিপত্র নিয়ে তাঁকে কম সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়নি। রাজনীতি ক্ষেত্রে তিনি এটা ভালকরেই উপলব্ধি করেছিলেন যে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত-শক্তি বলে আমলাতন্ত্রকে ধ্বংস করা সহজ-সাধ্য

হবে। আত্ম-কলহে লিপ্ত থেকে তৃতীয় শক্তি ব্যুরোক্রেশীর সুবিধা করে দেওয়া তিনি আদৌ সমীচিন বোধ করেন নি। তাই তিনি চেষ্টা করেছিলেন যাতে আমরা পরস্পরে ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়ে স্থায়ীভাবে ঐক্যবদ্ধ হই।

অতঃপর কংগ্রেসে 'বেঙ্গল প্যাক্ট' সম্বন্ধে স্থির হলো যে 'ভারতীয় প্যাক্ট কমিটি' সমস্ত প্রদেশের অভিমত নিয়ে তাদের 'প্যাক্ট' বিচার করবেন। পিতৃদেবও বলেছিলেন যে বাঙ্গলাকে তার মতানুযায়ী প্রস্তাব করবার অধিকার থেকে কেহ বিরত করতে পারবে না। কাজেই এ প্রস্তাবেও তাঁর দাবী কংগ্রেস গ্রহণ করলো।

বাঙ্গলা তার মতানুযায়ী প্রস্তাব করবার অধিকার থেকে বিরত হোল না সত্যি,—কিন্তু সে সময় যদি সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান কল্পে কংগ্রেস 'বেঙ্গল প্যাক্ট' বা লালা লাজপত রায় ও ডাক্তার এম্, এ আনসারী-কৃত প্যাক্টেএ ত্বরায় দৃঢ় মনোনিবেশ করতেন তাহলে পিতৃদেবের মৃত্যুর পরই সাম্প্রদায়িক সমস্যা অত দৃঢ় ভাবে কখনো দেখা দিত না। কারণ সাম্প্রদায়িক-সমস্যা সমাধান-কল্পে স্বরাজ্য পার্টির হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই প্রবল চেষ্টিত ছিলেন—কিন্তু পিতৃদেবের মৃত্যুতে স্বরাজ্য পার্টি স্তিমিত হয়ে গেল। তৃতীয় শক্তি এ সুযোগ গ্রহণে তৎপর হয়ে উঠলো এবং তারা এতে সফল হয়েছিল কিনা তা দেশবাসীর বিচার্য্য।

আরো মনে জাগে, যে বাঙ্গলার অধিকার নিয়ে গর্ব্বোন্নত শিরে পিতৃদেব জয়ী হয়েছিলেন, আজ পিতৃদেবের সেই বাঙ্গলা কি নিজের পায়ে সত্যিই দাঁড়িয়ে আছে? তাঁর বাঙ্গলা কি আজ নিজের মতানুযায়ী দাবী করবার শক্তি রাখে? অতীত-শক্তিশালিনী সে বাঙ্গলা আজ বিস্মৃতির অতল তলেই নিমজ্জিত।

পিতৃদেবের নেতৃত্বে যখন স্বরাজ্য দলের প্রতিনিধিরা বাঙ্গলার প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক-সভার অধিকাংশ পদ অধিকার করলো, তখন গভর্ণর লর্ড লিটন ১১ই ডিসেম্বর ১৯২৩ সালে তাঁকে লাটভবনে আহ্বান করে মন্ত্রিসভা গঠন ও পরিচালনা করতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু পিতৃদেব মনে করতেন যে হস্তান্তরিত-বিভাগের সম্পূর্ণ ক্ষমতা না পেলে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করা অনুচিত, কারণ প্রকৃতপক্ষে তাতে দেশের কোন উপকার সাধিত হওয়া অসম্ভব। তাই তিনি নিজ-দলীয় সভ্যদের সঙ্গে পরামর্শ করে মতামত জানাবেন একথা বলে এলেন। অবশ্য অমাত্যপদ গ্রহণে রাজী হলে আমলাতন্ত্র ধ্বংস করবার প্রচুর সুযোগ তিনি নিশ্চয়ই পেতেন। কিন্তু দলীয় সকলকে পরামর্শ না করে তিনি কখনো মতামত ব্যক্ত করতেন না এবং অন্যায় পথ অবলম্বন করে কার্য্য সিদ্ধি করাও তিনি উচিত মনে করতেন না। তাই দলীয় সকলকে পরামর্শ করেই তিনি লর্ড লিটনকে মন্ত্রীসভা গঠনের অসম্মতি জানিয়ে দিলেন।

স্বরাজ্যদলের সর্ব্ববাদী-সম্মত নেতৃস্থান গ্রহণ করেও পিতৃদেব তাঁর দলীয় সকলের উপর কোনদিন প্রভুত্ব করেননি, সকলকে নিয়ে একযোগেই তিনি স্বরাজ্য পার্টির কার্য্য করতেন এবং সে জন্যই স্বরাজ্যদল সুসঙ্ঘবদ্ধ হয়ে গড়ে উঠেছিল।

—(*)(*)(*)(*)—

কাউন্সিল ও করপোরেশন্

১৯২৪ সালে ২৫শে জানুয়ারী কাউন্সিল-গৃহে রাজনৈতিক বন্দীগণের মুক্তি, দমন-মূলক আইনের প্রত্যাহার প্রভৃতি প্রস্তাব স্বরাজ্যদলের প্রভাবে অধিকাংশ সভ্যদ্বারা গৃহিত হলো। যে কাউন্সিল-গৃহের আবহাওয়া পূর্ব্বে সম্পূর্ণ বিদেশী-ভাবাপন্ন ছিল, সেই কাউন্সিল-গৃহেই স্বরাজ্যদল প্রবেশ করে জাতীয়-ভাব এনে দিলেন। পিতৃদেব যেদিন কাউন্সিলে ডায়ার্কি (দ্বৈত শাসন) ধ্বংশ করে মন্ত্রীদের বেতন অগ্রাহ্য করেছিলেন, সে দিনের কথা কখনো ভুলবো না। তাঁর যুক্তি-তর্ক শুনে বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদের অনেকেই সেদিন তার পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন। এইরকম প্রাণ-গ্রাহী, জীবন্ত বক্তৃতা কাউন্সিলে আর কখনো হয়েছে কিনা জানিনা, আর হবেও না সুনিশ্চিত। তাঁর বলার সময় সমস্ত কাউন্সিল-গৃহটি গম্ভীর, নিস্তব্ধ ছিল। ভোট-গ্রহণের পরক্ষণে যখন দেখা গেল যে স্বরাজ্যদল জয়লাভ করেছে তখন কাউন্সিল-গৃহের বাহিরে হাজার হাজার অপেক্ষমান জনতা তুমুল হর্ষধ্বনি করে পিতৃদেবকে সম্বর্দ্ধনা জানিয়েছিল। 'স্বরাজ্য পার্টির' এই জয়ে সমগ্র দেশ তখন আনন্দে দীপ্ত হয়ে উঠেছিল।

আজ ভাবি, যে কংগ্রেসের ইঙ্গিতে একদিন প্রাণ দিতেও লোকে কুণ্ঠিত হয়নি, আজ স্বাধীন ভারতে সেই কংগ্রেসের উপর জনসাধারণের কেনই বা এ বিরাগ? এবং তার জন্য দায়ী কারা? যে কংগ্রেসের আদর্শে একদিন গর্ব্বোন্নত শিরে ভারত দাঁড়িয়েছিল, আত্মসুখ বিসর্জ্জন দিয়ে, দেশের কল্যাণ-সাধনায় যে সব কংগ্রেস

সেবকেরা সেই আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন, আজ কংগ্রেস-আদর্শবাদী সে ভারত, বিশেষ করে পিতৃদেবের সে বাঙ্গলা কোথায়?

স্বরাজ্যদল কাউন্সিলে জয়যুক্ত হয়ে স্থির করলেন যে স্বায়ত্বশাসনের মন্ত্রী স্যার সুরেন্দ্রনাথের চেষ্টায় কলিকাতায় যে নূতন মিউনিসিপ্যাল-আইন প্রবর্ত্তিত হয়েছে, কংগ্রেসের গঠনমূলক-কার্য্যের প্রসার-কল্পে এবং কংগ্রেস-সদস্যদের স্বায়ত্বশাসনের উপযোগী করে তুলতে হলে, তাদের সমস্ত ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটি অধিকার করতে হবে। পিতৃদেব স্বরাজ্য পার্টির দ্বারা এসব প্রতিষ্ঠান অধিকার করবার জন্য ব্যবস্থা করলেন।

তদনুযায়ী মার্চ্চ মাসে নূতন নিয়মে কলিকাতা করপোরেশনের প্রথম নির্ব্বাচনে প্রায় প্রত্যেক ওয়ার্ডেই স্বরাজ্যদল-মনোনীত প্রার্থীরা জয়লাভ করলেন। পিতৃদেব এ উদ্যোগের প্রাণ-স্বরূপ ছিলেন। এই নির্ব্বাচনে তিনি যে গৃহে বা যে ওয়ার্ডে ভোট-প্রার্থী হয়ে গিয়েছিলেন, সেখানেই তিনি সমর্থন পেয়েছিলেন এরকম করেই পিতৃদেব তাঁর আশ্চর্য্য প্রভাবে স্বরাজ্যদল দ্বারা কলিকাতা করপোরেশন্ অধিকৃত করলেন। স্বরাজ্য দলের বহু সংখ্যক মুসলমান সে সময় হিন্দুর ভোটে নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন। এই সময় তিনি নির্ব্বাচিত-সভ্যদের নিয়ে করপোরেশনের কার্য্য যাতে সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হয় সে জন্য, 'কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েসন্' নামে একটি সঙ্ঘ গঠন করলেন। এই সঙ্ঘের প্রথম সভাপতি ছিলেন পিতৃদেব এবং প্রথম সম্পাদক সুকুমার রঞ্জন দাশ। কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্টের স্রষ্টা স্যার সুরেন্দ্রনাথকে সম্পূর্ণ পরাজিত করে তাঁরই সৃষ্ট এ্যাক্ট অনুযায়ী ১৯২৪ সালে এপ্রিলমাসে পিতৃদেব কলিকাতা করপোরেশনের প্রথম মেয়র নির্ব্বাচিত হলেন এবং শহীদ

সুরাবর্দ্দী সাহেব ডেপুটী মেয়রের আসনে প্রতিষ্ঠিত হলেন। পিতৃদেবের ইচ্ছানুযায়ী তাঁর প্রিয় শিষ্য পুত্রতুল্য সুভাষচন্দ্র বসু করপোরেশনের প্রধান-কর্ম্মকর্ত্তা হয়ে দেশকে গৌরবান্বিত করলেন। সহরের দরিদ্রদের ব্যথা লাঘবের এবং জনসাধারণের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তার, স্বল্প মূল্যে দুগ্ধ সরবরাহ, চিকিৎসা, বস্তীর উন্নয়ণ, অবৈতনিক পাঠশালা প্রভৃতি পিতৃদেবের পরিকল্পিত কার্য্য সুভাষের পরিচালনায় সুচারু-রূপেই সম্পন্ন হতে লাগলো। আজ শুধু নির্ব্বাচনের সময় একবার 'দেশবন্ধুর' পরিকল্পনা-অনুযায়ী কার্য্যের প্রতিশ্রুতি নাগরিকেরা পায় সত্য, কিন্তু নির্ব্বাচনের পর তা কার্য্যে পরিণত করবার কথা আর মনে থাকে না। স্বাধীন ভারতে এবং পশ্চিম বাংলায় একজন স্বনামধন্য ডাক্তার প্রধান মন্ত্রী থাকা সত্ত্বেও করপোরেশনের অব্যবস্থা ও জনসাধারণের প্রতি প্রাথমিক চিকিৎসা ও অন্যান্য অবশ্যকরণীয় কর্ত্তব্যের প্রতি ঔদাসীন্য দেখে আমাদের লজ্জায় অধোবদন হতে হয়।

মিউনিসিপ্যালিটির শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি প্রচার-কল্পে এবং নাগরিকদের উৎসাহ ও আত্ম চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে সুভাষচন্দ্রের উদ্যোগে "কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেট" নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হলো। কংগ্রেস বিরোধী দলের অনেকে তখন শ্লেষ করে বলেছিলেন "চিত্তরঞ্জন এবার তাঁর স্বরাজ্যদলের প্রচার কার্য্য এই পত্রিকা মারফৎ চালাবেন"। কিন্তু তাদের সে ভুল শীঘ্রই ভেঙ্গে গেল যখন তারা দেখলো যে পত্রিকা নগরবাসীর নাগরিক-কর্ত্তব্যবোধ-উদ্বোধনেই সহায়তা করছে।

মেয়র হয়ে পিতৃদেব অক্লান্ত-কর্ম্মী সুভাষচন্দ্রের মত কর্ম্মকর্ত্তা পেয়েই নাগরিকদের বিশেষ করে দরিদ্র জনসাধারণের কল্যাণ-কল্পে সমস্ত প্রাণ ঢেলে দিয়েছিলেন। কিন্তু অচিরেই কালের কঠোর

আহ্বানে তাঁর অসমাপ্ত কার্য্যাবলী ও দেশকে ফেলে তিনি চিরবিদায় নিতে বাধ্য হলেন।

একদিকে কাউন্সিলের গুরুত্বপূর্ণ দায়ীত্বভার, অন্যদিকে বিশাল করপোরেশনের অধিনায়ক—এই দুইএর সংমিশ্রণে সগৌরব-বিজয়লাভ পিতৃদেবের হয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু অপরিসীম কর্ম্ম-ক্লান্তিতে ও বিশ্রামের অনিয়মে ক্রমেই তার জীবনদীপ স্তিমিত হয়ে আসতে লাগলো। তাঁর বিজয়ে দেশবাসী লাভবান হয়েছিল কিনা তা দেশবাসীর বিচার্য্য, কিন্তু ভারতমাতা তাঁর একান্ত প্রিয়, অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তানকে হারাতেই বসলেন।

এই গুরুত্বপূর্ণ কার্য্যের মধ্যে দেশের আর এক গুরুতর সমস্যার উদ্ভব হলো তারকেশ্বরে। তারকেশ্বরের সত্যাগ্রহ পিতৃদেবের জীবনে একটি স্মরণীয় ঘটনা।

ভঙ্গ বঙ্গকে জোরা লাগাবার সময়, বাংলাদেশের খানিকটা যখন বিহার-ভুক্ত করা হয়েছিল তখন বৈদ্যনাথও বিহারীদের হয়ে যায়। শাক্ত ও বৈষ্ণব এ দুটি ধারাতেই বাঙ্গালী সঞ্জীবিত। বাঙ্গালী যেমন মহাপ্রভুর গৌরবে গৌরবান্বিত তেমনি শ্মশানবাসী শিবের মহিমায় মহিমান্বিত। লুপ্ততীর্থ তারকেশ্বরেই বাঙ্গালী তার শিব খুঁজে পায়।

১৯২৪ সালে স্বামী সচ্চিদানন্দ তারকেশ্বরের মোহন্তর অনাচার নিবারণ-কল্পে আত্মনিয়োগ করেন। অনাচারী মোহান্তকে অপসারিত করবার জন্য প্রবল আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। এ আন্দোলনে সমগ্র বাঙ্গলাদেশ উদ্বেলিত হয়ে উঠলো। পিতৃদেব এ সময় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তারকেশ্বরের অনাচার সম্বন্ধে তদন্ত-সমিতি নিযুক্ত করেন।

এই তদন্তের ফলে, মোহান্তর বিরুদ্ধে কুক্রিয়াসক্তির ও অনাচারের অভিযোগ প্রমাণিত হয়। পবিত্র এই তীর্থের সমূহ-সংস্কার আবশ্যক মনে করে পিতৃদেব তারকেশ্বরে সত্যাগ্রহ প্রবর্ত্তন করেন। প্রথমে তিনি মোহান্ত সতীশ গিরির সঙ্গে একটি মিটমাটের প্রস্তাব করেছিলেন, কিন্তু একজন অব্রাহ্মণকে এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করতে দেখে ব্রাহ্মণ সভার প্রতিনিধিদের, আদৌ সেটা মনঃপুত হলো না; হয়তো তাঁরা ভেবেছিলেন এতে ব্রাহ্মণ সভার প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ হবে। সতীশ গিরি মিটমাটের প্রস্তাবে সম্মত না হওয়াতে পিতৃদেবকে সত্যাগ্রহ অবলম্বন করতে হয়েছিল।

তারকেশ্বর-সত্যাগ্রহে আর কিছু প্রতিপন্ন হোক বা না হোক, দেশের তরুণ সম্প্রদায়ের উপর পিতৃদেবের কতখানি প্রভাব তা দেশবাসী ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিল। তাঁর আহ্বানে দলে দলে তরুণ সম্প্রদায় যে ভাবে এই আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ ও কষ্ট সহ্য করেছিল, আজও সে কথা ভুলবার নয়। পিতৃদেবের ব্যক্তিগত প্রভাবই এ আন্দোলনকে সাফল্য-মণ্ডিত কবেছিল সেদিন। তাই এ আন্দোলন চালাবার জন্য মুক্তহস্তে দান করতে দেশবাসী কুণ্ঠিত হয়নি।

অসহযোগ-আন্দোলনে যেমন সর্ব্বপ্রথম তিনি তাঁর পুত্রকে কারাগারে পাঠিয়েছিলেন, এ আন্দোলনেও তেমনি তাঁরই ডাক প্রথম পরেছিল। ভোম্বল স্বেচ্ছায় হাসিমুখেই কারাবরণ করলো। আসন্ন-সন্তান সম্ভবা পত্নী সুজাতার কথা সে ভাববার সময় পায়নি। এই সত্যাগ্রহ আন্দোলনে বাঙ্গলার অগনিত তরুণ সম্প্রদায়ের সঙ্গে ভোম্বল ছয় মাসের কারাদণ্ড ভোগ করেছিল। পিতৃদেব নিজেও যখন কারাবরণ করবার জন্য প্রস্তুত হলেন তখন প্রমাদগুনে সতীশ গিরি গদী পরিত্যাগ করে সম্মান জনক আপোষ রাজী হলেন। স্থির হলো, তার

পরিবর্ত্তে তার শিষ্য প্রভাত গিরি মোহান্ত নিযুক্ত হবেন এবং দেবর সম্পত্তির সমস্ত অর্থ জনসাধারণ ও যাত্রীদের সুবিধার্থে ব্যয়িত হবে। তত্ত্বাবধান করবার জন্য জনসাধারণের বিশ্বাসভাজন পরিদর্শক-সমিতি গঠিত হবে। এই আপোষ হয়তো পূর্ণ ফলপ্রসূ হতো যদি ব্রাহ্মণ-সভা এর বিরোধিতা না করতেন। তাদের কর্ত্তৃত্ব এতে না থাকাতেই এই সভার প্রতিনিধিরা এই আপোষের বিরোধীতা করেছিলেন।

এই আন্দোলনের ফলে তারকেশ্বর-তীর্থের গ্লানি যথেষ্ট পরিমাণে দূর হয়েছিল সন্দেহ নেই। পিতৃদেবের আন্তরিক চেষ্টা ও তরুণগণের অসাধারণ আত্মত্যাগের পরিচয় দেশবাসী সেদিন পেয়েছিল। আমার মনে হয়, তারকেশ্বর-সত্যাগ্রহে যোগদান করার পিতৃদেবের মূল উদ্দেশ্য ছিল অন্যায় ও অসঙ্গতির প্রতি দেশের তরুণদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং এইসব ছোটখাটো আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যৎ সংগ্রামের সৈনিক তৈয়ারী করা।

ভোম্বল কারাগৃহে আবদ্ধ থাকা কালেই ৩০শে জুলাই ১৯২৪ সালে তার দ্বিতীয়া কন্যা স্বরূপা (পুটি) জন্মগ্রহণ করে। ওকে দেখে পিতৃদেব পরম-স্নেহাদরে বক্ষে চেপে ধরে বল্লেন, "কারাবাসী বাপের মেয়ে, ও আমাদের কারাবাসিনী"।

এ বৎসরেই ৫ই ফেব্রুয়ারী মহাত্মা গান্ধী মুক্ত হয়ে, অস্ত্রোপচারের পর ভগ্ন স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য জুহুতে অবস্থান করছিলেন। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু এবং পিতৃদেব ও মা তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য মে মাসে জুহুতে গিয়েছিলেন। সে সময় তাঁরা মহাত্মার সঙ্গে কাউন্সিল-প্রবেশ-নীতির আলোচনা করেছিলেন। মহাত্মা তখন বলেছিলেন—

"I am sorry to have to say that I have not been able

to see eye to eye with the Swarajists.. .. I retain the opinion that council entry is inconsistent with non-co-operation I would however, be no party to putting any obstacles in their way or to carrying on any propaganda against the Swaragists' entry into the legislatures though I cannot actively help there in a project in which I donot believe"

পণ্ডিত মতিলাল এবং পিতৃদেব একযুক্ত বিবৃতিতে বলেন—

"We fail to understand how such entry can be regarded as inconsistent with the non-co-operation resolution of the Nagpur Congress. But if non-co-operation is mere a matter of mental attitude than of the application of a living principle to the existing facts of our national life, ...we conceive it to be our duty to sacrifice even non-co operation to serve the real interests of the country. Council entry is, and can be thoroughly consistent with the principle of non-co operation, as we understand that principle to be inconsistent with non co-operation."

নানা-বাদপ্রতিবাদের পর মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে পিতৃদেব ও মতিলাল নেহেরুর সিদ্ধান্ত 'গান্ধী-দাশ প্যাক্ট' বলে প্রকাশিত হোল। এই প্যাক্ট অনুযায়ী মহাত্মা গান্ধী খদ্দর প্রচলনে আত্মনিয়োগ করবেন, আর রাজনৈতিক ভার স্বরাজ্য পার্টি গ্রহণ করবেন। মহাত্মা গান্ধী নিজেকে রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিলেও—স্বরাজ্য পার্টির সঙ্গে তাঁর অন্তরের যোগ কোন দিন বিচ্ছিন্ন হয়নি। তিনি এ সময় একদিন বলেছিলেন "My political conscience is in the keeping of the Swarajists."

জুহু থেকে ফিরে এসেই পিতৃদেব সিরাজগঞ্জ প্রাদেশিক সম্মেলনে যাত্রার উদ্যোগ করলেন। এই সম্মেলন ১৯২৪ সালে মে মাসের শেষাংশে ও ৪ঠা জুন মৌলানা আক্রাম খাঁর সভাপতিত্বে হয়েছিল। এ অধিবেশনে পিতৃদেব স্বরাজের পথে জাতির অগ্রগতিতে বেঙ্গল-প্যাক্টের প্রয়োজনীয়তা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন এবং বিরুদ্ধ পক্ষের যুক্তিজাল ছিন্ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, মহাত্মা গান্ধী, লালা লাজপত রায়, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও অন্যান্য প্রাদেশিক নেতৃগণের ঘোর-আপত্তি ও সতর্ক-বাণী সত্বেও এই সম্মিলনে বেঙ্গল-প্যাক্ট গৃহিত হয়েছিল।

এ নিয়ে সংবাদপত্রের মধ্য· দিয়ে পিতৃদেবকে কম আক্রমণ করা হয়নি। অনেকে এমনও বলেছিলেন যে, যেহেতু প্রাদেশিক কনফারেন্স কংগ্রেসেরই শাখা-বিশেষ, সেহেতু, যে প্রস্তাব কংগ্রেস অধিবেশনে গৃহিত হয়নি, তা প্রাদেশিক সম্মিলনে গৃহিত হওয়া অসঙ্গত।

পিতৃদেবের জীবনে বাধাবিঘ্ন নিত্য-সহচর ছিল। অসীম ক্ষমতা বলে যখন তিনি একটা বাধা অপসারণ করে সফলতা অর্জ্জন করেছিলেন, অমনি সঙ্গে সঙ্গে নূতন বাধা সম্মুখে পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে, এ আমরা সর্ব্বদাই দেখেছি।

সে সময় গোপীনাথ সাহা নামীয় একজন যুবক তৎকালীন পুলিশ কমিশনার স্যার চার্লস টেগার্ট ভ্রমে মিঃ ডে নামক একজন ইংরেজের প্রাণনাশ করে। অসহযোগ-আন্দোলনের সময় পুলিশ কমিশনারের আদেশে নানাবিধ অত্যাচারের উত্তরই এ যুবক হয়তো দিতে চেয়েছিল। দেশজননীর অপমানে ক্ষুব্ধ হয়েই হয়তো এ পথ সে বেছে নিয়েছিল। বিচারের পর গোপীনাথ সাহা

যেরূপ নির্ভীকভাবে অবহেলার সঙ্গেই জীবন-বিসর্জ্জন দিয়েছিল, তাতে তার পথ কারও কারও পক্ষে সমর্থনীয় না হলেও, দেশের জন্য তার মহান্ আত্মোৎসর্গে সিরাজগঞ্জ সম্মিলনীতে ৪ঠা জুনের অধিবেশনে, গোপীনাথের হিংসামূলক কাজ সমর্থন না করেও, স্বার্থ-ত্যাগের আদর্শকে বিপথ চালিত জেনেও, তাঁর আত্মদানের প্রশংসা করে, সম্মান প্রদর্শন করে, প্রস্তাব গৃহিত হয়েছিল।

এই প্রস্তাব নিয়ে ইউরোপীয়গণ, গভর্ণমেণ্ট ও গভর্ণমেণ্টের ওদেশের এক শ্রেণীর লোক তাঁদের বিরক্তি ও অসন্তোষ প্রকাশ করে সংবাদপত্র মুখরিত করেছিল। এমন কি মহাত্মা গান্ধীও এতে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। গভর্ণমেণ্ট পিতৃদেবকে বিপ্লবের পরিপোষক বলে উল্লেখ করতেও কুণ্ঠিত হলেন না। বিপ্লববাদীদের পন্থা সম্বন্ধে তাঁর মতামত আগেই বলেছি। মহাত্মার সঙ্গে পিতৃদেবের এই প্রস্তাব নিয়ে অনেক বাদানুবাদ হয়েছিল, কিন্তু পিতৃদেবের মৃত্যুর পর মহাত্মা বলেছিলেন "গোপীনাথ সাহা সম্বন্ধে আমাদের বাদানুবাদ প্রেমের কলহই ছিল।" তবে কি সিরাজগঞ্জে গোপীনাথ সাহার প্রস্তাবে মহাত্মার নীরব সমর্থন ছিল ?

"বিপ্লববাদী" ও "ধ্বংস মূলক কার্য্যের সমর্থক" ইত্যাদি নানা রকম বিশেষণেই পিতৃদেব তখন বিভূষিত হতেন। তাঁর মৃত্যুর পর ৺ পৃথ্বিশ চন্দ্র রায় পিতৃদেবের জীবনীতে তিনি ধ্বংসমূলক কার্য্যের সহায়ক ছিলেন বলে লিখেছেন। পৃথ্বিশ রায়ের মতে পিতৃদেব অত্যন্ত ভাবপ্রবণ, অসহিষ্ণু সংস্কারক ছিলেন। আমলাতন্ত্র ধ্বংস করতে হবে, এবং ভাবের আবেগে ১৯২১ সালে বিশ্ববিদ্যালয়কে গোলামখানা বলে তা ধ্বংশ করতে চেষ্টা করে, পৃথ্বিশ রায়ের মতে, পিতৃদেব অসহিষ্ণুতার পরিচয়ই দিয়ে গিয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন যে আমলাতন্ত্র

ধ্বংশ করতে পিতৃদেব সক্ষম হয়েছিলেন সত্যি, কিন্তু গঠন-মূলক-কার্য্যে তিনি সাফল্য-লাভ করতে পারেন নি। কারণ ঢাকায় এবং সমগ্র বাঙ্গলা-ব্যাপী জাতীয়-বিদ্যালয়-সমূহ একটিও জয়-মণ্ডিত হতে পারেনি যার ফলে ১৯২২-২৩ সালের মধ্যেই তাঁর ধ্বংশ-কার্য্যের শ্রম পণ্ড করেই আমলাতন্ত্রের বিদ্যাপীঠ-সমূহ আবার পূর্ণ হয়েছিল।

৺পৃথ্বিশ রায় আরো বলেন যে মৃত্যুর অনতিপূর্ব্বে পিতৃদেব এটা বুঝতে পেরে তাঁর এক বন্ধুকে বলেছিলেন যে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট না হলে জাতীয় বিদ্যালয় সাফল্য-লাভ করতে পারেনা। বিশ্ববিদ্যালয়-বর্জ্জন জাতীয়-কার্য্য-প্রণালীর এক দুর্ব্বল পন্থাই ছিল।

৺ পৃথ্বিশ রায়ের মতে ভাবের আবেগে গোলামীর যাতনায় অস্থির না হয়ে পিতৃদেব যদি ধীর ভাবে চিন্তা করে এ কার্য্যে অগ্রসর হতেন তবে দেশের অগণিত তরুণদের জীবন হয় তো• তাঁর এ অবিবেচনার জন্য ব্যর্থ হতো না।

৺ পৃথ্বিশ রায়ের এ কথা স্থূলভাবে সত্য বলেই মনে হবে। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে এটা দেখা যাবে যে, স্থূলদর্শীদের মতে পিতৃদেব জাতীয়-শিক্ষায়তন গড়ে যেতে পারেন নি সত্য—কিন্তু 'চিত্ত-শিক্ষায়তন' তিনি সুদৃঢ় ভাবেই গঠিত করেছিলেন এবং তার মূল্য বড় কম নয়।

বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংশ করতে না পারাতে ভালই হয়েছিল—কারণ চাল দিয়ে পিতৃদেব যা করতে পারতেন, প্রেমের বলে তার চেয়েও বেশী গঠনকার্য্য করে গিয়েছেন। কাজেই তিনি শুধু ধ্বংশই করেছেন, গঠন করতে সক্ষম হন নি, এ কথাটা বলা খুবই ভুল হবে। জাতীয়-শিক্ষায়তন তিনি প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি কিন্তু আত্মশক্তি-লাভের শিক্ষায়তন তিনি প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন। "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ, ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন"-আত্মশক্তি লাভ না করলে

বিদ্যাবুদ্ধি, বহুশ্রুতি ও প্রবচণে কোন লাভ নেই, পিতৃদেব এটা বুঝেছিলেন শুধু নয়—তাঁর সমগ্র জীবন দিয়েই তা তিনি দেশবাসীকে দেখিয়ে গিয়েছেন।

কূট-রাজনৈতিক পিতৃদেব ছিলেন না, তাই তিনি হিসাব করে কার্য্যে অগ্রসর হননি। আত্মচেতনায় দেশকে উদ্দীপ্ত করার বাসনা তাঁর অন্তরে অগ্নিশিখার মতই জ্বলছিল। তাই পরাধীনতার গ্লানি মোচন-কল্পে তিনি নিজের পার্থিব যা কিছু সবই বিলিয়ে দিয়ে, গঠন করে গেলেন তাঁর গৌরবদৃপ্ত জীবন-শিক্ষায়তন। আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষায় যা কিছু অসংস্কৃত, অমার্জ্জিত, বিকৃত, হীন ও বিজাতীয় সে সব কিছু পরিশুদ্ধ, মার্জ্জিত ও পবিত্র করে আমাদের শিক্ষাকে পরিপূর্ণ করবার জন্য, সমগ্রজাতিকে তাঁর জীবন-সূর্য্য-কিরণ-স্নাত-আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য আমাদের সম্মুখে রেখে গিয়েছেন তাঁর আদর্শ 'চিত্ত-শিক্ষায়তন'। তাঁর এই শিক্ষায়তনের ধ্বংশ নেই। চির-শতাব্দীর বিস্মৃতির তলে ডুবে যাবেনা, বিরুদ্ধ-সমালোচকদের হীন, হেয় সমালোচনার ধারাবেগ তাকে ভাসিয়ে নিতে পারবেনা কখনো। তার অবদান চিরকালের। শ্বাশতমহিমায় সমাসীন থেকে ধ্রুবতারকার মতই জাতির দুর্দ্দিনে পথ-নির্দ্দেশ দিবে।

কংগ্রেস, কনফারেন্স, স্বরাজ্যদল, কাউন্সিল, ও করপোরেশনের কার্য্যে পিতৃদেব তাঁর জীবন উৎসর্গই করলেন। যে সাহিত্য-সাধনা তাঁর আশৈশবের সাথী ছিল, তাকেও তিনি ক্রমশঃ দূরে সরিয়ে দিলেন। এ সময় আমরা আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী-জীবনের সান্ধ্য-সম্মিলনের অভাব তীব্র ভাবেই অনুভব করতাম। দেশসেবার গুরুভার ও দায়ীত্ব তাঁর ক্ষীণ রুগ্ন দেহ যে আর বেশীদিন বহন করতে পারবেনা তা আমরা ভালকরেই বুঝেছিলাম। কিন্তু আমাদের আশঙ্কা তিনি তার অদম্য উৎসাহ ও কর্ম্মশক্তির দ্বারা দুর করে দিতেন।

এই সালেই ২৪শে আগষ্ট কলিকাতায় বাগবাজারে পশুপতি বসুর গৃহে নিখিল-ভারত-স্বরাজ্য-দলের এক বিরাট অধিবেশন হয়। এই সভার সভাপতিরূপে পিতৃদেব সমগ্র ভারতে স্বরাজ্যদলের বিজয়-বার্ত্তা ঘোষণা করে স্বরাজ্যের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছিলেন। এই প্রকার অমানুষিক পরিশ্রমে তাঁর শরীর জীর্ণ হতে দেখে আমরা তাঁকে বিশ্রামের জন্য সিমলা-শৈলে আমাদের সঙ্গে যেতে বিশেষ অনুরোধ করাতে তিনি সম্মত হলেন।

আমার স্বামী ও আমি হাইকোর্টের পূজাবকাশের আগেই সেখানে চলে গিয়েছিলাম। মা, পিতৃদেবকে নিয়ে সেখানে এলেন। সিমলা সহর থেকে কিছু দূরে 'ওয়াইল্ড ফ্লাওয়ার হল' নামক একটি হোটেলে আমরা ছিলাম। এখানে এসে নির্জ্জন শান্ত-পরিবেশে পিতৃদেবের শরীরের দ্রুত উন্নতি হতে লাগলো। সকালে সন্ধ্যায় নিত্য-ভ্রমণ ও দৌহিত্রদের সঙ্গে খেলা-ধূলায় তাঁর ক্লান্তির অপনোদন হতে লাগলো। বহুদিন পর আবার সান্ধ্য-বৈঠকে তিনি তাঁর প্রিয় কাব্য ও সাহিত্যকে স্মরণ করলেন। কিন্তু পূর্ব্বেই বলেছি যে বাধাবিঘ্ন তাঁর জীবনের নিত-সহচর হয়েছিল। তাঁকে সাময়িক বিশ্রাম দেবার অভিপ্রায় ভগবানের বোধ হয় ছিলনা—তাই চির-বিশ্রামের পথেই তিনি তাঁকে নিয়ে চল্লেন।

২৫শে অক্টোবর বাঙ্গলা দেশে তুমুল কোলাহল আরম্ভ হলো। স্বরাজ্য দলের তীব্র প্রভাবে বিচলিত হয়ে তাকে খর্ব্ব করতে যেন বদ্ধ-পরিকর হয়েই গভর্ণমেণ্ট ২৫শে অক্টোবর বেঙ্গল অর্ডিনান্স জারী করেন। অর্ডিনান্সের বলে বাঙ্গলার কংগ্রেসের সম্পাদক অনিলবরণ রায়, স্বরাজ্যদলের সম্পাদক সত্যেন্দ্র চন্দ্র মিত্র, করপোরেশনের স্বরাজ্যদলের প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষ সুভাষ চন্দ্র বসু আমলাতন্ত্রের কবলিত

হলো। অর্ডিনান্স জারীর কারণ গভর্ণমেণ্ট দেখালেন এই বলে যে বাঙ্গলাদেশ বিপ্লবীতে ভরে গিয়েছে, তারা দেশের উন্নতির হন্তারক হচ্ছে এবং নিরাপত্তার বিঘ্ন-স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাজেই এই ভয়ানক পরিস্থিতি হতে দেশকে উদ্ধার করবার জন্যই এই অর্ডিনান্স। অর্ডিনান্স জারী করে স্বরাজ্য পার্টির প্রভাব ক্ষর্ব্ব করবার ইচ্ছাতেই এবং গোপীনাথ সাহার প্রস্তাবের প্রতি-উত্তরই গভর্ণমেণ্ট দিলেন। বেঙ্গল অর্ডিনান্স যেন পিতৃদেবকে সম্মুখ-সমরেই আহ্বান করলো। প্রিয় শিষ্যদের ধৃত হওয়ার সংবাদে পিতৃদেবের সে উত্তেজিত অবস্থা কখনো ভুলবোনা। "সুভাষকে ধরেছে! এবার গভর্ণমেণ্টকে কাঁপিয়ে ছাড়ব।" সে দৃঢ়-সংকল্প তাঁর বলার ভঙ্গীতে এমন মূর্ত্ত হয়ে উঠেছিল, যে ভাষায় তা প্রকাশ করতে আমি অক্ষম। ডাইনে বাঁয়ে তাঁর প্রধান সহকর্ম্মীদের বেঙ্গল অর্ডিনান্সে ধৃত করে গভর্ণমেণ্ট পিতৃদেবের কর্ম্মশক্তিকে পঙ্গু করবার জন্যই বদ্ধপরিকর হলো।

কোন রকমে আমরা অনুবোধ-উপরোধ করে ক'টা দিন তাঁকে আরো আটকে রাখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সুভাষের গ্রেপ্তারের সংবাদ নলিনীরঞ্জন সরকারের কাছ থেকে পেয়ে তাঁকে আর ধরে রাখা অসাধ্য হলো! নানারকম চিন্তাভারে তিনি জর্জ্জরিত হলেন। তাঁর কংগ্রেসের কার্য্যের প্রধান সহকর্ম্মীগণ অপসারিত, তাঁর করপোরেশনের গঠনমূলক কার্য্যের শ্রেষ্ঠকর্ম্মী সুভাষ আজ কারারুদ্ধ। এই ভাবেই গভর্ণমেণ্ট তাঁর করপোরেশনের আরব্ধ-কার্য্য-পদ্ধতির মূলে কুঠারাঘাত করল। কলিকাতার নাগরিকদের সর্ব্ববিধ কল্যাণকর কার্য্যের সূত্রপাতেই পিতৃদেবের দক্ষিণ হস্ত পঙ্গু করে দিল। এই রকম মানসিক অস্থিরতা ও অন্তর্দ্দাহ নিয়ে তিনি সুভাষের গ্রেপ্তারের খবরের সঙ্গে সঙ্গেই সংবাদ পত্রে তাঁর বক্তব্য জানিয়ে ২৭শে অক্টোবর কলিকাতা রওনা হলেন।

এই সময়ে একটি ঘটনা মনে পড়ে। কলিকাতা আসবার সময়, বারমুলা হতে ফেরবার পথে সন্ন্যাসী-প্রদত্ত মাদুলীটি হাত থেকে কখন ছিড়ে পরে গেল, তিনি বা আমরা কেউ তা জানতেই পারিনি। শত অনুসন্ধানেও আর তা পাওয়া গেলনা। অজানা এক আশঙ্কায় আমরা শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। সন্ন্যাসী-প্রদত্ত-রক্ষা-কবচ হারিয়ে পিতৃদেব ক'মাসের মধ্যেই তো নিজেও হারিয়ে গেলেন।

কলিকাতা এসেই পিতৃদেব এই অন্যায়, অসঙ্গত অর্ডিনান্সের বলে গ্রেপ্তারের তীব্র প্রতিবাদ করলেন। তাঁর এই প্রতিবাদে সমগ্রদেশে হুলুস্থূল পড়ে গেল, এমন কি অন্যান্য বিভিন্ন দল, যারা স্বরাজ্য পার্টির বিরোধী ছিল তারাও এই অর্ডিনান্সে ক্ষুব্ধ হলো। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয়, ভারতের জাতীয় মহাসমিতির প্রাক্তন সভানেত্রী শ্রীযুক্তা বেসান্ত লর্ড রিডিং এর এই কার্য্য সমর্থন করলেন। ইউরোপীয়ানরা যে অর্ডিনান্স সমর্থন করেছিল তা বলাই বাহুল্য। শ্রীমতি বেসান্তের বিরুদ্ধে সংবাদপত্র সমূহ ক্ষুব্ধ হয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানালো। গভর্ণমেণ্ট এই অর্ডিনান্স প্রয়োগ করে স্বরাজ্যদলেরই প্রাধান্য স্বীকার করে নিল বলতে হবে।

সুভাষ প্রভৃতির গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে কলিকাতা টাউন হলে এক বিরাট সভা আহূত হলো। সে সভায় পিতৃদেব জ্বালাময়ী ভাষায় বল্লেন, “বাংলার যুবক, তোমাদের হৃদয়ে স্বাধীনতার আগুণ জ্বলিয়া উঠুক, স্বাধীনতার জন্য মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে ছুটিয়া এস, আত্মবিসর্জ্জন দিতে দ্বিগুন তেজে জলিয়া উঠ! এই জরাজীর্ণ দেহ লইয়া সর্ব্বাগ্রে আমি সম্মুখীন হইব। তোমরা অনুসরণ কর। মা, একবার সংহার মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হও মা, আমরা সকলে তোমার সম্মুখে আত্মোৎসর্গ করিয়া স্বাধীনতার পথ উন্মুক্ত করিয়া রাখি।”

কবপোরেশনের প্রধানকর্ম্মকর্ত্তা সুভাষের অপসারণের প্রতিবাদ-সভায় মেয়রের আসন থেকে পিতৃদেব বলেছিলেন যে, তিনি মনে কবেন যে বৈপ্লবিক আন্দোলনের মূল হেতু হলো স্বাধীনতার তৃষ্ণা, তাই নির্য্যাতনে দেশে বিপ্লবের উচ্ছেদ তো হবেই না বরং তা আরো বেড়েই যাবে। মুক্তিকামী কোন জাতিকেই নির্য্যাতন বা পীড়ণের দ্বাবা ধবাতল হতে বিলুপ্ত কবা যায় না এবং স্বাধীনতা-প্রয়াসী কোন জাতিকে প্রতিরোধ করবার শক্তি কাবো নেই বলেই তিনি বিশ্বাস করেন। বজ্রগম্ভীর স্বরে তিনি বল্লেন "স্বাধীনতাব জন্য আমি জীবন বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হযেছি। বিপ্লববাদীব বর্ত্তমান পন্থা বিচার করলে আমি বিপ্লববাদী নই, কিন্তু আমার মন বিপ্লবের পক্ষপাতী। আজ এ স্থানে দাঁড়িযে আমি ঘোষণা কবতে পাবি যে স্বাধীনতাব জন্য জীবনপাত করবাব প্রযোজন হলে আমি তাতেও প্রস্তুত। বিপ্লব-বাদমূলক আন্দোলনে যদি আমাব বিশ্বাস থাকতো, যদি আজও আমার বিশ্বাস হয যে এব সাহায্যে স্বাধীনতা লাভ হবে, তাহলে কালই আমি এ আন্দোলনে যোগদান কববো। কিন্তু আমি নিশ্চয়ই জানি যে তাতে আমরা সফলতা লাভ কববনা, সেজন্যই আমি এতে যোগদান করি না। কিন্তু স্বাধীনতাব জন্য বিপ্লববাদীদের যে হৃদয়াবেগ, তা আমিও অনুভব করছি। এই স্বাধীনতার জন্য যদি আমাব দুঃখ ভোগ, কৃচ্ছ্র-সাধনা অথবা আমাব প্রতি-শোণিত-বিন্দুপাতের প্রয়োজন হয়, আমি তাতেও প্রস্তুত আছি।" তাঁব দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে স্বাধীনতা-প্রয়াসী স্বরাজ্য দলের প্রভাব লক্ষ্য করেই বিনা অপরাধে সুভাষকে গ্রেপ্তার করা হযেছে। মেযরেব আসন থেকে তিনি গভর্ণমেণ্টকে যুদ্ধার্থে আহ্বান (Challenge) কবে কল্লেন, 'All that I say is that Mr. Subhas Chandra Bose is no more a revolutionary than I am. Why have they not arrested me? I should like to know why? If love of country is a crime I am a Criminal. If Mr.

Subhas Chandra Bose is a criminal, I am a criminal—not only the Chief Executive Officer of this Corporation, but the Mayor of this corporation is equally guilty."

সুভাষচন্দ্র ও অন্যান্যদের গ্রেপ্তারের কারণ দেখিয়ে গভর্ণমেণ্ট প্রকাশ করলো যে সন্ত্রাসবাদীদের ষড়যন্ত্রের আভাষ পেয়েই অঙ্কুরে বিনাশ করবার জন্যই গভর্ণমেণ্ট এদের গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হয়েছে। তদানীন্তন ইংরেজী দৈনিক সংবাদপত্র "ইংলিশম্যান্' সুভাষচন্দ্রকে এই ষড়যন্ত্রের অধিনায়ক বলে প্রকাশিত করায়, সুভাষচন্দ্রের এটর্নী এই সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা আনয়ন করেন। সাক্ষ্য-প্রমাণাদি সংগ্রহের জন্য 'ইংলিশম্যান্' গভর্ণমেণ্টের সাহায্য না পাওয়াতে মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তি হতে বহুমাস গত হয়ে গেল। এদিকে লণ্ডনে সাধারণ নির্ব্বাচনে বৃটিশ মন্ত্রিসভার রদবদল হয়ে লর্ড অলিভারের জায়গায় সংরক্ষণশীলদলের বার্কেনহেড প্রধানমন্ত্রী হলেন। ইণ্ডিয়া-অফিস কোন প্রমাণই সুভাষের বিরুদ্ধে সংগ্রহ করতে পারে নি।

এদিকে পিতৃদেবের প্রতিষ্ঠিত 'ফরওয়াড' দৈনিকে এই মর্ম্মে লণ্ডন থেকে প্রেরিত একখানি পত্রে প্রকাশ পেল যে কোন এক ব্যক্তির মৌখিক কথার উপর নির্ভর করেই সুভাষ সন্ত্রাসবাদী-ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বলে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কিন্তু এ সম্পর্কেও কোন প্রমাণাদি সংগ্রহ করা যায় নি। পত্রটি 'ফরওয়াডে' প্রকাশিত হলে এখানকার গভর্ণমেণ্ট অসুবিধা বোধ করলো। গভর্ণমেণ্ট কিন্তু পিতৃদেবের দৃঢ় আহ্বানের (challenge) উত্তর অন্যভাবে দিয়েছিল। তারা পিতৃদেবের সঙ্গে একটা আপোষের প্রস্তাব করে পাঠালো। মহাত্মাজী তখন রাজ-নৈতিক ক্ষেত্র থেকে এক রকম অবসর গ্রহণ করে তাঁর খদ্দর-প্রচলন কার্য্যে ব্যাপৃত, ছিলেন। রাজনীতি ক্ষেত্রের পরিচালক ছিলেন তখন

পিতৃদেব ও তাঁর স্বরাজ্যদল। স্বরাজ্যদলের প্রভাব তখন বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা লর্ড লিটন খুব ভালভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন এবং পিতৃদেবের উপর তাঁর অগাধ ব্যক্তিগত শ্রদ্ধাও ছিল। কাজেই তখন কংগ্রেসের সহিত আপোষ মানেই তিনি বুঝেছিলেন পিতৃদেবের সহিত আপোষ করা। তাই বাইরের জগতে এ আপোষের কথা অজানা থাকলেও লর্ড লিটন ও পিতৃদেবের মধ্যে এ আপোষের কথাবার্ত্তা বহুদিন থেকেই চলছিল।

বাঙ্গলার এই দুর্বিবপাক মহাত্মা গান্ধীকে বিচলিত করলো। তিনি পিতৃদেবের সঙ্গে দেখা করতে ৪ঠা নভেম্বর কলিকাতা এলেন। আমাদের রসারোডের বাড়ীতেই তিনি থাকতেন। তাঁর আসবার কিছুদিন পূর্ব্বে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুও এসেছিলেন এবং স্বরাজ্যদলের অন্যান্য প্রাদেশিক নেতৃবৃন্দও এসে সমবেত হলেন কলিকাতায়। মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিতজী ও পিতৃদেবের সঙ্গে পরামর্শ করে বুঝতে পারলেন যে স্বরাজ্যদলের প্রভাব, কর্ম্মকুশলতা এবং শৃঙ্খলা দেখেই গভর্ণমেণ্ট এ চণ্ডনীতির প্রচলন করেছে। তখন তিনি স্বরাজ্যদল সম্বন্ধে জুহুতে যা বলেছিলেন তা সমস্ত ভুলে গিয়ে সমগ্র দেশকে একমতাবলম্বী করবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। আমাদের রসারোডের বাড়ীতে ৪ঠা নভেম্বরই এক বৈঠকে সমগ্র দেশের কর্ম্মপন্থা স্থির করে নিম্নলিখিত বিবৃতি দিলেন,

১। অসহযোগ-আন্দোলন আপাততঃ স্থগিত থাকবে।

২। খদ্দর পরিধান ও বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন কংগ্রেসের মুখ্য-কার্য্যরূপে পরিগণিত হবে।

৩। স্বরাজ্যদলের কার্য্য কংগ্রেসের অন্তর্গত কার্য্য বলে গণ্য হবে, এবং তার পরিচালনা ও অর্থ সংগ্রহের দায়ীত্ব স্বরাজ্যদলের উপর ন্যস্ত থাকবে।

মহাত্মা গান্ধী চিরদিনই বিপ্লব-বিরোধী ছিলেন। কিন্তু বাঙ্গলার এ অর্ডিনান্সের প্রচলন দেখে তিনি মনে করলেন যে গভর্ণমেন্টের এ কার্য্য বিপ্লবীদের কার্য্য হতেও হীনতর। সেজন্যই তিনি পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ও পিতৃদেবের সঙ্গে একযোগে উপরিউক্ত বিবৃতি স্বাক্ষর করেছিলেন। এখানেও স্বরাজ্যদল জয়ী হলেন মহাত্মাকে তাদের স্বমতে এনে। স্বরাজ্য পার্টিই কাউন্সিল ইত্যাদিতে কংগ্রেসের প্রতিনিধি বলে গণ্য হলেন।

মহাত্মা গান্ধী, মতিলাল নেহেরুও পিতৃদেবেব মিলিত এই বিবৃতি দেশে ঐক্য-বন্ধনের সূচনা করে অশেষ কল্যাণসাধনের পথ প্রশস্ত করে দিল।

এবপর ২১শে নভেম্বব পিতৃদেব সর্ব্বদল-সম্মেলনের অধিবেশনে যোগদানের জন্য বোম্বাই গেলেন। সেখানে মহাত্মা গান্ধী স্বরাজ্য-দলের অপূর্ব্ব সাফল্যকেই গভর্ণমেন্টের চণ্ডনীতির হেতু বলে ঘোষণা করেছিলেন।

প্রতিকূল-অবস্থার মধ্যে নিরন্তর সংগ্রাম করে এতদিনে পিতৃদেব তাঁর স্বরাজ্যদলকে কংগ্রেসের দ্বারা অনুমোদিত করিয়ে বিজয়ী হলেন।

বোম্বাই থেকে এসে পিতৃদেব 'একাই একশো' হয়ে কর্ম্মে লিপ্ত হলেম। তাঁর প্রিয় সহকর্ম্মীদের অভাবে তিনি খুবই ম্রিয়মান হয়ে পড়েছিলেন। বিশেষ করে সুভাষ চন্দ্রের অভাব তিনি বেশী উপলব্ধি করতেন। সুভাষ চন্দ্রকে গ্রেপ্তার করে বৃটিশ গভর্ণমেন্ট সত্যিই পিতৃদেবের ডান হাতখানাই যেন কেটে দিল। সুভাষ প্রমুখদের গ্রেপ্তারে দেশের মনোভাব উপলব্ধি করে এখনি অর্থ

সংগ্রহের উপযুক্ত সময় জেনে স্বরাজ্য-ফাণ্ডে অর্থ-সংগ্রহের ভার পিতৃদেব নিজ হাতে গ্রহণ করে, ১লা ডিসেম্বর থেকে সাত দিন 'স্বরাজ্য সপ্তাহ' অর্থ সংগ্রহের জন্য স্থির করলেন। এই সময় তাঁর প্রিয় সেবক নাড়াজোলের কুমার দেবেন্দ্র লাল খাঁ ও শ্রীরামপুরের কুমার তুলসীচরণ গোস্বামী তাদের কর্ম্ম ও প্রভূত অর্থদ্বারা পিতৃদেবকে যথেষ্ট সহায়তা কবেছিলেন। পিতার মতই এদের উপর আবদার করতেন তিনি,—এবং তাঁর সে আবদার রাখতে এঁরা কখনো কার্পণ্য করেন নি। কতদিন এমন হয়েছে যে পিতৃদেব এঁদের নামে দেয়-চাঁদার অঙ্ক না জিজ্ঞেস করেই চাঁদার খাতায় বসিয়ে দিয়েছেন—এবং এঁরাও পিতৃদেবের সে ইচ্ছা আনন্দের সঙ্গেই পালন করেছেন।

রসারোডের বাঁড়ীতে সমস্ত কর্ম্মীদের একত্র করে তিনি এ কার্য্যে ঝাঁপিয়ে পরলেন। দলে দলে বাঙ্গলার তরুণ সম্প্রদায় ভলান্টিয়ার হয়ে এসে একার্য্যে যোগ দিল। ছোট ছোট কালো রংএর মুখ-বন্ধ-করা টীনের বাক্স প্রত্যেক ভলান্টিয়ারকে দেওয়া হলো। উদয়াস্ত প্রাণান্ত পরিশ্রম করে সাত দিনের মধ্যে লক্ষাধিক টাকা এ কাজের জন্য সংগৃহিত হয়েছিল।

অর্থ সংগ্রহের কাজে প্রতিদিন পিতৃদেবকে শুধু সমগ্র কলিকাতায় বক্তৃতাই করতে হয়নি, প্রত্যেক পাড়ায়, প্রতি দোকানে তিনি নিজে গিয়ে ভিক্ষা চেয়েছেন এ কাজের জন্য। যখন দেখতাম অত্যধিক পরিশ্রমে তাঁর দেহ ভেঙ্গে পড়েছে তখন তাঁকে দেখে এক একবার ছোটবেলাকার লেখা-কবিতা মনে পড়তো—

"কুবের ভাণ্ডার যাঁর সুখ ইচ্ছা নাই
ত্যজিয়া সোনার কাশী গায়ে মাখেন ছাই॥"

সত্যি তখন তাঁকে দেখে ভোলানাথের কথাই মনে পড়তো। কিন্তু আমাদের শত অনুরোধেও তাঁকে তাঁর আরদ্ধকাজ থেকে নিবৃত্ত করতে পারিনি, তাই অন্তিমেও দেশ ও দশের কার্য্যে তিনি তাঁর প্রাণপুষ্পকে নিবেদন করেই শান্ত হয়ে গেলেন। মহাযজ্ঞে মহাত্মার ভিক্ষা এ যেন যবন হরিদাসের মৃত্যুতে মহাপ্রভুর 'ভিক্ষা দেহ তো আমারে'। চতুর্দ্দশ শতাব্দী ও বিংশ শতাব্দী যেন একই সুরে একই যজ্ঞের জন্য ভিক্ষা চেয়ে চলেছে।

অক্লান্ত ও অদম্য কর্ম্মী দেখেছিলাম সুভাষচন্দ্রকে। আপন-হারা হয়ে এমন ভাবে দেশের কার্য্যে তৃপ্তিবোধ করতে আর কাউকে দেখেছি বলে মনে হয় না। তখনি জানতাম যে নিজের জীবনপণ করে, সমস্ত বিপদকে তুচ্ছ করে স্বাধীনতার যুদ্ধে এভাবে মন-প্রাণ ঢেলে দিতে পারেন, সে স্বাধীনতা আমরা অর্জ্জন করবই।

স্বাধীনতা-লাভের জন্য সুভাষচন্দ্রের যে অপরিসীম আকাঙ্ক্ষা, যে আকাঙ্ক্ষার তীব্র-দহনে কোহিমার রণাঙ্গণে মুষ্টিমেয় ভারতীয়সৈন্য নিয়ে তিনি অমিতবলশালী মিত্রশক্তির সম্মিলিত-বাহিনীকে পরাজিত করে দেশের বুকে স্বাধীনতার পতাকা তুলে ধরেছিলেন, সে গৌরব-গাঁথা আমাদের শান্তিপূর্ণ-উপায়ে-স্বাধীনতা-পাওয়ার ইতিহাসে নামমাত্র উল্লেখ থাকলেও আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। সুভাষচন্দ্রের আকাঙ্ক্ষার মধ্যে পিতৃদেবের আকাঙ্ক্ষাই রূপ পেয়েছে একথা চিন্তা করলে আমাদের পক্ষে অশ্রুসংবরণ করা অসম্ভব হয়।

এই সময় অর্থ-সংগ্রহের জন্য কলিকাতার এক সভায় পিতৃদেব মর্ম্মন্তুদ ভাবেই বলেছিলেন, "আমি তো ভিক্ষাঝুলি নিয়ে আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হইনি, আমি চাই ভারতের মুক্তির

জন্য আপনাদের দেয় শুল্ক। দেশের লক্ষ লক্ষ প্রাণ কি জাতীয় জীবন সংরক্ষণে মুক্ত হস্তে ছুটে আসবেনা? আমাদের এ দুঃসাধ্য সংগ্রামে কি উপায়ে বিজয়লক্ষ্মী আমাদের করতলগত হবে? আমি চিন্তা করে পাগলের মত হয়ে গিয়েছি। আপনাদের কাছে আমার এই অনুরোধ যে যদি স্বরাজ-লাভের পূর্ব্বেই আমার মৃত্যু হয়, তবে আমার চিতাভস্মের উপর কোন স্মৃতিচিহ্ন না রেখে শুধু এই মাত্র লিখে রাখবেন, "বাঙ্গালায় একজন পাগল জন্মেছিল, এই পথ দিয়ে তার অতৃপ্ত আত্মা চলে গিয়েছে।" খুবই দুঃখের বিষয় যে পিতৃদেব তাঁর এত পরিশ্রমে সংগৃহীত অর্থ নিয়ে পল্লীসংগঠন কার্য্যের ব্যবস্থা করে যেতে পারেন নি। কেবল কর্ম্মপদ্ধতির নির্দ্দেশ করেই তিনি মহাপ্রস্থান করেন।

আজ ভাবি, পূর্ব্ববর্ত্তী নেতৃগণের আরাধ্য স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি সত্য কিন্তু তাঁদের আরদ্ধ-কার্য্য সুসম্পন্ন করবার প্রয়াস আজ স্বাধীন ভারতের কয়জন করছে। তাঁদের "দেশের জন্য আমি" এখন কি "আমার জন্য দেশ"—এতেই পরিণত হয়নি? পিতৃদেবের কার্য্যাবলী, সাধনা, স্বপ্ন আজ বিস্মৃতির গর্ভেই বিলীন হয়েছে, কিন্তু একথা আমাদের কিছুতেই ভুললে চলবে না যে কে এই বহুকাল অধীনতা-নিপীড়িত অধঃপতিত জাতির বুকে স্বাধীনতার বাসনা জাগরিত করেছিলেন। শুধু বক্তৃতা করেই নয়, কার্য্য দিয়ে, জীবন দিয়ে জাতিকে তা বুঝিয়েছিলেন। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" এই বীর্য্যবাণীর উদ্গাতা হয়ে আমাদের তিনি বুঝিয়েছিলেন যে ভিক্ষার দ্বারা স্বাধীনতা পাওয়া যায় না, স্বাধীনতা-অর্জ্জনে ত্যাগ চাই, বিসর্জ্জন চাই। বাক্যে ও কার্য্যে পিতৃদেবের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য ছিল। তাই তিনি যা বলতেন, নিজেও সর্ব্বস্ব দানে তা সাধনা করতেন।

রাজনীতিকে তিনি কোনদিন ব্যবসায় বলে মনে করেননি,

তাই তাঁর রাজনৈতিক জীবনেও কখনো স্বার্থের বা ক্ষুদ্রতার ছায়াও স্পর্শ করতে পারেনি। রাজনীতি ছিল তাঁর কাছে দেশমাতৃকার পূজার উপকরণ মাত্র। তাঁর রাজনীতি ছিল সত্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, প্রাণপদ্মের উপর স্বাধিষ্ঠিত। মাতৃপূজার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঋত্বিক ছিলেন তিনি, এ পূজার অঞ্জলি ছিল তাঁর ত্যাগ আর প্রেম। তাই তাঁর আহ্বানে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান সকলে সমভাবে সাড়া দিয়েছিল। সে আহ্বান যেন তপঃসিদ্ধ যোগীর ধ্যানলব্ধ আত্মার উদাত্ত আহ্বান।

"মার অভিষেকে এস এস ত্বরা
মঙ্গল ঘট হয়নি যে ভরা
সবার পরশে পবিত্র-করা
তীর্থনীরে !
এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।"

তাই তাঁর এই আহ্বান-বাণী দেশবাসী উপেক্ষা করতে পারে নি। তাই সকলেই এসে সমবেত হয়েছিল মাতৃপূজার মন্দিরে।

"স্বরাজ্য সপ্তাহের" অপরিসীম পরিশ্রমের পর পিতৃদেব কিছুমাত্র বিশ্রাম না করেই ডিসেম্বর মাসের শেষে বেলগাঁও কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করতে গেলেন (ডিসেম্বর, ১৯২৪)। মহাত্মা গান্ধী এই অধিবেশনে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। মহাত্মা গান্ধী কাউন্সিল-প্রবেশ সম্পর্কে কোকনাদ-কংগ্রেসের সিদ্ধান্তই সমর্থন করেন। পিতৃদেবের সঙ্গে তাঁর যে মত-বিরোধ ছিল তা মহা-সম্মিলনীতে দূরীভূত হোল।

পিতৃদেবের জীবনের এই শেষ-কংগ্রেসে তিনি সম্পূর্ণ জয়যুক্ত হলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্বরাজ্যদলের কর্ম্মপদ্ধতি কংগ্রেস স্বীয়

কর্ম্মতালিকার অন্তর্ভূক্ত করে নিয়ে নিজ ত্রুটি সংশোধন করল। "এক বৎসরের মধ্যে আমি কংগ্রেসকে আমার স্বমতে আনব"। পিতৃদেবের এই বাক্য সফল হলো। এটুকু যে তিনি দেখে যেতে পেরেছিলেন আজ আমাদের তাই একমাত্র সান্ত্বনা।

ফরিদপুর প্রাদেশিক সম্মিলন—১৯২৫, ২রা মে

১৯২৪ সালে ৩১শে ডিসেম্বর ক্লান্ত দেহ নিয়ে তিনি বেলগাঁও থেকে কলিকাতায় ফিরে এলেন। আমি তখন অসুস্থ ছিলাম। পিতৃদেব আমাকে দেখতে বেলতলা বাড়ীতে এলেন। তিনি আমাকে দেখতে এলেন, কিন্তু তাঁকে দেখে আমি চোখের জল রাখতে পারলাম না—এতই শীর্ণ ও ক্লিষ্ট হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। আমাকে বল্লেন, "৭ই জানুয়ারী আমাকে কাউন্সিলের জন্য থাকতেই হবে, তারপর পাটনাতে প্রফুল্লর কাছে গিয়ে একটু বিশ্রাম করবো—শরীর ভাল করে এসে তোর নবাগতা কন্যাকে দেখবো।" এরই মাস খানেক আগে আমার মেজ ননদ শৈলর (মুর্শিদাবাদ, কাঞ্চনতলার ধীরেন্দ্র নাথ রায়ের পত্নী) প্রথমা কন্যা এখানে ভুমিষ্ঠ হয়েছিল, সে কথা মনে করে তিনি আমার শ্বশ্রূমাতাকে বল্লেন, "কই! কাঞ্চন-মালাকে আমাকে দেখালেন না?" শিশুকে কোলে নিয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন। এর ক'মাস পরেই পিতৃদেবের মৃত্যু হওয়াতে তাঁর স্নেহভরে-দেওয়া কাঞ্চনমালা নাম আমার ননদ আর বদলায় নি। এত কাজের মধ্যেও ব্যবহারিক জীবন সম্বন্ধে তিনি উদাসীন ছিলেন না, প্রত্যেককে তার প্রাপ্য অধিকার তিনি দিতেন।

আমাকে দেখে গিয়েই পরদিন ১লা জানুয়ারী পিতৃদেব অসহ্য কলিকের ব্যথায় কাতর হয়ে পরলেন। তাঁর অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে সকলের নিষেধ অগ্রাহ্য করেই আমি তাঁকে দেখতে গেলাম। গিয়ে দেখলাম অত অসহ্য ব্যথার মধ্যে তাঁর এক কথা—"৭ই

আমাকে কাউন্সিলে যেতেই হবে। ডাক্তারদের বল, আমার ব্যথা ভাল করে দিতে।" ব্যথার যন্ত্রনায় তো কাতর হয়েছিলেনই কিন্তু যদি কাউন্সিলে যেতে না পারেন সে কথা ভেবে তিনি আরও অস্থির হচ্ছিলেন। কারণ সেইদিন বেঙ্গল অর্ডিনান্স বিলের প্রস্তাব ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করবার কথা।

মর্ফিয়া ইনজেকসন্ করে ব্যথার উপশম অনেকটা হলো, কিন্তু জ্বরে শরীর খুবই দুর্ব্বল হয়ে পড়লো। পরদিন রাত্রে যন্ত্রনা বৃদ্ধি পাওয়াতে আবার মর্ফিয়া ইনজেকসনের আশ্রয় নিতে হলো। তাঁর মুখে শিশুর মত এক কথা "৭ই আমাকে কাউন্সিলে যেতেই হবে, আমি মরি আর বাঁচি।" কিন্তু অসুখ ক্রমে বেড়েই চল্ল। ৪ঠা জানুয়ারী তাঁর অবস্থা দেখে ডাক্তারগণ প্রমাদ গণলেন। সমস্ত রাত্রি অসহ্য যন্ত্রনার পর ভোরের দিকে তিনি একটু শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। তখন তাঁর হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া অত্যন্ত ক্ষীণ—পরদিন ৫ই তাঁর ব্যথার আরো উপশম হলো। এদিকে ডাক্তাররা এলোপ্যাথী চিকিৎসা করলেও তিনি নিজের মতানুসারে হোমিওপ্যাথী ঔষধ খেয়েছিলেন। অত্যন্ত বিশ্বাস ছিল তাঁর এই হোমিওপ্যাথীর উপর। দ্বারিক পিসামশায়ের (ডাঃ দ্বারিকা নাথ রায়) ঔষধ না খাওয়া পর্য্যন্ত তাঁর শান্তি হয়নি। ৬ই জানুয়ারী যন্ত্রনা না থাকলেও এতই দুর্ব্বল ছিলেন তিনি যে মা শঙ্কিত হয়ে আমার স্বামীকে বল্লেন "৭ই যখন কাউন্সিলে যাবেন বলছেন, তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড লয় পেলেও ওঁকে নিবৃত্ত করা যাবে না।" ৭ই জানুয়ারী তিনি এতই দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিলেন যে কথা বলতেও তাঁর কষ্ট হচ্ছিল। তবুও সকলকে ডেকে বল্লেন "আজ আমাকে যেতেই হবে, আমার শরীরের আগে আমার কর্ত্তব্য—এতে যদি মরেও যাই তবুও কারো বাধাই আমি শুনবনা।"

যে অর্ডিনান্স-বলে সুভাষচন্দ্র-প্রমুখেরা ধৃত হয়েছিল তা বলবৎ থাকার নির্দ্দিষ্ট-কাল ছিল ১৯২৫ এপ্রিল পর্য্যন্ত। গভর্ণমেণ্ট তাই ৭ই জানুয়ারী কাউন্সিলে তা পাশ করিয়ে আইনে বিধিবদ্ধ করার ব্যবস্থা করেছিলেন। পিতৃদেব বল্লেন, "আজ আমার দেশের সোনার ছেলেরা বিনাবিচারে নির্ব্বাসিত, আর আমি নিজের তুচ্ছ শারীরিক কষ্টের জন্য কি আমলাতন্ত্রকে দেশের প্রতিনিধি দ্বারা সে প্রস্তাব গ্রাহ্য করিয়ে নেবার সুযোগ দেব? প্রাণ থাকতেও তা হতে দেব না।" উত্তেজিত হয়ে একথা বলেই অবসন্ন হয়ে পড়লেন তিনি। আমরা তাঁর আচরণ দেখে বিস্ময়ে নির্ব্বাক হলাম। কাউন্সিল থেকে তিনি জীবন্ত ফিরে আসবেন কিনা সে সন্দেহই তখন হয়েছিল আমাদের।

পিতৃদেবের মানসিক অবস্থা ও মনের দৃঢ়তা দেখে চিকিৎসকগণ বাধ্য হয়েই তাঁকে যাবার সম্মতি দিলেন। শোবার ঘর থেকে ষ্ট্রেচারে করে তাঁকে নীচের মোটরে তোলা হলো, মা তাঁর সঙ্গে যাবার অনুমতি পেলেন না। কাউন্সিলে গিয়েও তিনি শায়িত অবস্থাতেই ছিলেন। সেদিন গভর্ণর স্বয়ং সভায় এসে অর্ডিনান্স আইনের সমর্থনে দীর্ঘ বক্তৃতা করলেন ও গভর্ণমেণ্টের পক্ষে স্যার হিউষ্টিফেনসন্ তা সমর্থন করলেন।

পিতৃদেবের এই অবস্থায় কাউন্সিলে উপস্থিতি যেন যাদুমন্ত্রের মতই কাজ করলো। নলিনীরঞ্জন সরকারের কাছে পরে আমরা শুনেছিলাম যে কর্ত্তব্যের আহ্বানে গুরুতর পীড়াকে উপেক্ষা করে অসুস্থ-অবস্থায় পিতৃদেবকে এভাবে আসতে দেখে তাঁর আন্তরিকতায় ও স্বদেশ-প্রেমে মুগ্ধ হয়ে এমন অনেক সদস্য যাঁরা এ যাবৎ পিতৃদেবের মতের বিরুদ্ধাচরণ করে এসেছেন, তারাও স্বতঃ

প্রবৃত্ত হয়ে তাঁর পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন। পিতৃদেবের উপস্থিতির প্রভাব অধিকাংশই সেদিন কাটাতে পারেন নি। ভোট-গণনা কালে দেখা গেল ৬৬ জন সদস্য অর্ডিনান্সের বিরুদ্ধে ও ৫৭ জন পক্ষে ভোট দিয়েছেন। টাউনহলের বাইরে অপেক্ষমান অস্থির জনসমুদ্র ভোটের ফলাফল জেনে আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে তুমুল জয়ধ্বনি করে পিতৃদেবকে অভিনন্দন জানালো। সেদিন তাঁর প্রভাব দেখে গভর্ণমেণ্টের দলীয়-লোকেরা বিস্মিত হয়েছিল। পিতৃদেব জয়ী হলেন সত্য কিন্তু গভর্ণরের অতিরিক্ত ক্ষমতাবলে অর্ডিনান্স্ বিল আইনে পরিণত হলো।

আজ ভাবতে লজ্জা হয় যে, যে সব স্বদেশীয়গণ তখন বৃটিশ রাজশক্তিকে জয়ী করবার জন্য স্বদেশের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন, তাদেরই মধ্যে অনেকে আজ স্বাধীন ভারতে গৌরবের সঙ্গেই উচ্চপদে সমাসীন রয়েছেন। পদলেহনকারীর বৃত্তি তারা কোনদিনও ত্যাগ করেননি বা করতেও পারবেন না। এ সূত্রে আমাদের দেশের গ্রাম্য ছড়ার কথাই মনে করিয়ে দেয়;

"এখন তুমি কার?
যখন থাকি যার কাছে
তখন আমি তার।"

এই মনোবৃত্তির মাশুল আমরা কতবার কতভাবেই না দিয়েছি! তবুও আমাদের চেতনা হয় না—শত ধিক্কারেই মন ভরে উঠে!

এরপর একটু সুস্থবোধ করেই পিতৃদেব পাটনাতে কাকার কাছে চলে যান। আমার জন্যই তাঁর সঙ্গে মার সে সময় যাওয়া হয়ে উঠেনি। কারণ ১৫ই জানুয়ারী আমার প্রথমা কন্যা বিহ্বলার

জন্মগ্রহণের পরই আমি টাইফয়েডে আক্রান্ত হই। আমাকে একটু সুস্থ দেখে মা পরে পাটনা গিয়েছিলেন। আমাকে দেখবার জন্য পিতৃদেব ক'দিনের জন্য কলিকাতায় মাঝে এসেছিলেন, ফিরে যাবার সময় মা তার সঙ্গেই পাটনা চলে গেলেন।

পাটনাতে তাঁর শরীর বিশেষ সুস্থ না হওয়াতে, ডাক্তারেরা তাঁকে রাজগৃহ যাবার পরামর্শ দিলেন। রাজগৃহ তিনি প্রায় বিশ দিন ছিলেন, এবং সেখানেও আশানুরূপ ফল না পেয়ে আবার পাটনায় ফিরে আসেন। ভোম্বল ও সুজাতা এসময় পিতৃদেবের সঙ্গেই ছিল। পাটনাতে তিনি এপ্রিলের শেষ পর্য্যন্ত ছিলেন। ৩রা এপ্রিল তিনি পাটনা থেকে নাটোরের স্বর্গীয় মহারাজা জগদীন্দ্র নাথ রায়কে, অসুস্থতার জন্য মুন্সিগঞ্জের সম্মিলনে যেতে পারলেন না বলে দুঃখ করে পত্র দিয়েছিলেন। এ চিঠিতে তিনি মহারাজাকে লিখেছিলেন যে "হয় ভাল করেই বাঁচবো, নয়তো ভাল করেই মরবো।" "ভালকরেই" যে তিনি 'মরলেন' তার আর সন্দেহ কি ?

পাটনায় অবস্থানকালে একজনের মধ্যবর্ত্তীতায় পুনরায় গভর্ণ-মেণ্টের সঙ্গে একটা আপোষ নিষ্পত্তির কথা চলছিল। এই মধ্যবর্ত্তী লোকটি পিতৃদেবকে বলেছিলেন যে গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে একটা আপোষ হলে গভর্ণমেণ্ট ভারত-সচিব লর্ড বার্কেনহেডের সঙ্গে একটা আপোষ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করবেন। এ ব্যাপারে অনেকেই পিতৃদেবকে শ্লেষ করে নরমপন্থী বলতে কার্পণ্য করেনি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোনদিনই তিনি মতের পরিবর্ত্তন কখনো করেন নি।

১৯১৭ সাল থেকে এই একই সুরের ঝঙ্কার আমরা শুনতে পাই। ১৯২৫-সালে ফরিদপুর অভিভাষণে তাঁর শেষ বক্তব্যেও এই একই সুর ধ্বনিত হয়েছে। তিনি বুঝেছিলেন গঠনমূলককাজ

করবার জন্যই খানিকটা সন্ধির লক্ষণ দেখালে আত্মনির্ভরতা আসবে। রাজনৈতিক স্বাধীনতার চেয়ে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দেশেব বেশী প্রয়োজনীয় বলে তিনি মনে করেছিলেন। এই সব আলোচনা ও মনোভাব নিয়েই শারীরিক অস্মুস্থতা ও শত অসুবিধা সত্ত্বেও পিতৃদেব ফরিদপুর অভিভাষণে তাঁর মত ব্যক্ত করবার জন্যই সভাপতিরপদ গ্রহণ করতে আপত্তি করেন নি।

সন্ন্যাসে মায়াময় সংসারের স্থাবর অস্থাবর কোন কিছুর উপরই সম্পর্ক রাখতে নেই, ভগবান বুদ্ধ ও শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসে এ ভাব পরিস্ফুট হয়েছে। বিষ্ণুপ্রিয়া-প্রেরিত নূতন গামছাটিও মহাপ্রভু গঙ্গায় ভাসিযে দিয়েছিলেন। পিতৃদেব পাটনা যাবার আগেই তাঁর শেষ সম্পত্তি রসারোডের বাড়ী ট্রাষ্টডিড্ করে দেশেব স্ত্রীজাতির কল্যাণে দিয়ে দিলেন। এই দানকার্য্য সমাপণ করে তিনি আর একদিনও রসারোডের বাড়ীতে থাকেন নি। আমার বেলতলার বাড়ী এসে উঠে বল্লেন, "তোব বাড়ীতে থাকতে দিবি? যে বাড়ী দিয়ে দিয়েছি, সেখানে আর যাব না।" একথা শুনে কি চোখে জল রাখা যায়? পিতৃদেবের কোন আত্মপর-জ্ঞান ছিল না, তাই আমার বাড়ী শ্বশ্রূকুলে পরিবৃত জেনেও তিনি এখানে আসতে মুহূর্ত্তের জন্যও দ্বিধাবোধ করেন নি।

প্রায় পনের দিন তিনি আমাদের সঙ্গে ছিলেন। মা কিন্তু তাঁর স্ত্রীজাতি-সুলভ-সংকোচে জামাইর বাড়ীতে এভাবে থাকতে রাজী হলেন না। তাই তাঁদের জন্য অন্য বাড়ী ঠিক করবার ব্যবস্থা করতেই হলো। পিতৃদেবের বাল্যবন্ধু পণ্টুকাকা (P. C. Kar—Attorney) তার বিশপ লিফ্রয়-রোডস্থ বাড়ীর একটি ফ্ল্যাট পিতৃদেবকে আনন্দে ছেড়ে দিতে রাজী হলেন। পিতৃদেব ভাড়ার কথা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি

বল্লেন, "তুমি ভাই দেশের জন্য সব দিয়ে দিতে পারলে, আর আমি কি এতই অযোগ্য যে, যে ব্যক্তি দেশের জন্য সব কিছু দিয়ে দিয়েছে তার একটু সেবা করার অধিকারও আমার নেই? বাল্য-বন্ধুত্বের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, ভাড়া দিতে চেয়ে এভাবেই কি তুমি অপমান করবে?" পল্টুকাকা প্রায় কেঁদেই ফেললেন। পিতৃদেব তাড়াতাড়ি বল্লেন, "না না, তোমার বাড়ীতো আমারই বাড়ী আমি ওখানেই থাকবো"। আমরা সেখানে তাঁর স্থায়ীভাবে বসবাস করবার জন্য সব প্রস্তুত করতে লাগলাম। স্থির হলো, পাটনা থেকে ফিরে এসে পিতৃদেব ৫নং বিশপ লিফ্রয় রোডের ফ্ল্যাটে এসে উঠবেন।

এই সময় পিতৃদেবকে নিয়ে মাঝে মাঝে আমি বড়ই বিব্রত হয়ে পড়তাম। তাঁর কাছে সকাল থেকে অগণিত লোক নানা কাজে সাক্ষাৎ করতে আসতো। সকলকে নিয়েই তিনি উপরের ড্রইংরুমে বসতেন। একদিন আমি বলেছিলাম "তুমি সকলকে নিয়েই উপরে বস - আমি ঘর কিছুতেই আর পরিষ্কার রাখতে পারিনা।" পিতৃদেব বল্লেন "ও উপরের ঘর বুঝি তোদের মার্জ্জিত রুচির সজ্জিত লোকদের জন্য," বলেই তিনি নীচে চলে গেলেন। খানিক বাদে আমার স্বামী ব্যস্ত হয়ে উপরে এসে বল্লেন "তোমার বাবার কাণ্ড দেখ গিয়ে—নীচের বারান্দায় আমার বেয়ারা যে মাদুরে বসে ধুতি কুঁচোয় সে মাদুরে তিনি বসে আছেন।" আমি লজ্জায় মরে গেলাম এবং তখনি বুঝতে পারলাম যে আমার অভিমানী পিতৃদেব কতখানি মনঃকষ্ট আমার আচরণে পেয়েছেন। আমার স্বামীকে সব ঘটনা বলতে তিনি আমার উপর ভয়ানক অসন্তুষ্ট হয়ে বল্লেন "শীঘ্র নীচে যাও তাঁর কাছে।" আমি দৌড়ে নীচে এসে পিতৃদেবকে মাদুরে বসা দেখে ব্যথিত হলাম। তাঁর চারপাশে বহুলোক মাটিতে বসে আলোচনা করছিলেন, আমাকে দেখে, তিনি বল্লেন "দেখ্, এ বেশ

ভাল হয়েছে—তোর সাজান-ঘর আর অগোছাল করবো না।"
সমাগত লোকদের বল্লেন "আমার মেয়ে আমার উপর রাগ করেছে,
বেচারার সাজান-ঘর আমি রাতদিন লণ্ডভণ্ড করে দিই কিনা।"
আমার তখন যা মনের অবস্থা হয়েছিল, তা বলার নয়। খুব গম্ভীর
হয়ে বল্লাম, "শীগ্গীর উপরে চল, এ ছোট জায়গায় সকলের হবে না।"
নলিনীরঞ্জন সরকার সে সময় সেখানে ছিলেন। তিনি অবস্থাটা সব বুঝে
বল্লেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ তাই চলুন, এখানে বসতে অসুবিধাই হবে সকলের,
এই বলে সকলকে নিয়ে আবার উপরে এলেন। আমার এই কৃতকর্ম্মের
জন্য অনুতপ্ত হয়ে সেদিন প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে এবার থেকে আমার
বাড়ীতে অবারিত-দ্বার থাকবে সবার। এত যে কাণ্ড হয়ে গেল,
পিতৃদেবের মনে কিন্তু তার কিছুই রেখাপাত করেনি, কাজকর্ম্ম সেরে
বেলা প্রায় একটার সময় খেতে চাইলেন। খাওয়া তৈয়ারীই ছিল,
কিন্তু এত লোকের মধ্যে তাঁকে কি করে ডাকবো, ভেবেই ডাকিনি।
"খেতে দিবি কখন," শুনে আমি বল্লাম "খাওয়া তৈয়ারীই আছে"—
তখন আমি ভাবিনি যে তিনি ঐ ঘরে সমবেত বিশ পঁচিশ জনকেই
খাওয়ার কথা বলবেন। আমার কথার সঙ্গে সকলকে বল্লেন "চলুন খাওয়া
তৈয়ারী, এখন খেয়ে নেওয়া যাক?" অবস্থা দেখে আমি তাড়াতাড়ি
বলে উঠলাম—একটু অপেক্ষা কর, এক্ষুণি খাবার আনছি।" তারপর
মা, শ্বশ্রূমাতা, আমার ননদেরা মিলে যে করে সেদিন খাবার ব্যবস্থা
করেছিলাম অল্প সময়ের মধ্যে, তা আমিই জানি। এর পর থেকে
অন্ততঃ পনের বিশ জনের অতিরিক্ত খাবার সব সময় ব্যবস্থা করে
রাখতাম। যে যখন আসছে বাবা তাকেই তখন খেতে বলতেন,
কাজেই খাবার-শেষ পর্য্যন্ত ক'জন হবে, সে চিন্তাতেই অস্থির থাকতে
হতো আমাদের। লোক-খাওয়ানো-প্রবৃত্তি তিনি কোনদিনই ছাড়তে
পারেননি।

পুনরায় পাটনা গিয়ে মাসখানেক থেকে তিনি এপ্রিল মাসের শেষে ফরিদপুর-প্রাদেশিক সম্মেলনের ঠিক দুই চারদিন আগে কলিকাতা ৫নং বিশপ লিফ্রয় রোডের ফ্লাটে এসে উঠলেন।

কলিকাতা থেকে ৩০শে এপ্রিল ফরিদপুর রওনা হলেন। যাত্রার পূর্ব্বে সংবাদপত্রে এক ঘোষণাপত্র প্রচার করেন। আমরা কি তখনো একবারও ভেবেছিলাম যে রাজনীতি-ক্ষেত্রে এই তাঁর শেষ উপস্থিতি? ৩০শে এপ্রিল হতে ৪ঠা মে পর্য্যন্ত ফরিদপুর-প্রাদেশিক-সম্মিলনের অধিবেশনের জন্য তিনি সেখানে ছিলেন। মাও পিতৃদেবের সঙ্গে গিয়েছিলেন।

ফরিদপুর-প্রাদেশিক-সম্মিলনে পিতৃদেবের অভিভাষণের জন্য শুধু দেশবাসী নয়, গভর্ণমেণ্টও কম আগ্রহে চেয়ে থাকেন নি। এই অভিভাষণে যেন তিনি রাজনীতিকে দর্শন করেছিলেন, রাজনীতি-তত্ত্ব বিশদরূপেই তিনি দেশবাসীকে বুঝিয়েছিলেন। আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রেখে বৃটিশ রাজশক্তির সঙ্গে কি কি সর্ত্তে সহযোগীতা সম্ভব তার বিস্তৃত-আলোচনা করেছিলেন তিনি ফরিদপুরে। তাঁর অন্তরের ভিতর যে বিরাট-স্বপ্ন ক্রমে স্পষ্ট আকার লাভ করেছিল, তারও আভাষ এতে পাওয়া যাবে। একদিকে তার ভিতরকার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব আর অন্যদিকে তাঁর সকল কর্ম্মের অন্তর্নিহিত, সকল কর্ম্মের অতীত এক মহান্ স্বপ্ন স্পষ্ট ভেসে উঠেছিল সে ভাষণে।

ফরিদপুর-অধিবেশনে পিতৃদেব আমাদের জাতীয়-মুক্তির আদর্শের পথের সন্ধান দিয়েছিলেন। কোন্ সাধনায় সে পথ সার্থক হয়ে উঠবে তাঁর বক্তব্যে তাই ছিল আলোচ্য-বিষয়। তিনি বলেছিলেন, জাতির বিকাশ-লাভের অবাধ প্রয়াসই স্বরাজ সাধনার পথ। ইংরেজ চলে গেলে অধীনতা-পাশ থেকে মুক্ত হওয়াকেই তিনি

স্বরাজ বুঝতেন না। ইংরেজ থেকেও যদি জাতির সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ-লাভে কোন বাধা না জন্মে তবে ইংরেজের থাকা তিনি আপত্তিকর মনে করেন নি। তাঁর মতে স্বরাজ ও স্বায়ত্ব-শাসন দুই ভিন্ন ছিল।

ফরিদপুরে সভাপতির ভাষণে তিনি বলেছিলেন ;—"আমি বরাবর বলিয়াছি যে গঠনমূলক কার্য্য আরম্ভ করিবার সুযোগ লাভ করিতে হইলে আমাদের প্রচুর স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে। আপনারা বুঝিতে পারেন যে, একটা জাতির ইতিহাসে স্বাধীনতালাভ করিবার পথে, কয়েক বৎসর মাত্র ব্যবধান, খুব বেশী সময় নয়। অবশ্য সেই পথে অগ্রসর হইতে এখনই যদি আমরা সুযোগ পাই, প্রকৃত স্বরাজ লাভের ভিত্তি যদি এখনই প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যথার্থরূপে যদি আমাদের ও গভর্ণমেণ্টের মনের ভাবের পরিবর্ত্তন হয়। আপনারা বলিবেন মন-পরিবর্ত্তন একটা সুন্দরকথা মাত্র উহার কোন অর্থ নাই— প্রকৃত কার্য্যে উহার পরিচয় ও প্রমাণ আমরা চাই। ইহা খুব সত্য এবং আমি ইহা স্বীকার করি। কিন্তু মুখের কথা কাজে পরিচয় দিবার জন্য রাষ্ট্রক্ষেত্রে একটা নূতন আবহাওয়ার সৃষ্টি হইতে পারে, যদি রাজা ও প্রজার মধ্যে মনোমালিন্য দূর করিয়া একটা মিটমাট বা আপোষের প্রস্তাব হয়। উভয়দলের মধ্যে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস উভয়-দলই অতি সহজে অনুভব করিতে পারে। ধীরে ও শান্তভাবে সত্য যদি কোন আপোষের প্রস্তাব হয়, তবে তাহার সার্থকতার জন্য আমি মনে করি সেই আপোষের সর্ত্ত (terms) গুলি অপেক্ষা ঐ সমস্ত সর্ত্তের (terms) পশ্চাতে যে মন আছে, সেই মানসিক-অবস্থার প্রতি অধিকতর নির্ভর করিতে হইবে। উভয়-পক্ষের মন যদি সরল হয়, সফলতা সহজেই করতলগত হইতে পারে। অন্যথা সফলতার কোন সদুপায় আমি তো দেখিনা। বর্ত্তমান-অবস্থায়—এখনই আপোষের জন্য নিশ্চিতরূপে কোনও সর্ত্ত (terms) উল্লেখ করা যাইতে পারে না। কিন্তু সত্যই

কর্তৃপক্ষের মন যদি সরল হইয়া আসে, পরস্পরকে বিশ্বাস করিয়া শান্তভাবে আপোষের কথাবার্ত্তা চলিতে থাকে—তবে আপোষের সর্ত্ত-গুলিকে স্থির-নিশ্চয়রূপে নির্দ্ধারণ করিতে অধিককাল বিলম্ব হইবেনা।

"বাঙ্গলা দেশের মনের ভাব আমি যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি তাহাতে আভাষে কতকগুলি সর্ত্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

প্রথমতঃ—গভর্ণমেণ্ট হঠাৎ দমননীতি-প্রয়োগের যে কতক-গুলি ক্ষমতা ধারণ করিয়া আছেন, তাহা একেবারে পরিত্যাগ করিবেন এবং তাহার প্রমাণ-স্বরূপ রাজনীতিক-বন্দীদের সর্ব্বপ্রথমেই ছাড়িয়া দিবেন।

দ্বিতীয়তঃ—বৃটিশ-সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকিয়াই যাহাতে আমরা নিকটবর্ত্তী ভবিষ্যতে পূর্ণ-স্বরাজ লাভ করিতে পারি—তাহার সম্বন্ধে পাকা কথা দিবেন—যে কথার নড় চড় হইতে পারিবে না।

তৃতীয়তঃ—পূর্ণ-স্বরাজ-লাভের পূর্ব্বে—ইতিমধ্যে এখনই—আমাদের শাসন-যন্ত্রকে এমনভাবে পরিবর্ত্তিত করিবেন, যাহাতে পূর্ণ-স্বরাজ-লাভের একটা স্থায়ী পাকা-ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।"

"এখন পূর্ণ-স্বরাজ-লাভের পথে কি ভাবে এই বর্ত্তমান শাসন-যন্ত্রকে কোন্‌দিকে কতটা পরিবর্ত্তন করিতে হইবে, তাহা মিটমাট-প্রসঙ্গে কথাবার্ত্তার উপর নির্ভর করে এবং এই কথাবার্ত্তা কেবল যে গভর্ণমেণ্ট ও সমগ্র প্রজা-শক্তির প্রতিনিধিদের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিবে তাহা নহে দেশের সকল বিশিষ্ট-সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণের সঙ্গেও পরামর্শ করিতে হইবে। গয়া-কংগ্রেসের সভাপতির অভিভাষণে আমি এ কথা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছিলাম।"

"আমি এ কথা আপনাদিগকে বিশেষরূপে চিন্তা করিতে বলিতেছি যে আমরাও গভর্ণমেণ্টের সহিত এমন একটি সর্ত্তে আবদ্ধ

হইব যে, কি কথায়, কি কার্য্যে, কি হাবভাবে আমরা রাজদ্রোহ-মূলক কোন আন্দোলনে উৎসাহ দিবনা—অবশ্য এখনও দিই না এবং আমার সর্ব্বতোভাবে এইরূপ আত্মঘাতী-আন্দোলন দেশ হইতে দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিব। এইরূপ একটা চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার যে বিশেষ কোন প্রয়োজন আছে, তাহা নয়—কেননা বাঙ্গালার প্রাদেশিক সম্মিলন,—কোন দিনই রাজদ্রোহ-মূলক কোনপ্রকার আন্দোলনকে উৎসাহ দেয় নাই। তবে আমি বিশ্বাস করি যে, গভর্ণমেণ্টের মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইলে—তাহার ফলে স্বতঃই রাজদ্রোহীদের মনেও একটা পরিবর্ত্তনের ভাব আপনা হইতেই আসিয়া পড়িবে এবং আমি যে ভাবের একটা আপোষের আভাষ এই মাত্র দিলাম, তাহা কার্য্যে পরিণত হইলে রাজদ্রোহের আন্দোলন একটা অতীতের বস্তু হইবে মাত্র—বর্ত্তমানে তাহার কোন অস্তিত্বই থাকিবে না এবং যে শক্তি ও সামর্থ্য ভ্রান্তপথে গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে এখন প্রয়োগ করিবার ব্যর্থ চেষ্টা হইতেছে, তাহা দেশের প্রকৃত কল্যাণকর-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া সার্থকতা লাভ করিবে।”

“তারপরের কথা, যদি আমাদের আপোষের প্রস্তাবে গভর্ণমেণ্ট কর্ণপাত না করেন, তখন আমরা কি করিব? ইহার উত্তর খুব সহজ। আমরা গত দুই বৎসর কাল যে ভাবে কার্য্য করিয়া আসিতেছি সেই পথে—সেই ভাবেই কার্য্য করিতে থাকিব এবং তাহাতে ফল এই হইবে যে, গভর্ণমেণ্ট তাঁদের বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা-প্রযুক্ত অধিকারের প্রয়োগ ও অপব্যয় করা ভিন্ন স্বাভাবিক নিয়মে শাসন-তন্ত্র পরিচালনা করিতে পারিবে না। যেমন এখন পারিতেছেন না। কেহ কেহ বলেন যে, আমাদের এরূপ করা কর্ত্তব্য নহে। তাঁহারা যুক্তিও দেন। বাজেটের প্রস্তাবে বাধা দিবার না কি আমাদের

নৈতিক অধিকার নাই। কেননা তৎপূর্ব্বে আমাদের না কি প্রজাদের নিকট যাইয়া ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করিবার পরামর্শ দেওয়া উচিত।

"এই কথার উত্তরে আমার আন্তরিক অভিপ্রায় এই যে, সমগ্র ভারতে প্রজাশক্তির মধ্যে একযোগে একটা বিরাট অহিংসামূলক গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অবাধ্যতার আবহাওয়া সৃষ্টি করা। স্বাধীনতা-প্রয়াসী পর্য্যুদস্ত আমরা আমাদের হস্তে স্বাধীনতার যুদ্ধে ইহাই শেষ অস্ত্র। আমি বলি ব্রহ্মাস্ত্র। কিন্তু ধর্ম্মযুদ্ধে কুরুক্ষেত্রে মহাবীর গাণ্ডীবী যেমন সর্ব্বপ্রথমেই পাশুপত প্রয়োগ করেন নাই, মহাবীর কর্ণও যেমন সর্ব্বপ্রথমেই তাঁহার একাঘ্নী অস্ত্র ব্যবহার করেন নাই—কোন বীরই তাহা করেন না, আমরা তেমনই সর্ব্বপ্রথমে আমাদের শেষ-অস্ত্র ব্যবহার করিবনা। কিন্তু যখন সমস্ত ফুরাইয়া যাইবে,—শেষ যখন আমাদের সম্মুখে আপনি আসিয়া উপস্থিত হইবে, তখন ধর্ম্মযুদ্ধে কুরুক্ষেত্রের রথী যিনি, তাঁহাকে হৃদয়ে স্মরণ করিয়া আমরা শেষ-অস্ত্র প্রয়োগ করিতে দ্বিধা করিবনা। ভীত হইব না কেননা, আমরা জানি যে, এ যুদ্ধ পশুবলের বিরুদ্ধে মানবের যে আত্মার বল—তাঁহারই যুদ্ধ। ইহা ধর্ম্মযুদ্ধ। আমরা জয়ী হই বা পরাজিত হই—কিছু আসে যায় না। এ বিশ্বাস আমাদের আছে যে, পৃথিবীর অতীত ও বর্ত্তমান ইতিহাস আমাদের আজিকার যুদ্ধের মত কোন একটা যুদ্ধও দেখাইতে পারেন না। একদিকে বর্ত্তমান যুদ্ধের নবাবিষ্কৃত বিজ্ঞান-সহায়ে সুসজ্জিত দৃঢ়বদ্ধ কাতারে কাতারে সশস্ত্র-সেনা-সমাবেশ—অন্যদিকে নিরস্ত্র দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ক্ষুৎপিপাসায় ম্রিয়মান অগণন ত্রিশ কোটি নরকঙ্কাল। কটিমাত্র বস্ত্রের আবরণে, দেশব্যাপী ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের জীবন্ত-বিগ্রহ ভারতের প্রধান-সেনাপতি, আজ মাত্র আত্মার বলকে হস্তামলকবৎ ধারণ করিয়া আমাদিগকে এই সমরাঙ্গনে আহ্বান করিয়াছেন।"

রাজনীতি-ক্ষেত্রে ইহাই পিতৃদেবের শেষ সুস্পষ্ট উক্তি। তখন পিতৃদেবের এ ভাষণ যুবক-সম্প্রদায়ের মনঃপূত তেমন হয়নি এবং তারা মনে করেছিল পিতৃদেব গভর্ণমেণ্টের কাছে একরকম আবেদনই করলেন। তাঁর কর্ম্মীদের মধ্যেও এ অভিভাষণ নিয়ে কেউ কেউ বিদ্রোহ-ঘোষণার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পিতৃদেবের বিরাট ব্যক্তিত্বের কাছে তাদের সে প্রচেষ্টা সার্থক হয়নি।

রাজনীতে-ক্ষেত্রে জাতিতে জাতিতে অনর্থক সংঘর্ষের অবসান করে জীবনের যে শেষ মিলনের বাণী তিনি ফরিদপুর ভাষণে রেখে গিয়েছিলেন, তা শুধু কোনমতে স্বাধীনতা-লাভ করার আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দেবাব জন্যই নয়, পরন্তু গঠনমূলক-কার্য্যে দেশকে এগিয়ে নেবার জন্যই যে কল্পনা বহুদিন হতেই তাঁর মনে বিস্তার লাভ করেছিল, ভাব-সাধনার সে দিক থেকে এ অভিভাষণ সত্যই হৃদয়-গ্রাহী।

এখন বাঙ্গলার রাজনীতির কথা যখন ভাবি তখন দেখি একজনের অভাবে আজ বাঙ্গলার রাজনীতি হিমালয়ের অভ্রচূড়া থেকে কি ভাবে আবর্জ্জনা-স্তূপে নেমে এসেছে।

ফরিদপুর-অভিভাষণে মুক্তির যে পথ তিনি দেখিয়েছিলেন, জীবিত থাকলে তিনি নিশ্চয়ই তা কার্য্যে পরিণত করতেন। লর্ড বার্কেনহেড তা সম্পূর্ণ অনুভব করেই পিতৃদেবের মৃত্যুর পর আপোষের প্রস্তাব আর উত্থাপন করলেন না। ফরিদপুরে পিতৃদেবের প্রদর্শিত-পথে নেতৃত্বের মোহ ও আত্মম্ভরিতা ত্যাগ করে দেশ যদি অগ্রসর হতো তবে পূর্ণ-স্বরাজ আমরা বহু বৎসর পূর্ব্বেই পেতাম। ভারতকে খণ্ডিত করে এ স্বাধীনতা আমাদের অর্জ্জন করতে হতো না। আর পিতৃদেবের হৃদয়-শোণিতে রঞ্জিত তাঁর আকাঙ্খিত স্বরাজ-সৌধও আজ ধূলিধূসরিত হতে পারতো না। যে কাজে জীবন দান করে পিতৃদেব দেশবাসীর জন্য নূতন-আদর্শ-প্রতিষ্ঠিত করে

গিয়েছেন, সে আদর্শ কি আমরা আজ অনুসরণ করছি? সেই ত্যাগ, সেই একাত্মবোধ, সেই স্বার্থহীনতা যতদিন আমরা আয়ত্ত করতে না পারবো, যতদিন সর্ব্বপ্রকার অধীনতা হতে দেশবাসীকে মুক্ত করতে না পারবো, ততদিন আমাদের এ স্বাধীনতার কোন মূল্যই নেই।

ফরিদপুরে অত্যধিক পরিশ্রমে ও মানসিক নৈরাশ্যে পিতৃদেব অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পরলেন। তিনি চিন্তাজ্বরে জীর্ণ হয়ে রুগ্নদেহে ৬ই মে কলিকাতা বিশপলেফ্রয় রোডের বাসাবাড়ীতে এসে উঠলেন। তাঁর সে মলিন বিষণ্ণ বদন কোনদিন ভুলতে পারবনা। দেশবাসী তাঁকে বুঝল না এ দুঃখে তিনি অভিমানপূরিত অন্তরে স্তব্ধ হয়ে রইলেন। সমস্তক্ষণই তাঁর মন অধিকার করেছিল ফরিদপুর। প্রতি-পক্ষের সমস্ত বিষ নিজকণ্ঠে ধারণ করে যিনি নীলকণ্ঠই হয়েছিলেন, সেই তিনিও ফরিদপুরে নিজ দলের মধ্যেও শৃঙ্খলা রক্ষা করতে না পারার এ অক্ষমতার জ্বালা তীব্রভাবেই অনুভব করেছিলেন। জীবিত থাকলে পিতৃদেব নিশ্চয়ই আবার সংগ্রামে অবতীর্ণ হতেন, আবার তাঁর সুদর্শনচক্র ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রের বহু মতকে শতধা করতে পারতো সন্দেহই নেই। আবার তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, চিন্তাশক্তি ও আত্মত্যাগের দূর্ব্বার-স্রোতে সমস্ত মতবাদকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে তিনি নিশ্চয়ই সক্ষম হতেন, কিন্তু শ্রান্তি ও ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে দেশবাসীর উপর যেন প্রচণ্ড অভিমান করেই তিনি শুধু রাজনীতিক্ষেত্র নয়, সংসারক্ষেত্র থেকেই চির-বিদায় নিলেন। পিতৃদেবের মৃত্যুর পর অনেকেই বলেছিলেন যে ফরিদপুরই তাঁর মৃত্যুর দ্বার খুলে দিয়েছিল। যদি তাই হয় তবে এও বলতে হবে যে মৃত্যুর দ্বার দিয়ে তবে ফরিদপুরই তাঁকে অমৃতত্বে পৌঁছে দিল। তাঁর সেই অমৃতত্বই রূপায়িত হয়ে উঠেনিকি

তাঁর প্রাণ-প্রিয় শিষ্য সুভাষচন্দ্রের মধ্যে? নিশ্চয়ই তাঁর অতৃপ্ত অভিমান-ক্ষুব্ধ-আত্মা শান্ত হয়েছিল সুভাষের গৌরব-দীপ্ত বীরত্বপূর্ণ আত্মত্যাগে।

ফরিদপুর থেকে এসে একদিন পিতৃদেব বল্লেন "মহাত্মার কোন শত্রু নেই, তার কারণ তাঁর হিংসা নেই; আমার নিশ্চয়ই হিংসা রয়েছে তাই আমার এত শত্রু"। কি মর্ম্মান্তিক গ্লানিতে তিনি একথা বলেছিলেন তা সহজেই অনুমেয়। দুঃখ হয় ভাবতে যে এ গ্লানি তিনি লাভ করেছিলেন তাঁরই দেশের লোকের কাছ থেকে।

ফরিদপুর থেকে ফিরে এসে পিতৃদেবের মনের অবস্থা যাই হোক তিনি সেই ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়েই ভবিষ্যত-কর্ম্ম-পদ্ধতি অনুসারে কাজ করতে কৃতসংকল্প হলেন। তিনি স্থির করলেন দার্জ্জিলিং থেকে শরীর সুস্থ করে ফিরে এসেই পল্লী-সংগঠন কার্য্যে আত্মনিয়োগ করবেন।

১১ই মে দার্জ্জিলিং যাত্রা-কালে যখন তিনি আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন তখন বুঝিনি যে পিতৃদেবকে এই শেষ প্রণাম করছি। হেসে আমাকে বল্লেন "বেটি, মাটি, ঘর, হাত-বদলালেই পর।" আমার স্বামীকে একা রেখে তাঁর সঙ্গে যেতে আপত্তি করেছিলাম বলেই আমাকে ওকথা বল্লেন।

ভোম্বল ও সুজাতা তখন পাবনার হিমায়েৎপুর শ্রীঅনুকূল ঠাকুরের সৎসঙ্গ-আশ্রমে ছিল। পিতৃদেব দার্জ্জিলিং এর পথে সেখানে ক'দিন থেকে, ১৩ই মে দার্জ্জিলিং পৌছান। দার্জ্জিলিং এ তিনি স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকারের 'ষ্টেপ এসাইড' বাড়ীতে ছিলেন। এবাড়ী সম্বন্ধে অনেক ভৌতিক-কাহিনী আমরা শুনেছিলাম, তাই তাঁর এখানে থাকা আমাদের মনঃপূত হয়নি। বিশেষ করে

ভাওয়ালের মৃত্যু-কাহিনী এবাড়ীর সঙ্গে জড়িত থাকাতে আমাদের একেবারেই ভাল লাগেনি। কিন্তু পিতৃদেব সেখানেই উঠলেন। এ সময়ে বিখ্যাত অভিনেতা শিশির কুমার ভাতুরীর 'সীতা' অভিনীত হচ্ছিল। আমাকে লিখলেন "শিশিরের 'সীতা' নিশ্চয়ই দেখবি, আর আমাকে সম্পূর্ণ বর্ণনা দিয়ে চিঠি লিখবি, দেখবো কেমন তুই আর্টের সমঝদার।" দার্জ্জিলিং যাবার পূর্ব্বে মেয়র হয়ে তিনি শিশিরবাবুকে বলেছিলেন যে তিনি ন্যাশানাল থিয়েটার গড়বার চেষ্টা করবেন, কেননা প্রত্যেক সভ্য দেশেই জাতীয়-নাট্যশালা তাদের সংস্কৃতির সাক্ষ্য দেয়। এ বিষয়ে তাঁর যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। তিনি আরও বলেছিলেন জাতির উন্নতির পরিচয় পাই আমরা তার নাটক, সঙ্গীত, চিত্র, ভাস্কর্য্যের মধ্যে। কিন্তু তার অকাল-বিয়োগে নাট্য-সমাজ ক্ষতিগ্রস্তই হলো।

পিতৃদেব প্রত্যেক পত্রের শেষে লিখতেন "বাবার কাছে কবে আসবি?" তখন যদি একবারও ভাবতাম আর তাঁকে দেখতে পারবো না, তবে কি আর অপেক্ষা করতাম। বেবী, ভাস্কর এবং ন'পিসিমা ও তাঁর কন্যা সতী তখন পিতৃদেবের কাছে ছিল। ভোম্বল, সুজাতা আর আমরাই তাঁর শেষ সময়ে তাঁকে দেখতে পেলাম না।

২০শে মে মা লিখলেন "তোর বাবার খুব ক্ষিধে হয়েছে—যথেষ্ট হাটেন, এসে যখন খেতে বসেন, খাওয়ার পরিমাণ দেখে ভয় করে।" মন খুব খুসী হলো, ভাবলাম ক্ষিধে যখন হয়েছে তখন তাড়াতাড়ি সেরে উঠবেন। কিন্তু সে ক্ষিধে যে তাঁর 'জন্মের শোধ' খাওয়া তাকি তখন বুঝেছিলাম?

পিতৃদেবের সুবিধার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করেছিলেন স্যার নৃপেন্দ্রনাথ। তার বিশেষ-পরিচিত অনুপ গোস্বামী নামক এক

যুবককে তিনি অনুরোধ করেছিলেন পিতৃদেবের দেখাশোনা করার জন্য। দার্জ্জিলিং-বাসীমাত্রের কাছেই তখন অনুপবাবু বিশেষ পরিচিত ছিলেন। অল্পকাল মধ্যেই তিনি বাবা ও মার পুত্রবৎ হয়ে গেলেন। তার কথা প্রতিপত্রেই পিতৃদেব ও মা লিখতেন। সম্প্রতি বাঙ্গলার মাননীয় রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এই 'ষ্টেপ এসাইড' গৃহটি জাতির সম্পদ বলে ক্রয় করবার জন্য অর্থ-সংগ্রহে অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন। স্ত্রী-জাতি ও শিশুদের পরিচর্য্যা-কল্পে এ বাড়ীতে শিশুমঙ্গল ও প্রসূতি-আগার স্থাপনের পরিকল্পনা হয়েছে। তাঁর এই আন্তরিক চেষ্টা সাফল্য-লাভ করে এ কামনাই করি।

১৪শে মে শ্রীযুক্তা বেশান্ত দার্জ্জিলিং এ পিতৃদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। 'কমন্‌ওয়েলথে' ভারত যাতে যোগদান করে সে বিষয়েই তিনি আলোচনা করেছিলেন। পিতৃদেবের এবিষয়ে সম্পূর্ণ মত ছিল। কারণ তিনি ফরিদপুরের সম্মিলনের আগে পাটনায় অবস্থানকালে লর্ড বার্কেনহেডের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেছিলেন। পিতৃদেব শ্রীযুক্তা বেশান্তকে বলেছিলেন, 'কমনওয়েলথে যোগদানে আমাদের বিশেষ আপত্তি হবে না, কিন্তু এটি যদি না হয় তবে সিভিল ডিস্‌ওবিডিয়েন্সে আপনি আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন কি?" বলাবাহুল্য, শ্রীযুক্তা বেশান্ত তাতে তাঁর অমত জানিয়েছিলেন। পিতৃদেব তখন বলেছিলেন যে "ঐটিই আমাদের শেষ-ব্রহ্মাস্ত্র।"

৪ঠা জুন মহাত্মা গান্ধী পিতৃদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ-কল্পে দার্জ্জিলিং যান; তিনি সেখানে পাঁচদিন ছিলেন। মহাত্মার সঙ্গে এ সময় বার্কেনহেড সম্বন্ধেই তাঁর আলোচনা হয়েছিল। পিতৃদেবের দৃঢ়-বিশ্বাস ছিল যে বার্কেনহেড একটা কিছু করবে—কিন্তু

মহাত্মার এ বিষয়ে ততটা আশা ছিলনা কারণ তিনি মনে করতেন হিন্দু-মুসলমান একতাবদ্ধ না হলে কিছু হবে না এবং ইংরাজ কোন দূর্ব্বল শক্তির কাছে মস্তক অবনত করবে না। পিতৃদেব এতে অধীর হয়ে মহাত্মাকে বল্লেন, "আপনি নৈয়ায়িকের ন্যায় একথা বলছেন, কিন্তু আমার মন বলছে একটা কিছু হবেই।" "Something within tells me that we are in for something big." মহাত্মা ইংরেজের শুবুদ্ধির প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করলেন। তাতে হেসে পিতৃদেব মহাত্মাকে বলেছিলেন "যদি বার্কেনহেড সত্যিই কিছু না করে তবে কাউন্সিলে আর বিশেষ কিছু হবে না। আমরা আপনার প্রোগ্রাম-অনুযায়ী চরকা ও গ্রাম্য-সংস্কার-পদ্ধতিতেই আত্মনিয়োগ করবো।"

ফরিদপুর-অধিবেশনের ছয় সপ্তাহ পর, দার্জ্জিলিংএ পিতৃদেব ১৯২৫ সালে ১৬ই জুন পরলোক গমন করেন।

এই ছয় সপ্তাহ পিতৃদেব বার্কেনহেড কিছু করবেন এ আশা করেছিলেন। লর্ড রেডিং ২৬শে এপ্রিল লর্ড বার্কেনহেড্ ও বৃটিশ-মন্ত্রিসভার সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়েছিলেন-- তাঁদের জল্পনা-কল্পনার মধ্যেই পিতৃদেবের মহাপ্রয়াণে বৃটিশ-মন্ত্রিসভাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো।

পিতৃদেবের বিশ্বাস ছিল যে লর্ড বার্কেনহেড এ বিষয়ে আলোচনা করবার জন্য লণ্ডনে তাঁকে আমন্ত্রণ জানাবে। এ আশা করা তাঁর ভুল হয়নি, কেননা লর্ড বর্কেনহেড হাউস-অব-কমন্সে মিটমাটের ইঙ্গিতও দিয়েছিলেন এবং ফরিদপুরে পিতৃদেবও তাঁর প্রতি উত্তর দেন।- এপ্রিল মাসে লর্ড রেডিং, লর্ড লিটন ও পিতৃদেবের পরিচিত এক ব্যক্তির মাধ্যমেই এসব আলোচনা হয়েছিল।

১৬ই জুন দেহত্যাগ না করলে সে আমন্ত্রণ তিনি নিশ্চয়ই পেতেন বলেই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস—তাই লণ্ডন যাবার প্রয়াস বা বার্কেন-হেডের আমন্ত্রণের প্রতীক্ষা ভুল হয়নি। কিন্তু মানুষের আয়ত্তের বাইরে যে মৃত্যু সেই তাঁর প্রতীক্ষা ব্যর্থ করে দিয়ে তাঁকে নিয়ে চলে গেল।

তাই পিতৃদেবেব মৃত্যুর পর বার্কেনহেডও বৃটিশের শক্তিশালী শত্রুর তিরোধানে এ প্রসঙ্গেব আর পুনরালোচনার আবশ্যক বোধ করেন নি।

মহাত্মাজী ৯ই জুন পর্যন্ত পিতৃদেবের সঙ্গে দার্জ্জিলিং-এ নানা আলাপ-আলোচনাব আনন্দে কাটিয়েছিলেন। তিনি পিতৃদেবের মৃত্যুব পবে আমাদেব বলেছিলেন যে, "তোমাদের বাবার আধ্যাত্মিক-উন্নতি আমি দার্জ্জিলিং-এ দেখে পরম-প্রীতি লাভ করেছিলাম।" তাঁর বিশ্বাসমতে রাজনীতিব চেয়েও ধর্ম্মভাব তখন পিতৃদেবের মধ্যে প্রবল আধিপত্য বিস্তাব কবেছিল। কিন্তু পিতৃদেব তাঁর সর্ব্বকাজই তো ধর্ম্মেব অন্তর্গত বলেই মনে করতেন। রাজনীতি এবং ধর্ম্মনীতি পৃথক ভাবে তাব মনে স্থান পেয়েছিল বলে অন্ততঃ আমার মনে হয় না। পাযবাব খোপের মত তিনি মনকে কখনো বিভিন্ন করে আবদ্ধ রাখেন নি এবং সেটিই ছিল পিতৃদেবেব চরিত্রের বৈশিষ্ঠ।

জ্বব তাঁর প্রতি সোমবাব নিয়মিত আসতো। এ্যালোপ্যাথী-চিকিৎসা করাতে তিনি কিছুতেই রাজী হলেন না। দ্বারিক পিশামহাশয়ের (ডাঃ দ্বারিকনাথ রায়) চিকিৎসার প্রতি তাঁর অপরিসীম বিশ্বাস ছিল। তিনি দ্বারিক পিশামহাশয়কে প্রায়ই বলতেন "দ্বারিক বাবু, মরবার সময় যেন আপনার ওষুধ খেয়েই মরি।" তাঁর শেষ-চিকিৎসাও দ্বারিক পিশামহাশয়ই করেছিলেন।

১৪ই জুন পিতৃদেবের প্রবল জ্বর এলো। সে দিনও তিনি সকালে হেঁটে দিঘাপতিয়া-রাজবাড়ী গিরি-বিলাসে গিয়েছিলেন। জনমের মত চলে যাবেন বলেই কি তিনি এভাবে দার্জ্জিলিং এ সব বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে শেষ দেখা করেছিলেন ?

১৫ই জুন লেখা মার চিঠি আমি ১৬ই দুপুরে পেলাম, তাতে মা লিখেছিলেন, "তোর বাবা তোকে লিখতে বল্লেন তাঁর জন্য আনারস পাঠাতে। তুই এই চিঠি পেয়েই আনারস পাঠিয়ে দিস্।" আমি সেই চিঠি পেয়েই আমার মেজ-মামা (মহীন্দ্রনাথ হালদার) কে ডেকে পাঠিয়ে তাঁকে বল্লাম তিনি নিজে গিয়ে যেন দেখে ভাল আনারস কিনে আনেন। মেজমামা বল্লেন, "কিন্তু আনারস কিনে এনে আজ কি আর পাঠাবার সময় থাকবে ?" আমি তাঁর উপর ভয়ানক রেগে গিয়ে বললাম, "যদি লোক দিয়েও পাঠাতে হয় তাই করতে হবে। তুমি আর সময় নষ্ট কোর না, শীঘ্র যাও"—তখন একবারও ভাবিনি যে ওদিকে পিতৃদেবের জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হয়ে আসছে। মা লিখেছেন "আজ তো জ্বর আসবার দিন, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তো তা আসে নি, তবে পায়ে ব্যথার কথা বলছেন।" ভগবানের কাছে প্রার্থণা করতে লাগলাম বাবার জ্বর যেন আর না আসে। সেদিন আমার মন নানা কারণেই বিষন্ন ছিল, কারণ আমার স্বামী বিশেষ সুস্থ ছিলেন না। তারপর সে দিনই আমি ভারী দুঃস্বপ্ন দেখেছিলাম। স্বপ্নে দেখেছিলাম, একজন অপরিচিতা স্ত্রীলোক বসে তার হাতের শাঁখা ভাঙ্গছে। ঘুমের থেকে উঠে পর্য্যন্ত এই স্বপ্ন আমাকে বিচলিত করে দিচ্ছিল। তখন বুঝি নি যে মার সে শঙ্খ-শোভিত শ্রীমণ্ডিত হাত আর দেখব না। স্বপ্নকে লোক অলীক বলে—কিন্তু এ স্বপ্নের মত এমন জাগ্রত সত্য-স্বপ্ন আর কখনো দেখিনি।

বিকেল বেলা প্রায় ৬॥ টার সময় আমার স্বামীকে দেখতে তাঁর কয়েকজন বন্ধু এসেছিলেন। এদের আমি চা দিচ্ছিলাম উপরের বারিন্দায় বসে। হঠাৎ দেখি স্যার নৃপেন্দ্র নাথ সরকার গেটের বাইরে গাড়ী রেখে দ্রুতবেগে ভিতরে আসছেন এবং মেজ মামাও সে সময় ফিরে আসতে আমি তাঁকে এত দেরী করবার জন্য অনুযোগ দিতে যাচ্ছিলাম। তখন আমার একমাত্র চিন্তা বাবাকে আনারস পাঠানো। স্যাব নৃপেন সবকার হয়তো আমাব স্বামী অসুস্থ জেনে দেখতে এসেছিলেন ভেবেছিলাম আমি। তখন ভাবিনি যে কি ভীষন দুঃসংবাদ তিনি বহন করে এনেছেন। মেজ মামাকে আনাবস পাঠাবার কথা জিজ্ঞেস কবে কোন উত্তব না পেয়ে ভাবলাম নিশ্চয় আনাবস পাঠান হয় নি, তাই অমন চুপ কবে বয়েছেন। আমি বেগে বললাম, "যদি পার্শ্বেল কবতে না পেবে থাক, তোমাব অফিস থাকুক আর যাক, তোমাকে এ নিযে আজই যেতে হবে।" তখন মেজ মামা আর ক্রন্দন সংবরণ কবতে পাবলেন না বল্লেন, "কাকে পাঠাবরে, সে আর নেই"— একথা কিছুতেই বিশ্বাস কবতে পাবছিলাম না, দৌড়ে বারিন্দায় এসে দেখি আমাব স্বামী স্তব্ধ হয়ে বসে বয়েছেন। স্যার নৃপেন্দ্র নাথ তখন চলে গিযেছেন।

ক্রমে ক্রমে আমাদেব বাড়ী লোকজনে পূর্ণ হয়ে গেল। কিন্তু সে সময় প্রাণেব সে মহাশূন্যতা ভাষায় প্রকাশ করবার নয়। সকলে মিলে পবামর্শ করে পিতৃদেবের শব কলিকাতা আনাই স্থির করলেন। দার্জ্জিলিং তাঁব বড় প্রিয় ছিল বলে মার ইচ্ছা ছিল তাঁকে সেখানেই কাকামণির পাশেই রাখতে। কিন্তু সমগ্র দেশবাসীর একান্ত আগ্রহ দেখে মা কলিকাতায় পিতৃদেবের নশ্বর দেহ আনতে দিতে আর আপত্তি করেন নি। মার কাছে শুনেছিলাম, অন্তিম সময়ে পিতৃদেব ব্যাকুল হয়ে মাকে কি বলবার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু মা

বুঝতে পারছেন না অনুভব করে তাঁর তুনয়নে ধারা নামলো। মা বাবার এ কষ্ট সহ্য করতে পারেন নি। অশ্রু-সজল নয়নে ধীর ভাবে তিনি আমাকে পরে বলেছিলেন, "মৃত্যুপথ-যাত্রীকে আমি মিথ্যে কথা বলেছি। তোর বাবার ও রকম ব্যাকুলতা দেখে আমি বল্লাম, "তোমার কথা আমি সব শুনতে পেয়েছি, তুমি কোন ভাবনা করো না নিশ্চিন্তে তুমি এবার ঘুমাও।" মার একথা শুনে পিতৃদেব পরম শান্তির সঙ্গে মৃত্নু-হেসে চির-নিদ্রিত হন। কৃষ্ণ-পক্ষের একাদশী তিথিতে মঙ্গলবার ২রা আষাঢ়, ১৬ই জুন বিকেল পাঁচটার সময় পিতৃদেবের মুক্তাত্মা জীর্ণ দেহ-পিঞ্জর পরিত্যাগ করে শান্তিময়ের কোলে চিরশান্তি লাভ করল।

মহাত্মা গান্ধী এসময় পূর্ব্ববঙ্গ পরিভ্রমণ করছিলেন। তিনি এ সংবাদ পেয়ে তৎক্ষণাৎ কলিকাতা চলে এলেন। আমি কলিকাতায় একা রয়েছি জেনে তিনি আমাদের বাড়ী এসে উঠলেন। সে সময় তাঁর যে অপার স্নেহ পেয়েছিলাম তা ভুলবার নয়। এই মহামানবের অপরিসীম-স্নেহ-ভালবাসায় সেদিন অসহ্য পিতৃশোক সহ্য করবার শক্তি পেয়েছিলাম সন্দেহ নেই।

১৮ই জুন ভোরবেলা মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে আমার স্বামী ও আমি এবং কাকা সাহেব সতীশ রঞ্জন দাশ পিতৃদেবের দেহ আনতে ব্যারাকপুর গিয়েছিলাম। আমাদের বাড়ী থেকে আরম্ভ করে ব্যারাকপুর পর্য্যন্ত শোকমগ্ন-জনতার দৃশ্য এখনো চক্ষের সামনে ভাসে। দেশকে তিনি কতখানি ভালবেসেছিলেন, তা-বুঝতে পারলাম। নিজে ভাল না বাসলে কি এই ভালবাসা পাওয়া যায়? বুঝতে পারলাম সেদিন যে একা আমরা ভাইবোনরাই পিতৃহীন হইনি—আমাদের সঙ্গে সেদিন সমগ্র দেশই পিতৃহীন হয়েছিল।

ব্যারাকপুরে এসে দেখি দার্জ্জিলিং-মেল আসতে অনেক দেরী হয়ে গেছে। শুনলাম দার্জ্জিলিং থেকে আরম্ভ করে প্রতি-ষ্টেশনে দেশবাসী তাদের প্রিয়-নেতা ও বন্ধুকে শেষ-দর্শন ও শ্রদ্ধা-অর্পণ করবার জন্যই ধীরে মন্থর-গতিতে মেল আসছে।

মেল যখন ষ্টেশনে প্রবেশ করল তখন 'হরিবোল' ও 'বন্দে-মাতরম্' ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল, সেদিন প্রতিজনের স্নেহ ও শ্রদ্ধাপূর্ণ-আচরণ আমার চিরদিনই মনে থাকবে। পিতৃদেবের দেহ একটি মাল-গাড়ীতে পুষ্পে সজ্জিত ছিল। ষ্টেশনের প্লাটফরম্ থেকে সে গাড়ী অনেকটা উঁচু থাকাতে ছাত্রেরা সিঁড়ির মত শুয়ে পরে তাদের উপর দিয়ে আমাকে উঠে যেতে বল্ল—মানুষের উপর দিয়ে হেঁটে যেতে আমি কিছুতেই রাজী হলাম না—পরে জানি না আমি কিভাবে উঠেছিলাম। কিন্তু সেদিন মনে হয়েছিল এরা সকলেই আমাদের বড় আপনার—আমরা সকলেই পিতৃশোকে আকুল হয়েছিলাম। সেদিন হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, বাঙ্গালী, অবাঙ্গালী সকলেই কেঁদেছিল—শুধু চোখের জল ফেলে নয়, অন্তরের আকুলবেদনায় সেদিন দেশ ভবে উঠেছিল। "যারা কৃষ্ণ নাম না শুনতো কানে, কৃষ্ণ কোথায় গেল বলে" তারাও সেদিন কেঁদেছিল।

মৃত্যুকেই বড় ভেবে সেদিন গভীর শোকে মগ্ন হয়েছিলাম আমরা। কিন্তু আজ বুঝতে পারছি যে মৃত্যুর মাঝেই পিতৃদেব অমৃতত্ব লাভ করেছিলেন সেদিন। মৃত্যু সেদিন এসে ধ্বংশ করেছিল তাঁর জীর্ণ-চীরের মত তণু; কিন্তু মৃত্যুহীন-প্রাণ তাঁর আজও অমর হয়ে রয়েছে তাঁর দেশবাসীর অন্তরে। তাঁর জীবন-কাব্যের অন্তে 'চরম চমৎকার স্বর্গারোহণ' সর্গটি ভারত-বাণীর কণ্ঠহার' হয়েই থাকবে।

ব্যারাকপুরে এসে পিতৃদেবের গাড়ীতে উঠে দেখি ভোম্বল এককোনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভোম্বল, সুজাতা, অদিতি ও স্বরূপাকে নিয়ে হেমায়েৎপুর থেকে এসে দার্জ্জিলিং-মেল ধরেছিল। পিতৃদেবের দেহ এতই পুষ্পাচ্ছাদিত হয়েছিল যে তাঁর মুখ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম না। তাঁকে ভাল করে দেখবার জন্য আকুল হয়ে ফুলপাতা সরাবার উদ্যোগ করতেই ভোম্বল আমাকে জড়িয়ে ধরে বল্ল, "দিদি ভাই, আমরা বাবার সুন্দর মুখই মনে রাখব—তাই ফুল তুলিস্ না।" তখন উপলব্ধি করলাম ভোম্বল ঠিকই বলেছে। পিতৃদেবের মধুর মূরতিই মনে জেগে থাক—অন্য মূর্ত্তি কল্পনা করতেও ইচ্ছা হলো না। বরাবরই পিতৃদেব আমাকে বলতেন, "মরবার সময় আমাকে "মাধব বহুত মিনতি" কিন্তু শুনিয়ে দিস্।" তাঁর পুষ্পাবৃত-দেহ দেখে মনে পড়ে গেল সে কথা, চেষ্টা করলাম তাঁর কথা রাখতে—কিন্তু পারলাম না। মা ও বেবী পাশের গাড়ীতে ছিলেন, বেবীর দ্বিতীয় পুত্র সুধীর তিন মাস পরেই জন্মগ্রহন করাতে বেবী সে সময় খুবই অসুস্থ ছিল, সে জন্য বাবার গাড়ীতে তাকে রাখা হয় নি।

আমাদের গাড়ী ধীরে মন্থর গতিতে শিয়ালদহ এসে পৌঁছাল। এ রকম শোকাহত-আকুল-জনতা আর কখনো দেখিনি। ধনী-দরিদ্রের একত্র-সমাবেশ এ ভাবে কখনো হয়েছে কি না জানি না। ট্রেন উপস্থিত হলে শত-সহস্র-বেদনাতুর-কণ্ঠে ধ্বনিত হোল "বন্দে-মাতরম্।" মহাত্মা ধীরকণ্ঠে জনতাকে শান্ত হতে বল্লেন। তখন সেই বিরাট-জনসঙ্ঘ মন্ত্রমুগ্ধের মত স্তব্ধ হয়ে রইল। মনে হচ্ছিল আমাদেরই মত ঐ বিশাল জনসমুদ্র আজ শোকার্ত্ত, মূক।

ট্রেন স্থির হওয়া মাত্র মহাত্মা গান্ধী আমাকে মার গাড়ীতে তুলে দিলেন। পিতৃদেবের শব-বহনের জন্য ভোম্বল, আমার স্বামী,

আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় ও শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী শবাধার থেকে শব এনে ষ্টেশনে রক্ষিত-পালঙ্কে স্থাপিত করলেন। শত-সহস্র হিন্দু-মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন, সকলের ভক্তিঅর্ঘ্য-কুসুম-দানে পিতৃদেব সজ্জিত হলেন। সকলে এসে আমাদের নামিয়ে গাড়ীতে উঠিয়ে দিলেন। পিতৃদেবকে আমরা আর দেখতে পেলাম না। তাঁর পার্থিব-দেহ তখন তো শুধু আমাদের নয়, সমগ্র দেশবাসীর। তখন সেই পূত-দেহ ঘিরে প্রাণের ভক্তিশ্রদ্ধা দিয়ে তাদের 'দেশবন্ধু'কে শেষবারের মত দেখবার জন্য জড়-পুত্তলির ন্যায় দাঁড়িয়েছিল। একবার শেষ-স্পর্শের জন্য সকলেই আকুল। তাই দেশের বন্ধুকে দেশবাসীর হাতে তুলে দিয়ে আমরা মাকে নিয়ে আমার বাড়ীতে এলাম। সার্দ্ধচার বছরের অদিতি ও পাঁচ বছরের সিদ্ধার্থ তাদের হাজার হাজার প্রশ্নে মাকে ব্যাকুল করে তোল্ল।

বাড়ীতে এসে দেখলাম জনসমুদ্রে বাড়ী ভরে গিয়েছে। সমগ্র-দেশের সম্মিলিত-শোকে বুঝি আমাদের শোকও অনেক লাঘব হলো। পিতৃদেব দেশবাসীর হৃদয় কতখানি অধিকার করে বসেছিলেন সেদিন তা উপলব্ধি করলাম। বুঝলাম শুধু তিনি বংশেরই চিত্তরঞ্জন করেন নি, জনসাধারণের চিত্ত-হরণ করে তিনি প্রকৃত-চিত্তরঞ্জন হয়ে তাঁর মাতৃদত্ত নাম সার্থক করেছেন।

রসা রোডের বাড়ী দিয়ে-দেওয়া অবধি পিতৃদেব আর সে বাড়ীতে প্রবেশ করেন নি, সে জন্য মহাত্মা গান্ধী যখন মাকে জিজ্ঞেস করতে এলেন পিতৃদেবের শব সে বাড়ীতে আনা হবে কিনা, তখন মা বারণ করলেন, বল্লেন, "বাড়ীর গেটের বাইরে যদি শব রাখা সম্ভব হয় তবে তিনি বাড়ীর ফুল দিতে চান।" আবার বল্লেন "একবার আমি সেখানে যাব, আমার কত সাধের বৃন্দাবন।" অশ্রু-পূরিত

নয়নে আমরা মাকে নিয়ে রসা রোডের বাড়ীতে গেলাম, সে ঘটনা বর্ণনা করবার শক্তি আমার নেই। "নন্দকুল চন্দ্র" বিনা বৃন্দাবন বুঝি এমনই আঁধার হয়েছিল। বাড়ীর প্রত্যেকটি কক্ষ যেন পিতৃদেবের স্পর্শের জন্য আকুল হয়ে উঠল। ঘরের মধ্যে থাকতে না পেরে আমরা নীচে গেটের কাছে এসে বসে রইলাম পিতৃদেবের শবদেহ দর্শনের আশায়। দেহ যখন বাড়ীর নিকটবর্ত্তী হলো তখন জনতার গতিরোধ করা সম্ভব হলো না। ভগ্ন-হৃদয়ে আমরা দূরথেকেই তাঁকে শেষ প্রনাম জানালাম।

পিতৃদেবের শব-শোভাযাত্রা ৭-৪০ মিনিটে শিয়ালদহ থেকে বের হয়ে হ্যারিসন রোড, চিৎপুর, বড়বাজার, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কর্পোরেশন ষ্ট্রীট, চৌরঙ্গী, রসা রোড, হাজরা রোড দিয়ে ২-১৫ মিঃ কেওড়াতলা পৌঁছে।

মাতৃচরণ-স্পর্শ-ধন্যা কেওড়াতলাতে পূন্যতোয়া জাহ্নবী সে পবিত্র শব বক্ষে ধারণ করে শোকে উদ্বেলিত হয়ে উঠলেন। স্তব্ধবিস্ময়ে মহাকাল যেন থেমে দাঁড়াল। শ্মশানের ধুমায়িত গম্ভীর সে পরিবেশের মধ্যে এই পবিত্র স্বর্গারোহণ-দৃশ্যের মুক-দ্রষ্টা হ'য়ে বসে রইলেন ভারতের মহামানব। অদূরে চিতা-বহ্নির লেলিহান-শিখা পিতৃদেবের জীবন-যজ্ঞের শেষ সমিধ্, তাঁর পবিত্র নশ্বর দেহকে আচ্ছাদন করলো। এ যেন ভারতের দধীচির পরিপূর্ণ আত্মত্যাগের জ্বলন্ত আঁখর—ভবিষ্যৎ ভারতের ঘনান্ধকার যাত্রাপথের অম্লান-আলোকবর্ত্তিকা। মূক, মৌন, ব্যথাতুর অসংখ্য নরনারী তাদের প্রিয় নেতার পবিত্র ভস্ম শিরে নিয়ে ধীরে ধীরে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করলো।

"বিসর্জ্জি' প্রতিমা যেন দশমী দিবসে—
কত দিবানিশি বঙ্গ কাঁদিলা বিষাদে।"

(মধুসূদন)

সেদিন অভাগিণী বঙ্গজননী তাঁর অঞ্চলের নিধিকে হারিয়ে যেমন কেঁদেছিলেন—আজও সে ক্রন্দনের বিরাম হয়নি।

—৹৹৹—

উপসংহার

১৯২৫—১৮ই জুন কেওড়াতলা-মহাশ্মশানে পিতৃদেবের শেষ-কৃত্য সম্পন্ন করে সেখান থেকে লক্ষ লক্ষ মূক-জনসাধারণ অশ্রুবিগলিত নয়নে "গোরা হারা শ্রীবাসের আঙ্গিনায়" ফিরে এল। বাঙ্গালীর জীবনে বোধ হয় এমন দুর্দ্দিন আর আসে নি। আকাশ-বাতাস-পূরিত এক অব্যক্ত ক্রন্দন-ধ্বনিতে সমগ্র-দেশভরে গেল। দেশের মর্ম্ম মথিত করে তার প্রাণ-মৃদঙ্গে করুণ লয়ে ধ্বনিত হতে লাগল,

"হেদে রে বাঙ্গালী আজ কার মুখ চাও
বাহু পসারিয়া গোরাচাঁদেরে ফিরাও।"

আজ উনত্রিশ বৎসর গত হয়েছে, পিতৃদেব আমাদের ছেড়ে, বাঙ্গালী তথা ভারতবাসীকে কাঁদিয়ে অমর-ধামে চলে গিয়েছেন। তিনি চলে গিয়েছেন সত্য—কিন্তু যাবার বেলায় তাঁর যে আশার কোরকটি তিনি আমাদের দিয়ে গেছেন তাকে কি পূর্ণতর করে প্রস্ফুটিত করতে আমরা পেরেছি? তাই আজ পিতৃদেবের মহাপ্রয়াণের দুই যুগ পরেও, আমাদের শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি বা শাসন-নীতির দিকে তাকিয়ে মনে হয় পরাধীনতার মধ্যেও পিতৃদেব বাঙ্গলা তথা ভারতে যে মহাজাতি গঠনের চেষ্টা করেছিলেন, আজ বিশেষ করে বাঙ্গালায় উপযুক্ত-নায়কের অভাবে তাঁর সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতেই চলেছে। আজ আমাদের শোচনীয় এই নৈতিক-পরাজয়ের জন্য কাকে আমরা দায়ী করবো? নিজ হাতে জাতির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়ে স্বাধীন ভারতে আজ আমরা এখনো কেন পশ্চিমের কৃপা-প্রার্থী হয়ে বসে আছি? কিসের আশায় কোন ভরসায়, কার মুখ চেয়ে

আমরা এই আত্মহত্যার ব্রত গ্রহণ করেছি? আজ এই দুর্দ্দিনে কে আমাদের আত্ম-সম্বিত ফিরিয়ে আনবে?

আজ হতে ছত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে হৃদয়ে স্বদেশ-প্রেমের যে বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল, যার প্রকাশে ইংলণ্ডের তটভূমি পর্য্যন্ত আলোড়িত হয়েছিল, যে সোনার ভারতের পরাধীনতার নিগড় পিতৃদেব শয়নে, স্বপনে, জাগরণে অনুভব করে গিয়েছেন, আজ স্বাধীন আমরা দেশ-মাতৃকার পরাধীনতার সেই শৃঙ্খল সত্যই কতখানি মোচন করতে পেরেছি তাই ভাবি।

স্বদেশী যুগে আমাদের দেশে যখন মরা গাঙ্গে বান এসেছিল; সাহিত্যে শিল্পে, স্বদেশ-প্রেমে যখন আগমনীর সুর বেজে উঠেছিল, সেই প্রেমের উন্মাদনায় ঋষি বঙ্কিমের মাতৃমন্ত্র 'বন্দেমাতরম্' উচ্চারণ করে মাতৃভূমিকে শৃঙ্খল-মুক্ত করবার মানসে বাঙ্গালী যেদিন মাতৃযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল; আশার উন্মাদনায় যখন মৃত্যুকেও তুচ্ছ করে সমগ্র-জাতি সেই স্বদেশ-প্রেমের দুর্ব্বার-স্রোতে ভেসে চলেছিল, বাঙ্গালীর সেই যুগ সন্ধিক্ষণে পিতৃদেব তাঁর প্রাণদীপে-আলোকিত সে পথের সন্ধান দিতেই অগ্রসর হয়েছিলেন।

পিতৃদেবের মৃত্যুতে ভারতের জনগণ এতদূর ব্যথিত হয়েছিল কেন? নিকট আত্মীয় বিচ্ছেদের ব্যথাই সেদিন প্রকাশিত হয়ে ছিল তাদের ব্যথাতুর আননে। জনগণের উপর তাঁর এই অতুলনীয় অলৌকিক প্রভাবের হেতু কি? আমার মনে হয়, পিতৃদেবের সার্ব্বজনীন প্রেমই এই প্রভাবের মূল কারণ। তিনি মানুষের দোষগুণ বিচার না করেও তাঁকে ভালবাসতে পারতেন। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন "নব বৃন্দাবনে ঈশ্বরে মানুষে মিলিত হইয়ে রয়।" তিনি বিশ্বাস করতেন "কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্ব্বোত্তম নরলীলা" তাই এই নরের মধ্যেই তিনি নারায়ণকে

অনুভব করেছিলেন। তাই তাঁর ভালবাসা ধনী-নির্ধন মানতো না; পণ্ডিত, মূর্খ জানতো না; বিপ্র, শূদ্র, হিন্দু, মুসলমান, জ্ঞান ছিল না তাঁর প্রেমে। অন্তরের অন্তস্তল থেকে উৎসারিত তাঁর এই মানবীয় প্রেমে তিনি সবাইকে তাই ভাসিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই" চণ্ডীদাসের এই মর্ম্মবাণী মর্ম্মে গেঁথে নিয়েই তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন তাঁর জীবনের পথে। তাই—দেশবাসী তাঁকে ধনী বলে নয়, কৃতী আইনবিদ বলে নয়, দাতা, ত্যাগী, বাগ্মী বলে নয়, তারা পিতৃদেবের সহজ সরল মানবীয় প্রভাবের কাছে মস্তক অবনত করেছিল। আকৃষ্ট হয়েছিল তারা তাঁর প্রাণ-সৌন্দর্য্যে।

রাজনীতি-ক্ষেত্রেও পিতৃদেব তাঁর এই অভিনব ধারা অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর প্রাণের আকর্ষণী শক্তি হতে উদ্ভূত এই মানবীয় প্রেম-ধারায় স্নাত হয়েই তিনি সঙ্ঘ-গঠনের অপূর্ব্ব শক্তি অর্জ্জন করেছিলেন। নেতা হয়ে এই অটল-সঙ্ঘ তিনি রাখতে পেরেছিলেন তাঁর অনুচরবর্গের সঙ্গে প্রাণের সংযোগ দ্বারা। পিতৃদেবের এ অলৌকিক প্রভাবের আরো একটি কারণ ছিল সর্ব্বকার্য্যে তাঁর ধর্ম্মবিশ্বাস। তাঁর ধর্ম্মজীবনের অঙ্গ-স্বরূপ ছিল তাঁর কর্ম্মময় জীবন। তাঁর সমগ্র জীবনে তিনি তা সর্ব্বদা অনুভব করতেন। যথার্থ বৈষ্ণব অন্তর ছিল তাঁর, তাই বাস্তব-জীবনেও আদর্শের মধ্যে তিনি মধুর সামঞ্জস্য স্থাপন করতে পেরেছিলেন; এই অনুভূতিতেই আত্ম-সমাহিত হয়েই তিনি নিজকে শ্রীভগবানের অনন্ত লীলার যন্ত্র স্বরূপ মনে করতেন। নিষ্কাম কর্ম্মের ফলে চিত্ত শুদ্ধি হয়, চিত্ত-শুদ্ধি হলে মানুষের অহং-জ্ঞান লোপ পেয়ে যায়। সে অহং-জ্ঞান লোপ পেলেই মানুষ শক্তির আধারে পরিণত হয়। তখন সে শক্তির নিকট সাধারণ মানুষ নতি স্বীকার করে।

পিতৃদেব তাঁর জীবনে কর্ম্মময় তপঃদ্বারা এই রসের অনুভূতিতে নিজ জীবনকে অনুরঞ্জিত করে তুলেছিলেন। তাই তিনি সর্ব্বত্র জয়ী হয়ে সমগ্র জাতিকে অনুপ্রাণিত করতে পেরেছিলেন। প্রেমে আত্মহারা হয়ে দেশ সেবায় সমগ্র জীবন নিয়োজিত করে পিতৃদেব নিজ জীবনে বৈষ্ণব সাধনার মুলমন্ত্র, "সব সমর্পিয়া একমন হৈয়া নিশ্চয় হইলাম দাসী," এই মহাবাক্যের পূর্ণ সার্থকতা দেখিয়ে গিয়েছেন।

ভাগ্য বিড়ম্বিত জাতি আমরা! তাই পিতৃদেবের প্রেম-ধর্ম্মকে ভিত্তি করে তাঁর গঠিত সঙ্ঘের অবমাননা করতে সাহসী হয়ে আমরা আজ স্বাধীন ভারতে নিজ হস্তে তাঁর হৃদয়-শোণিতে-রঞ্জিত-স্বরাজ-সৌধ ধূলিতলে মিশিয়ে দিতেই ব্রতী হয়েছি।

স্বার্থের আত্মম্ভরিতায়, বিদ্বেষ-বহ্নিতে আজ সমগ্র-ভারত প্রজ্জলিত—সে বহ্নিধুমে আজ দেশমাতৃকার ললাট-জ্যোতিঃ মসীলিপ্ত দেখে নিদারুণ ক্ষোভেই হৃদয় বিদীর্ণ হয়।

যে স্বরাজ-স্বপ্নকে বাস্তবরূপ দিয়ে সাফল্যমণ্ডিত করতে পিতৃদেব তিল তিল করে স্বীয় অমূল্য জীবন অকালে বিসর্জ্জন দিলেন আজ সেই স্বরাজ করতলগত হয়েও যদি তাঁর নির্দ্দিষ্ট-আদর্শ-ধারা আমরা অনুসরণ করতে না পারি তবে তাঁর অমর আত্মা কিছুতেই শান্তি লাভ করতে পারবে না তা সুনিশ্চিত। আজ তাই পিতৃদেবের উদ্দেশ্যে বলি—

"সীমা-হারা পথখানি অন্ধকারে-ঢাকা
চিরন্তন-অতীতের এই মর্ম্মবাণী,
শুনি তুমি নিলে তুলি আলোক-বর্ত্তিকা
পরশে উজল হলো সেই দীপখানি।

শুভ্র এই দীপালোক আনিল বারতা—
আবাহন করি লও নব প্রভাতেরে।
আগুসারি চলে সবে সেই পথ দিয়া
উষাদীপ্ত সে যে আজ অন্ধকার পরে।
তুলিয়া পথের কাঁটা, মুক্ত করি তারে
অনন্ত নিদ্রায় শ্রমে পড়িলে ঢলিয়া,
আশার তরুতে তব ফলিল কি ফল?
ওগো বন্ধু দেখে যাও বারেক আসিয়া *

* * * * * *

যদাযদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত,
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজম্যহম্।
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

"ব ন্দে মা ত র ম্"

* আমার দ্বিতীয়া কন্যা কুমারীমঞ্জুলা রচিত ইংরাজী পদ্য হইতে অনূদিত।

সাহায্যকারী পুস্তক-সমূহের উল্লেখ-পত্র

পিতৃদেবের জীবনী লিখিবার কালে নিম্নলিখিত পুস্তক সমূহের যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছি।—

১। জাতীয় মহাযজ্ঞের ইতিহাস—হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ

২। বিক্রমপুরের ইতিহাস—যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত

৩। নারায়ণ মাসিক পত্রিকা—সভাপতি চিত্তরঞ্জন দাশের অভিভাষণ

৪। ভবানীপুর প্রাদেশিক সম্মেলনে " " "

৫। ফরিদপুর অভিভাষণ—কেদার দাশগুপ্ত

৬। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন— " "

৭। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন—হেমেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত

৮। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন—সুধাকৃষ্ণ বাগচী

৯। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন—সুকুমার রঞ্জন দাশ

১০। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন—কুমুদ নাথ সেন

১১। বসুমতি দেশবন্ধু সংখ্যা—১৯২৫

১২। বঙ্গবাণী দেশবন্ধু সংখ্যা—১৯২৫

১৩। চিত্ত চিতা—কবিশেখর কালিদাস রায়

১৪। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়—ভবানী চরণ বন্দোপাধ্যায়

১৫। আত্মচরিত—কৃষ্ণ কুমার মিত্র

১৬। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন—রাজেন সেন ও বি, কে সেন

১৭। চট্টগ্রাম অভিভাষণ—বাসন্তী দেবী

১৮। চিত্তরঞ্জন দাশের গ্রন্থাবলী—(বসুমতী সাহিত্য মন্দির)

১৯। বসুমতী, বঙ্গবাণী, মানসী ও মর্ম্মবাণী, ভারতবর্ষ, প্রবাসী এবং অন্যান্য মাসিক পত্রিকা—১৯২৫

২০। সাহিত্য সাধক চিত্তরঞ্জন—হেমেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত

২১। মহাত্মা গান্ধী ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বক্তৃতাবলী—সরোজ নাথ ঘোষ

২২। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস—হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
২৩। দেশবন্ধুর বজ্রবাণী—শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় ও
২৪। বাংলার বীরবাণী শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
২৫। স্বদেশী সমাজ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুব
২৬। আমরা বাঙ্গালী—হরি সাধন চট্টোপাধ্যায়
২৭। কমলাকান্তের দপ্তর—বঙ্কিমচন্দ্র
২৮। লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক— বিজযকুমাব চট্টোপাধ্যায়
২৯। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুব (১ম-৩য় খণ্ড-১৯০৬-৮)
৩০। ভাণ্ডার মাসিক পত্রিকা— „
৩১। অশ্বিনীকুমাব দত্ত—জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষাল
৩২। গান্ধী ও চিত্তরঞ্জন—সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার
৩৩। দেশবন্ধু চিত্তবঞ্জন—কুমুদবন্ধু বায় চৌধুরী
৩৪। চিত্তকথা—শৈলেশনাথ বিশী
৩৫। দেশবন্ধু মহিমা—বিধুভূষণ বসু
৩৬। চিত্তরঞ্জন চরিতামৃত—পবেশচন্দ্র চৌধুবী
৩৭। আইন অমান্য ও স্বরাজ—(পুস্তিকা Congress worker)
৩৮। দাদাভাই নৌরজী—জীবনকুমার ঠাকুবতা
৩৯। পাঞ্জাবকেশরী লালা লাজপত রায়—ধীরেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার
৪০। বরিশাল অভিভাষণ—বিপিনচন্দ্র পাল
৪১। অরবিন্দ—ধীবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
৪৪। পিতৃদেবের অভিভাষণ ও কাব্য গ্রন্থ—

(১) ভবানীপুব প্রাদেশিক সম্মেলন—(অভিভাষণ)
(২) ফরিদপুর অভিভাষণ— (৩) গয়া অভিভাষণ—
(৪) বেলগাম অভিভাষণ— (৫) বাঁকিপুর সাহিত্য সম্মেলন
(৬) দেশেব কথা (৭) বাঙ্গলার কথা
(৮) নারায়ণ পত্রিকা (৯) মালঞ্চ (কাব্য)
(১০) মালা (কাব্য) (১১) অন্তর্য্যামী (কাব্য)
(১২) কিশোর-কিশোরী (কাব্য) (১৩) সাগর-সঙ্গীত (কাব্য)

English Reference Books.

1. Nation in making—Sir Surendra Nath Banerjee.
2. My Experiment with Truth—M. K. Gandhi.
3. Auto Biography—Jwaharlal Neharu.
4. Life of C. R. Das—Prithwis Ray.
5. Ideal of Swaraj—Speeches of C. R. Das.
6. The Indian Struggle—Subhas Chandra Bose.
7. The History of the Congress—Pattabhai Sitaramyya.
8. Speeches of C. R. Das—Satkawri Ghose.
9. Punjab Disturbances—Congress Enquiry Report.
10. Barisal Presidential address—Bipin Ch. Pal.
11. Speeches & Writings of Gandhi—Natesan.
12. Indian Annual Register (1918—1924).
13. Indian National Congress (1917—1924).
14. Reports of the A. I. C. C.—(1917—24).
15. Outline Scheme for Swaraj—C. R. Das & Bhagavandas
16. Reports of Govt. of India—(1915—25) Rushbrook williams.
17. Speeches of Aravindo—(1902—1909).
18. Nationalism—Tagore.
19. Great men of India
20. Selections from Swami Vivekananda.
21. India for Indians—C. R. Das.
22. Way to swaraj. „
23. Mantagu's Indian Diary.
24. In the Heart of Aryavarta, Earl of Ronaldshay.
25. Amrita Bazar Patrika, Statesman & Various other News papers from 1917—1925.